ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস

সুবোধ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ভুল	শুদ্ধ
৫২	উত্তর ভারতের	পশ্চিম ভারতের
৬৪	সিন্ধু সমাজ	লিম্বু সমাজ
৭৮	১৩৩ নং	১৩০ নং
১৯৯	১৯টি	১৮টি
২২৮	বৈজ্ঞানিকের	বৈমানিকের
২৪৯	রানীবাহিণী	নারীবাহিণী
২৭৫	lowering	towering

ভূমিকা

ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ নেই। ইংরাজী ভাষাতেও যা আছে, তা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ফৌজী বিবরণ রূপেই আছে, ইতিহাসের রূপে লিখিত নেই।

এই গ্রন্থে ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাবে বিবৃত করা হয়েছে। এই ইতিহাস রচনার সময় প্রধানতঃ দু'টি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম, ভারতীয় ফৌজের উদ্ভব, পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের তথ্যগত উপাদানের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়, ভারতীয় ফৌজের জাতীয় ফৌজে রূপান্তরিত হবার ঘটনাগত গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়। যে ফৌজ নিতান্ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক ফৌজ রূপে গঠিত হয়েছিল, সেই ফৌজ কিভাবে আদর্শ জাতীয় ফৌজে পরিণত হয়েছে, এই গ্রন্থ বস্তুতঃ তারই ব্যাখ্যা, বিবরণ ও বিশ্লেষণ।

'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসের' প্রথম অংশ আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় নিবন্ধরূপে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনা আরম্ভের সেই সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন বর্ত্তমান ছিল। সেই কারণে গ্রন্থের প্রথম দিকের প্রসঙ্গ ও অধ্যায়গুলিতে ব্রিটিশ শাসনকে বর্ত্তমান ঘটনা রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই অধ্যাগুলিতে ভারতীয় ফৌজের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেটা বস্তুতঃ সাম্রাজ্যিক ঐতিহ্যে গঠিত ভারতীয় ফৌজের পরিচয়।

পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ ও অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতের ফৌজের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যে আক্ষেপ নিয়ে 'পরাধীন' ভারতের ফৌজের ইতিহাস লেখা আরম্ভ হয়েছিল, শেষদিকে স্বাধীন ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস

লেখার আনন্দে সে আক্ষেপ মিটে গেছে। বস্তুতঃ সেই আনন্দ এবং ভারতীয় ফৌজের কীর্ত্তিবহুল সামরিক ইতিহাস দেশের জনসাধারণের কাছে নিবেদন করার জন্যেই এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হবার পর ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়ে গেছে—হায়দরাবাদে শান্তি অভিযান। হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে 'রজাকর' নামক সাম্প্রদায়িক দলের অত্যাচার দমনে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য সন্নিবেশ করার সংকল্প করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) তারিখে হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমান্তের পাঁচ দিক থেকে ভারতীয় সৈন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভারতের দক্ষিণ কম্যাণ্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজীর পরিচালনায় এই অভিযান আরম্ভ হয়। মেজর জেনারেল চৌধুরী শোলাপুরের দিক থেকে এবং মেজর জেনারেল রুদ্র বেজোয়াড়ার দিক থেকে মোটরযান বাহিত সাঁজোয়া দল, ট্যাঙ্ক দল এবং গোলন্দাজ দল নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদের দিকে অগ্রসর হন। মেজর জেনারেল ব্রার বেরারের দিক থেকে পদাতিক দল নিয়ে অগ্রসর হন। প্রকৃত অভিযানের সম্পর্কে পাঁচ ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত হয়। নিজামী ফৌজ এবং রজাকর দল ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, কিন্তু বস্তুতঃ চার দিনের মধ্যে এই প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। নিজামী ফৌজ আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করে। রজাকর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। এই অভিযানে ভারতীয় ফৌজের মোট ১০ জন সৈনিক নিহত হয়। নিজামী ফৌজের ৬০০ সৈন্য নিহত হয় এবং রজাকর দলের নিহত হয় ১৫০০ জন। ভারত গবর্ণমেণ্ট মেজর জেনারেল চৌধুরীকে হায়দরাবাদ রাজ্যের মিলিটারী গবর্ণর বা সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

মুক্তি ফৌজ ('Forces of Liberation') নামে একটা কথা

আছে। ভারতীয় ফৌজ হায়দরাবাদে যেভাবে অভিযান নিষ্পন্ন করেছে তা প্রকৃত মুক্তি ফৌজেরই আদর্শ কীর্ত্তির একটি দৃষ্টান্তরূপে ঐতিহাসিকের কাছে বিবেচিত হবে। জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও শান্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত না করে দেশব্যাপী উপদ্রবকারীর সশস্ত্র সংহতিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে দেবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হলো এই অভিযান। মুক্তি ফৌজ হিসাবে ভারতীয় ফৌজ হায়দরাবাদ অভিযানে যে কৌশল, সংযম, দক্ষতা এবং সংগঠনী প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা কোন দেশের সামরিক ইতিহাসে কদাচিৎ পাওয়া যায়। ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এই অভিযান এক অভিনব কীর্ত্তিরূপে স্মরণীয় হয়ে রইল।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি শিল্পী শ্রীধীরেন বল বিশেষ যত্নের সঙ্গে এঁকে দিয়ে গ্রন্থকারের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহের বিষয়ে যাঁরা পুস্তক, রিপোর্ট, তথ্য এবং ছবি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

২৩শে সেপ্টেম্বর
১৯৪৮

গ্রন্থকার

বিষয়সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

চিত্র

ভারতীয় ফৌজ—গত দু'শো বছর

ভারতের ফৌজের ইতিহাস বস্তুতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। বণিক ইংরাজের মানদণ্ডকে প্রায় অর্ধজগতের রাজদণ্ডে পরিণত করবার জন্যে শত শোণিতাক্ত সংঘর্ষের পরীক্ষায় যে লক্ষ লক্ষ কাঁচা-মাথার উৎসর্গ প্রয়োজন হয়েছিল, সেই উপাদান ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হিন্দুস্থানের সিপাহী, এতবড় সামরিক কাঁচামাল পৃথিবীর কোন মহাদেশে নেই এবং ছিল না। ইংরাজ বণিক এই কাঁচামালের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। সত্যিই ইংরাজ বণিকের কৃতিত্বের তুলনা হয় না। হিন্দুস্থানের মানুষকেই সিপাহী করে প্রথম হিন্দুস্থানকে দখল এবং তার পর সেই ফৌজের সাহায্যেই অর্ধ পৃথিবীর দেশ ও জাতিকে দখল করে বিরাট সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, কী বিরাট অপকীর্তি!

সুতরাং, হিন্দুস্থানের ফৌজের ইতিহাস বস্তুতঃ ইংরাজের সাম্রাজ্যিক প্রতিভা এবং কৃতিত্বের ইতিহাস। দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে, নিরীহ রাষ্ট্রের সীমা গ্রাস করতে, দেশপ্রেমিক জাতির আত্মমর্যাদাকে আঘাত দিয়ে ধরাশায়ী করতে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় সিপাহীর মত এত একনিষ্ঠ একটা সুগ্রীব-সহায় যে লাভ করেছিল, সেটা তাদের পক্ষে একটা দুর্লভ ঐতিহাসিক সৌভাগ্য, তিন মহাদেশের বহু জাতির পক্ষে ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য এবং ভারত-ইতিহাসের পক্ষে দুর্ভাগ্য ও কলঙ্ক।

হিন্দুস্থানের ফৌজের ইতিহাস, দাস ভারতের বীরত্বের ইতিহাস। আমরা বলি 'বীরত্ব' কিন্তু ব্রিটিশেরা সে কথা বলে

না। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের লেখা গ্রন্থে ও সন্দর্ভে ভারতীয় সৈনিকের গ্যালান্ট্রির (Gallantry) প্রশংসা অবশ্যই আছে। কিন্তু তাকে 'হিরোয়িক' (Heroic) গুণগ্রাম ব'লে তাঁরা ভুল করেননি। শত প্রান্তরে গিরিবর্ত্মে ও দুর্গতোরণে ব্রিটিশ পতাকার মান রাখতে ভারতের সৈনিক জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ক'রে লড়াই করেছে। তিব্বতে, কঠিন হিমাকীর্ণ পৃথিবীর ছাদে উঠে এই ভারতীয় সৈনিক ইংরাজ বাহাদুরের নুন-খাওয়া কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে। আরবের মরুভূমিতে, বর্মার জঙ্গলে, উত্তর সীমান্তের প্রতি উপত্যকায়, ভারতীয় সিপাহীর শোণিতের লিখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ের ইতিহাস লিখে দিয়েছে। সবই সত্য। ব্রিটিশরাজও জানেন, কিভাবে এই দাসোচিত বীরত্বকে খাতির করতে হয়। কতকগুলি সোনা-রূপা আর নিকেল-পেতলের মেডাল ছাড়া ভারতীয় সৈনিককে আর কোন মর্যাদা দিতে ব্রিটিশরাজ পারেননি। এটাই স্বাভাবিক।

অন্য দিকে দেখা যায়, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের দ্বারপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর প্রাচীরদুয়ার পর্যন্ত বীর ইংরাজের প্রস্তরময় বিগ্রহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিসের সম্মুখে ক্লাইভের গর্বোদ্ধত প্রস্তরমূর্তি। নিকলসনের মূর্তি তরবারি হাতে পুরানা দিল্লীকে সন্ত্রস্ত করে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। আউটরামের ভ্রূকুটি কলকাতাকে ব্রিটিশরাজের প্রতাপ অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ব্রিটিশজাতি এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক মনে মনে জানেন, এই ব্রিটিশ অফিসার ও সেনানায়কেরাই সত্যিকারের বীর, এঁরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচনা করেছেন। এঁদেরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ভারতীয় সিপাহীরা মাত্র চালিত হয়েছে। সামরিক প্রতিভা

ব্রিটিশের, সামরিক উপকরণ হলো ভারতীয় সৈনিক। উপকরণের বীরত্ব বলে কোন গুণগ্রাম থাকতে পারেনা।

হিন্দুস্থানের ফৌজ ব্রিটিশের উদ্যোগে রচিত একটি বিচিত্র সমাজ। ফৌজী ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সামরিক ঐতিহ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টি। ভারতবর্ষের মধ্যেই ভারতীয়দের নিয়ে একটা নতুন জাতি যেন গঠন করা হয়েছে। ফৌজী ভারতবর্ষের মনস্তত্ত্ব ভিন্ন, রুচি ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন। স্বদেশ-বোধ বা স্বজাতিবোধ, এই সব চেতনা তাদের মন থেকে নির্বাসিত। নতুন এক ফৌজী সংহিতা অনুসারে প্যারেড-দুরস্ত চলাফেরার মত এদের মনও প্রচণ্ড অ-ভারতীয় রুচি ও নীতির দ্বারা দুরস্ত করা হয়েছে। যে মুহূর্তে স্বজনপ্রীত পরিবারপ্রিয় পল্লীবাসী ভারতীয় কৃষক রংরুট রূপে ভারতীয় ফৌজে ভর্তি হয়ে উর্দি চড়িয়ে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তেই সে যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। তার কাছে সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে জাতি ধর্ম সংস্কৃতির কলরব—ব্রিটিশ রাইফেল ও মেশিনগানের একটি ইস্পাত-কঠিন উপাদান রূপে তার সত্তা ভারতীয় ফৌজের সত্তার মধ্যে মিশে যায়।

তখন তার ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়—

"খালক্-ই-খুদা
মুলক-ই-সরকার
হুকুম্-ই-সাহেবান আলিশান"

অর্থাৎ—মানুষ হলো ভগবানের, দেশ হলো সরকারের এবং হুকুম হলো পরমপ্রতাপ সাহেবদের। ভারতীয় ফৌজের মধ্যে প্রচলিত এই প্রবাদ বস্তুতঃ প্রবাদ মাত্র নয়। গীতা, বাইবেল, কোরাণকে দূরে সরিয়ে এই নতুন ধর্মনীতি তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। ইংরাজ সাহেবের হুকুম, এর চেয়ে মহত্তর পালনীয় ধর্ম আর কি

হতে পারে? গীতার কৃষ্ণের মত সাদা সাহেব অফিসারই ভারতীয় সিপাহীকে যেন এক নতুন ধর্ম শিখিয়ে দিচ্ছেন—সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। সমগ্র ভারতীয় ফৌজের মন এই নীতি দিয়ে গঠিত, যাকে বলতে পারা যায়—সাহেবীয় ভক্তিবাদ।

অনেক সময় ভারতের আধুনিক জাতীয় নেতারা ভারতীয় ফৌজের বীরত্বময় কীর্ত্তিকলাপের বাখান করে থাকেন। হ্যাঁ, দু' একটা গ্যালিপোলির মত দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে হয়, ভারতীয় সৈনিক কী ভয়ানকভাবে মরতে পারে ও লড়তে পারে। কিন্তু ভারতীয় সৈনিক দেশবিদেশের জনসাধারণের ওপর কী ভয়ানক নিষ্ঠুরতাও করতে পারে, তার দৃষ্টান্তও আছে। ভারতীয় সৈনিকের অপকীর্তি চীন বর্মা ও ইরাকের জনসাধারণকে এককালে অত্যন্ত ভারত বিদ্বেষী ক'রে তুলেছিল। এখনো সেই ক্ষোভ সম্পূর্ণভাবে মিটে গেছে ব'লে মনে হয়না। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে বলবার মত একটা যুক্তি আছে—ভারতীয় সৈনিকের এই সব কলঙ্কর আচরণকে ভারতবাসীর আচরণ ব'লে মনে করা ভুল হবে। কারণ, ভারতীয় সৈনিকেরা জাতীয় ভারতের সৈনিক নয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সৈনিক। সাংহাইয়ের পথে শিখ সৈনিকের হাতে চীনা পথিকের লাঞ্ছনার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। আমাদের সান্ত্বনা, এ-সব ভারতীয় সৈনিক জাতিতে ভারতীয় হলেও ধর্মে ব্রিটিশ সৈনিক।

ঠিক কথা। ভারতীয় সৈনিকের অপকীর্তিকে আমরা অস্বীকার করবো, কারণ ওটা জাতীয় ভারতের আচরণ নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় সৈনিকের তথাকথিত বীরত্বকেও অবশ্য অস্বীকার করা উচিত। ওটা ধর্মতঃ ব্রিটিশ বীরত্ব, আমাদের পক্ষে বাখান করা শোভা পায়না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও একটা ভারতীয় বীরবাহিনী গঠন করার জন্ত মোটেই উৎসাহিত হননি। তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে সেই শ্রেণীর লোককেই ফৌজে গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে লড়াই করার গুণ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানায়কেরা দেশীয়দের মধ্যে সৈন্ত-সংগ্রহের সময় সব চেয়ে ভাল 'লড়্‌নেওয়ালা জীব' খুঁজতেন এবং ঐ ভাষাও ব্যবহার করতেন ('select the best fighting animal')। 'হুকুম-ই-সাহেবান আলিশান'—এই আদর্শকে যেসব শ্রেণী সহজে বিশ্বাস করে, যারা পোষা বাজপাখির মত ইংরাজ অফিসারের নির্দেশ মত যে কোন হিংস্র কাজে মেতে উঠতে পারে, তাদের লড়াই করার গুণ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতের যে সব সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক-সংগ্রহ সম্ভব বলে মনে হয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই সব সমাজ ও সম্প্রদায়কে 'সামরিক জাতি' (Martial Races) আখ্যা দিয়েছেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এক পরম কূটনীতিগ্রস্ত সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হলো এই 'সামরিক জাতি' থিওরি। সমর কুশলতা দেখে 'সামরিক জাতির' তালিকাটি তৈরী হয়নি। মাদ্রাজী ও বেহারী সৈনিকের সাহায্যে ব্রিটিশ একদিন শিখদের পরাভূত করেছিল। কিন্তু সে দিনের সংগ্রাম-বিজয়ী মাদ্রাজী ও বেহারী আজ ব্রিটিশের বিচারে অসামরিক জাতি। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা সাহেব ইংরাজের বিরুদ্ধে কোনদিনই অস্ত্রধারণ করেনি। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা সামরিক জাতি কিনা, ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষ করে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ তারা দেয়নি। মোগল পাঠান যুগেও পাঞ্জাবী মুসলমানের বিশেষ কোন সামরিক ঐতিহ্যের খ্যাতি ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সরকার অবিলম্বে পাঞ্জাবী মুসলমানকেই বিশেষ পছন্দ করে ভারতীয় ফৌজে দলে দলে ভর্তি করে নেন। কোন প্রাদেশিক

সম্প্রদায় থেকে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য-সংগ্রহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট করেননি।

আর একটা আশ্চর্যের বিষয় শিখ সৈনিকের মনস্তত্ব। ১৮৪০ সালে ইংরাজের আক্রমণে যারা স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তাদের মন কি করে যে অচিরাৎ প্রগাঢ় ইংরাজ ভক্তির দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে উঠলো, এ এক বিচিত্র রহস্য। ১৮৫৭ সালে যখন ভারতের সর্ব সিপাহী দেশপ্রেমের প্রেরণায় বহিঃশত্রু ইংরাজকে তাড়াবার প্রেরণায় সংগ্রাম আরম্ভ করে, মাত্র ১৭ বৎসর আগে স্বাধীনতাচ্যুত শিখ সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, বরং ইংরাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সিপাহীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল।

ব্রিটিশের প্রতিভা ও আদর্শে গঠিত ভারতীয় ফৌজ বস্তুতঃ একাধারে দুটি প্রকৃতিতে দীক্ষিত হয়েছে। (১) স্বদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এই বাহিনী বস্তুতঃ দখলদার ফৌজ (Army of Occupation) ছাড়া আর কিছু নয় এবং (২) দরকার পড়লেই এরা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক বাহিনী (Imperial Force)। ব্রিটিশের সঙ্গে যে কোন রাষ্ট্রেরই বিরোধ বাধলে ব্রিটিশের প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যিক অভিযানে ভারতীয় বাহিনীকে সহচর হতে হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ফৌজকে কখনো দেশরক্ষার আদর্শে (Defence) গঠিত করেননি। "দেশরক্ষা" কথাটা সরকারী খাতাপত্রে ব্যবহৃত হয় মাত্র। বহিঃশত্রুর সম্ভাবিত বা আশঙ্কিত আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, ভারতের ফৌজী শিক্ষা পদ্ধতি ও রীতিনীতির মধ্যে এই ধরণের আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়নি। কারণ দেশরক্ষা আদর্শকে মৌখিকভাবেও বড় ক'রে ধরলে অজ্ঞাতসারে

স্বাদেশিকতার চেতনা সাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সম্পূর্ণভাবে হুকুম-ই-সাহেবান আদর্শের আফিং খাইয়ে ভারতীয় সৈনিককে একটি নিরেট ভাড়াটিয়া বা চাকুরিয়া সৈনিকরূপেই তৈরী করা হয়েছে।

হিন্দুস্থানের ফৌজ, স্বদেশে এরা দখলদার বাহিনী! ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রে তাঁদের প্রাচীন "কালো পাহারা" (বা Black Watch) পলিসি ও ঐতিহ্য অনুসারে কাজ করেছেন। মাছের তেলে মাছ ভাঁজার মত ভারতবর্ষকে সায়েস্তা করে রাখবার জন্যে একটা ভারতবিরোধী সশস্ত্র ভারতীয় দল তৈরী করা হয়েছে।

ভারতীয় ফৌজের গুণগ্রামের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে এটাই সবচেয়ে বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা চমৎকার ও ভয়ানক লড়তে পারে। স্বদেশে দখলদারবাহিনী হিসাবে এই ভারতীয় ফৌজ কৃতিত্ব ও সাফল্য দেখিয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি জাতীয় গণ-আন্দোলনকে দমন করতে ভারতীয় ফৌজ যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে টমি-অধ্যুষিত খাস ব্রিটিশ ফৌজ তার চেয়ে বেশী নিষ্ঠা দেখাতে পারেনি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার চরম এক্সিকিউটিভ হলো ভারতীয় ফৌজ। আরও দেখা গেছে যে, সাম্রাজ্যিক বাহিনী হিসাবেও ভারতীয় ফৌজ নিঃসন্দেহে সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

কিন্তু দেশরক্ষাবাহিনী হিসাবে ব্রিটিশগঠিত এই ভারতীয় ফৌজের আদৌ কোন শক্তি আছে কিনা তার ঐতিহাসিক পরীক্ষা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের সীমান্ত ভেদ করে কোন বহিঃশত্রু ভারতে প্রবেশের উদ্যোগ করেনি। ভারতীয় ফৌজকে দেশমাতৃকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করতে হয়নি। সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজের মত ভারতের ফৌজকে আজও কোন স্টালিনগ্রাডীয় অগ্নিপরীক্ষা দিতে

হয়নি। সেরকম কোন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলে ব্রিটিশগঠিত বর্তমান ভারতীয় ফৌজ উপযুক্ত নিষ্ঠা আত্মোৎসর্গ ও মনোবলের পরিচয় দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গত মহাযুদ্ধে ভারতে জাপ-আক্রমণের একটা আশঙ্কা হয়েছিল। জেনারেল আলেকজাণ্ডার প্রথম ধাক্কায় ভারতীয় ও ব্রিটিশ ফৌজ নিয়ে বর্মা থেকে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করে ভারতে চলে এসেছিলেন। সে সময়েও ভারতে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঠিক স্বদেশ রক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। অন্যভাবে বলা যায়, সে সময়েও আশঙ্কিত জাপ-আক্রমণের সম্মুখে ভারতীয় ফৌজকে "স্বদেশরক্ষার" প্রেরণা দিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাহস করেননি। কারণ তখনো সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে গভর্ণমেণ্ট জানতেন। মাত্র ভারতের বেসামরিক জনসাধারণের কাছে জাপবিরোধী সংগ্রামকে স্বদেশরক্ষার সংগ্রাম বলে প্রচারকার্য করা হয়েছিল, কারণ ভারতবাসীর কাছ থেকে যুদ্ধ-ফণ্ড তহবিলে অর্থ সাহায্য, রক্ত-ব্যাঙ্কে রক্ত সংগ্রহ ও কাঁচা মাল এবং খাদ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। যে ভারতীয় সৈনিক তখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে সম্ভাবিত জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ফ্রণ্টে ঘাঁটি নিয়ে বসেছিল, তার কাছেও ফ্যাসিস্তবিরোধী রাজনীতি বা স্বদেশরক্ষার নীতি কিছুই প্রচার করা হয়নি, বরং খুবই সতর্কতার সঙ্গে রাজনৈতিক ও স্বদেশনৈতিক বিষয়কে ভারতীয় সৈনিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় সৈনিকও এই যুদ্ধে সেই পুরাতন হুকুম-ই-সাহেবান প্রেরণা অনুসারেই নিছক ভাড়াটিয়া সৈনিকরূপে যুদ্ধ করেছে। এবিষয়ে জেনারেল স্টীলওয়েলের মন্তব্য হয়তো অনেকের স্মরণ আছে।

হ্যাঁ, ব্রিটিশের সরকারী দপ্তরের ভাষা অনুযায়ী বলা যায়, গত মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজকে একবার মাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে স্বদেশের সীমান্ত রক্ষার কাজ করতে হয়েছে—আসাম ব্রহ্ম সীমান্তে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বহিঃশত্রু মনে করে ব্রিটিশ চালিত ভারতীয় ফৌজ কোহিমা রণাঙ্গণে যাদের ওপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল, তারা "বহিঃশত্রু" নয়—আজাদ হিন্দ ফৌজ। ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা সম্মুখে রেখে স্বদেশ উদ্ধারের নাম নিয়ে যে ফৌজ সেদিন ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, তারা শত্রু বাহিনী নয় এবং সেটা ভারতের ওপর আক্রমণও নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা সমরসম্ভার ও সামর্থ্য কখনই এতখানি ছিল না, যার দ্বারা সত্যি সত্যিই সেসময়ে ভারতের সুব্যবস্থিত ব্রিটিশ-মার্কিন সমরশক্তিকে ব্যর্থ ও পরাভূত করা সম্ভব ছিল। এমন অবাস্তব পরিকল্পনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিশ্বাসবান ছিলেন বলে মনে হয় না। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট "অভিযানের চাল" (Token Invasion) আখ্যা দিয়েছিলেন। অবশ্য অভিযানের গুরুত্বকে ছোট করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই বুলি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে আজাদ হিন্দের "অভিযানকে" আমরা আদৌ অভিযানের চাল বা আক্রমণ বলে মনে করি না। বরং বলা যায়, ভারতের জনসাধারণ এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে একটী দেশপ্রেমিক বাহিনীর আবেদনের মহড়া (Demonstration)।

এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো—বৃটিশ চালিত ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের আবেদন সক্রিয় হয়নি। জাপসমর্থিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি খাস ভারতীয় বাহিনী শত্রুর মত আচরণ দেখাতে দ্বিধা করেনি। 'জাপবিরোধী'

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজের পথ রোধ করেছিল, এটা সত্য নয়। আবার একথাও সত্য, ইউনিয়ন জ্যাকওয়ালা ভারতীয় ফৌজ ত্রিবর্ণ পতাকাধারী আজাদ হিন্দ ফৌজকে 'স্বদেশী' ফৌজ বলে বিশ্বাস করতে বা মর্যাদা দিতে পারেনি। তাই, ভারতীয় ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর মেশিনগানের আগুন ছুঁড়ে মারতে একটু কার্পণ্য করেনি। এর সঙ্গে 'দেশরক্ষার' সম্পর্ক নেই, ঠিক সীমান্তরক্ষার আদর্শও নেই, এটা সম্পূর্ণরূপে দখলদার বাহিনীর মত আচরণ। চাকুরী বজায় রাখার জন্য ভারতীয় ফৌজ চিরকাল যা করে এসেছে—সেই হুকুম-ই-সাহেবান আদর্শ।

সামরিক দক্ষতা সম্বন্ধে ভারতীয় ফৌজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির বাহিনীগুলির সমতুল্য—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়া ভারতীয় বাহিনীর আর কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি? অন্যান্য বিখ্যাত দেশের ফৌজগুলিরই বা গুণধর্মে কি বৈশিষ্ট্য আছে?

ভারতীয় বাহিনী হলো বিশুদ্ধ ভাড়াটিয়া (Mercenary) বাহিনী। সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজ নিজেকে বলে, দেশপ্রেমিক বাহিনী (Patriotic Army)। বৃটিশ বাহিনী হলো সাম্রাজ্যপ্রেমিক বাহিনী (Imperialist Army) এবং মার্কিন বাহিনীকে ভাল কথায় বলা যায় জাতিপ্রেমিক বাহিনী (Nationalist Army)। মার্কিন ফৌজ সম্পর্কে জাতিপ্রেমিক কথাটার বদলে জাতিগর্বী কথাটাই বেশী খাটে। সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজকেও (Red Army) দেশপ্রেমিক বাহিনী না ব'লে 'দেশগর্বী' বাহিনী বলা উচিত। অনেকে মনে করেন, সোভিয়েট রুশিয়ার ফৌজ বস্তুতঃ সাম্রাজ্যিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু লাল ফৌজের উদ্ভব ও প্রথম ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে

পারেন না যে, লাল ফৌজকে আদর্শ দেশপ্রেমিক বাহিনী হিসাবে মাত্র দেশরক্ষার (Defence) আদর্শে গঠন করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই ঐতিহ্য একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে কিনা, সেটা পৃথিবীর ঘটনাবলীর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। অবশ্য সোভিয়েট সরকার লাল ফৌজ নামটা সম্প্রতি বাতিল করে দিয়েছেন। নতুন নামকরণ হয়েছে—Army of Soviet Russia—সোভিয়েট রুশিয়ার বাহিনী।

ভারতীয় ফৌজ যদিও ভাড়াটিয়া (mercenary) বাহিনী, কিন্তু অত্যন্ত নিমকহালাল। ব্রিটিশ সরকারের নুন খেয়ে কৃতজ্ঞতায় প্রাণ দিতে কোন কার্পণ্য নেই। বৃটিশবিরোধী কোন আন্দোলন বা ঘটনায় ভারতীয় বাহিনীর রাজভক্তিকে বিচলিত করা সহজ নয়। কিন্তু তাই বলে কি এত প্রগাঢ় রাজভক্ত ভারতীয় ফৌজ বিদ্রোহ করে না? এদের মধ্যে কি প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ দেখা যায় না?

ভারতীয় ফৌজের মানুষ প্রতিবাদ করে থাকে, বিক্ষোভ দেখায় এবং বিদ্রোহও করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিদ্রোহ কখনও নয়। ১৮৫৭ সালের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহই (Sepoy Mutiny) একমাত্র রাজনৈতিক বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান। কিন্তু ১৮৫৭ সালের ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বাহিনীকে নতুন পলিসিতে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক চেতনাহীন ও দেশপ্রেমহীন ফৌজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতীয় ফৌজে আর কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত নেই। আর যেসব বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ মাঝে মাঝে আকস্মিক ভাবে দেখা দিয়েছে, সেটা সমগ্র ফৌজঘটিত ব্যাপার নয়; বিরাট ভারতীয় ফৌজের কোন বিশেষ একটা অংশ, কোন রেজিমেণ্ট ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানীর মধ্যে সাময়িক একটা

বিক্ষোভ হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। এই সব বিক্ষোভ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিমকঘটিত বিক্ষোভ। রসদ, ভাতা, বেতন, ছুটি ইত্যাদি দাবী দাওয়ার বিক্ষোভ। ভারতীয় সিপাহী স্বভাবতঃ নিমকহারামি করেনা, কিন্তু এত নিমকপ্রাণ বলেই নিমকের খুঁটিনাটি ব্যতিক্রম হলে সময় সময় মাত্রাহীন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এটা ভারতীয় সিপাহীর বিশেষ কোন চরিত্রগত গৌরব নয়, স্বাভাবিক ভাড়াটিয়া মনোভাবেরই একটা সাধারণ ঔদরিক অভিমানের লক্ষণ—তবে একটা মন্দের ভাল লক্ষণ নিশ্চয়।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাজভক্ত ভারতীয় ফৌজ কি পরিমাণ সামরিক আইন ও রীতির বিরুদ্ধ কাজ করেছিল, সরকারীভাবে সমর্থিত তার একটা তালিকা আছে। এর মধ্যে কতগুলি সাধারণ ব্যক্তিগত অপরাধের (crime) ঘটনা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা ছাড়া বাকী সব ঘটনাই হলো সামরিক বিভাগীয় ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঘটনা। সুখসুবিধা ও দাবী আদায়ের জন্য ভারতীয় সৈনিকের দ্বারা শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা।

১৯৪৬ সলের এপ্রিল মাসে ভারতগবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রসঙ্গক্রমে বলেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জঙ্গী আদালতের বিচারে ৭৮জন ভারতীয় সৈনিকের ফাঁসি, ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ড ও ৩৭ হাজার জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়।

একটা ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলতে থাকার সময় গ্রীসে অবস্থিত কয়েকজন বিদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকের প্রাণদণ্ড হয়। অপরাধ—গঙ্গাদীন নামে কুখ্যাত চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে এই সৈনিকেরা প্রতিবাদ করে-

ছিল। এই চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তু হ'লো, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটা কুৎসাপূর্ণ কাহিনী। গ্রীসে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈনিকের চিত্তবিনোদনের জন্য এই চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রকাশ, সিনেমাগৃহে কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক উক্ত ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করায় শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে।

উক্ত ঘটনার মধ্যে একটা সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেম বা জাতীয় আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অল্প হ'লেও আছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যসংগ্রহের কালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের সর্বসমাজ থেকে যেভাবে জনবল আহরণ করেছিলেন, তার ফলে শিক্ষিত ও রাজনৈতিক, তথা জাতীয় চেতনাসম্পন্ন বহু সংখ্যক ব্যক্তি ভারতীয় ফৌজে প্রবেশ লাভ করেছিল। এর বিশেষ একটা প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজে সর্ব-সম্প্রদায় ও সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তির যোগদান ভারতীয় ফৌজের মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। হুকুমই-সাহেবান আদর্শ যেভাবে ভারতীয় ফৌজের মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার কিছু শিথিলতা অবশ্যই ঘটেছে। ইংরাজ সাহেব অফিসারের উদ্ধত ও অতিরিক্ত প্রভুত্বপূর্ণ আচরণ, সাহেব অফিসার ও সৈনিকের বেতন এবং মর্যাদার সঙ্গে ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের বেতন এবং মর্যাদার বৈষম্যমূলক পার্থক্য—প্রধানতঃ এই দুই বিষয় ভারতীয় ফৌজের পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। ক্লাইভের ভারতীয় সিপাহী নিজে ভাতের ফেন খেয়ে গোরা সৈনিককে ভাত খাইয়েছিল। সাহেব-পূজার সেই কিম্বদন্তী আজ আর

সিপাহীর কাছে ঠিক সেইভাবে পরমধর্ম হয়ে নেই। কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভারতীয় ফৌজে নিযুক্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রভাব ও প্রেরণার ফলেই এই চিরকালের বৈষম্য ও অবমাননাকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকেরা পূর্বের তুলনায় বেশী প্রতিবাদপরায়ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল। যুদ্ধ চলতে থাকার সময় এবং যুদ্ধক্ষান্তির পর এই প্রতিবাদ মাঝে মাঝে বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধক্ষান্তির অব্যবহিত পরে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে বহু স্থানে বহু ধর্মঘট দেখা দেয়। এর বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হলো বোম্বাইয়ের ক্যাসলব্যারাক ঘটনা। বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনানীদের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে পরিণত হয় এবং তার প্রভাব করাচী ও মাদ্রাজের ভারতীয় নৌসেনার মধ্যে পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আর একটি ঘটনা হয়েছিল, যুদ্ধ চলতে থাকার সময় বিদ্রোহের অপরাধে উপকূল রক্ষী বাহিনীর (Coastal Battery) নয়জন বাঙালী সৈনিকের প্রাণদণ্ড হয়।

উল্লিখিত নৌবিদ্রোহ এবং আরও কয়েকটি বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনার মূল কারণ হলো ভারতীয় সৈনিকের অসন্তোষ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কখনও তাদের মর্যাদার ওপর আঘাত পড়ায়, কখনও বেতন ইত্যাদি বৈষয়িক সুখসুবিধার অভাবের বোধ তীব্র হওয়ায় এবং কখনও বা শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ও অফিসারের তুলনায় বড় বেশি নিকৃষ্ট ও বৈষম্যমূলক আচরণ পেতে থাকায় ভারতীয় সৈনিকের অসন্তোষ সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে এই ধরণের বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই অসন্তোষ রাজনৈতিক অসন্তোষ নয় এবং ঐ বিদ্রোহগুলিও ঠিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়। দেশ ও জাতির পক্ষে কোন

রাজনৈতিক পরিবর্তন সার্থক করার জন্য অথবা রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এই সব বিদ্রোহ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে হতে পারে, যেহেতু ঐ নৌবিদ্রোহের বা অন্যান্য বিভাগের সৈনিকদের কয়েকটি বিদ্রোহ ও ধর্মঘটের ব্যাপারে জয় হিন্দ ধ্বনি এবং জাতীয় পতাকার ব্যবহার দেখা গিয়েছিল, সেইহেতু ঘটনাগুলিকে স্বাদেশিকতার ব্যাপার বলা যাবে না কেন? ঠিক কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব বিদ্রোহী ও ধর্মঘটী সৈনিকের মুখে রাজনৈতিক ধ্বনি শোনা গেছে। কিন্তু তাই বলে ঘটনাটা রাজনৈতিক নয়। পূর্বে একবার বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবিভাগে বহু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি প্রবেশ লাভ করেছিল। দাবীদাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যে কোন অসন্তোষজনিত বিক্ষোভে এই শ্রেণীর সৈনিকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মনোভাবও কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বলতে পারা যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ করা হয়নি, নিছক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ধ্বনি ও পতাকা ইত্যাদিকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈনিকের দ্বারা কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহ সম্ভব হয়নি—এটা সাধারণ ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পেশোয়ারে গড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলী চালনার নির্দেশ অমান্য করে। এই ঘটনা অবশ্যই রাজনৈতিক ঘটনা, গড়োয়ালী সৈনিকেরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের দ্বারাই চালিত হয়ে হুকুম-ই-সাহেবান ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করেছিল। ভারতীয় সৈনিকের দ্বারা এই

ধরণের আরও দুই একটা রাজনৈতিক কীর্তি আরও দু এক ক্ষেত্রে অবশ্য হয়েছে—সেগুলি কয়েকটা খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত এবং আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

আমরা ব্রিটিশ পরিচালিত ও ব্রিটিশের উদ্যোগে গঠিত ভারতীয় সৈনিকের কথাই এতক্ষণ বলে আসছি। প্রাক্‌ব্রিটিশ শাসনযুগেও তো ভারতীয় সৈনিক ছিল! তারা কি দেশপ্রেমিক বাহিনী (Patriotic Army) ছিল?

হিন্দুযুগে দেশপ্রেমিক বাহিনী অবশ্যই ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, হিন্দুযুগে রাজ চক্রবর্তী মহারাজাধিরাজগণ সকলেই দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তাঁদের সৈন্য সামন্তেরা সকলেই দেশপ্রেমিক ছিল। হিন্দু যুগেও ভাড়াটিয়া সৈনিক ছিল এবং এমন কি একেবারে বিনামূল্যে বেগার-খাটিয়ে সৈনিক ছিল যারা রাজার হুকুমে বস্তুতঃ বিনা পয়সাতেই প্রাণ দিত আর নিত। তা ছাড়া, সত্যি সত্যি অসিজীবী বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ একেবারে পেশাদার (professional) সৈনিক খুবই বেশী ছিল এবং তাদের ভাড়াটিয়া (mercenary) বলিলে কোন দোষ হয় না।

মুসলমান শাসন আরম্ভ হবার পর (পাঠান এবং মোগল যুগে) ভারতবর্ষে দেশপ্রেমিক বাহিনী বলে আর কিছু সম্ভব হয় নি, এই যুগে অসিজীবী সৈনিক (professional) এবং ভাড়াটিয়া সৈনিক নিয়েই রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠিত হতো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকের মধ্যে সিপাহীগিরি একটা জীবিকা বা বৃত্তি হয়ে ওঠে। মুসলমান সৈনিকের পক্ষে এই যুগে দেশপ্রেমিক হওয়ার কোন কারণই ছিল না। অভিযানকারী ফৌজের (Invading Army) রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীই তাদের মধ্যে প্রবল ঐতিহ্যরূপে সজীব হয়েছিল। পাঠান-মোগল যুগে

ভারতের কোন কোন স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হিন্দু রাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা অবশ্যই ছিল এবং তারাই ভারতভূমিতে বহু হলদিঘাট রচনা করেছে। তার অনেকদিন পরে, শিবাজী ও পেশোয়াদের বাহিনীকেই ভারতের দেশপ্রেমিক বাহিনীর একমাত্র দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু এই দেশপ্রেমও ঠিক ভারতীয় বা জাতীয় দেশপ্রেম ছিল না। সেদিনের মারাঠা বাহিনীর দেশপ্রেমকে 'গোষ্ঠীগত দেশপ্রেম' (Group Patriotism) বলা যেতে পারে।

হিন্দুযুগের ভারতবর্ষের সৈনিক একটা বিষয়ে পরবর্তী যুগের অথবা আধুনিক যুগের ভারতীয় সৈনিকের চেয়ে উন্নত ছিল। 'ক্ষত্রিয়াচরণ' নামে এমন একটি নৈতিক সমর-বিধান (Military Code) ছিল যার দ্বারা হিংস্র হত্যার শিল্পকেও একটা আদর্শের মধ্যে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল। হিন্দুযুগের সৈনিক ভাড়াটিয়া হোক্ অথবা দেশপ্রেমিক হোক্, যোদ্ধার রীতিনীতি ও ধর্ম নামে যে আদর্শ তার কাছে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে মহত্ত্বের উপাদান আছে। ক্ষত্রিয় সেনাপতির চতুরঙ্গ বলোপেত সেনা পাইকারীভাবে বিপক্ষকে হত্যা করেছে ও বিপক্ষের রাজ্য লুণ্ঠন করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই সংহার-ক্রিয়ার মধ্যেও কতগুলি নীতি ছিল—নিরস্ত্রকে আক্রমণ না করা, নারী ও শিশু হত্যা না করা, ক্ষমাপ্রার্থী শত্রুকে ক্ষমা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দুযুগের সৈনিক সকলেই যে এই ক্ষাত্র-সংহিতার প্রত্যেকটি নীতি অনুসারে যোদ্ধার ধর্ম পালন করেছে, এতটা বললে মাত্রাহীন কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এমন কি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কুরুপক্ষের কর্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট সেনানায়ককে পার্থ মহাবীর যে কৌশলে নিধন করেছিলেন, তাকে ক্ষত্রিয়ত্ব বা মহারথী প্রথা বলা চলে না। মোটের ওপর

বলা যায়, ক্ষাত্রধর্ম নামে যে শাস্ত্রীয় নীতি একদিন প্রচলিত হয়েছিল, তার প্রভাব পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে কিছু না কিছু ছিলই, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। সেই প্রাচীন ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ ও আজকের হুকুম-ই-সাহেবান—অনেক পার্থক্য।

এই হলো ইণ্ডিয়ান আর্মি বা ভারতীয় ফৌজ, যার সাধারণ সৈনিকেরা হলো ভারতীয় আর অফিসারেরা হলো ব্রিটিশ। ভারতীয় ফৌজের এই এক বৈশিষ্ট্য; হুকুম-ই-সাহেবান আদর্শকে বর্ণে বর্ণে এক্ষেত্রে সত্য করা হয়েছে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর শোনা গেল, ভারতীয় ফৌজকে ভারতীয় করা (Indianisation) হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতীয় বাহিনীকে জাতীয় করা (Nationalisation) হবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখেই ঘোষিত এই দুই কথার দ্বারাই, ভারতীয় করা আর জাতীয় করা, পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হচ্ছে যে, এ যাবৎ ভারতীয় বাহিনী ঠিক 'ভারতীয়' ছিল না, এবং 'জাতীয়' ছিল না।

ভারতীয় বাহিনীর ইতিহাসে বর্তমানে যে পরিবর্তনের অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে, সেটা হলো জাতীয়করণ (Nationalisation) —উচ্চ অফিসার থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ পদাতিক পর্যন্ত সকলেই ভারতীয় হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। অফিসারের পদে ভারতীয়েরা নিযুক্ত হচ্ছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা অনুসারে এইটুকুই হলো জাতীয়করণ।

কিন্তু এদিকে দেশের বিরাট রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, অচিরে ভারতীয় রাষ্ট্র এতদিন পরে সত্যি সত্যি জাতীয় রাষ্ট্র হবে। সুতরাং ভারতীয় বাহিনীর সত্যিকারের জাতীয়করণ এইবার সম্ভব হতে পারে।

ভারতের ইতিহাসে আর একটা ঘটনা সম্ভব হতে চলেছে। সহস্র বৎসরের ইতিহাসে পরিচিত ভারতবর্ষের মানচিত্রটি রাজনৈতিক
। হয়ে গেল—ভারত ও পাকিস্থান। এর ফলে ভারতীয় বাহিনীকেও শীঘ্র বা বিলম্বে বিভক্ত করা ছাড়া উপায় নেই এবং করাই উচিত। সুতরাং জাতীয়করণের যে পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল তাকে আবার ঢেলে সাজতে হবে। দুটি রাষ্ট্রের দুটি জাতীয় বাহিনী হবে। কিন্তু তার জন্যে হিন্দুস্থানে সম্পূর্ণ 'হিন্দু. বাহিনী' এবং পাকিস্থানে সম্পূর্ণ 'মুস্‌লিম বাহিনী' গঠিত হবে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। অন্ততঃ হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কোন সাম্প্রদায়িক বাহিনী যে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায়। কারণ এই রাষ্ট্র 'ভারতীয়' রাষ্ট্র হয়েই থাকবে, হিন্দু রাষ্ট্র নয়। মিঃ জিন্না অবশ্য তাঁর পাকিস্থানকে মুস্‌লিম রাষ্ট্র আখ্যা দিয়েছেন। প্রধান ভারতবর্ষের সঙ্গে চিরবিরোধে কোন আদর্শ যদি তাঁর না থাকে, তবে পাকিস্থানেও জাতীয় বাহিনী অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক বাহিনী গঠিত হবে অনুমান করা যায়।

বর্তমানে ভারতীয় ফৌজে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক কত, তার দুটো হিসেব উদ্ধৃত করা হলো:

(১) ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার মিলিটারী সংবাদদাতা লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল মার্টিন ২২শে নবেম্বর ১৯৪৬ তারিখে উক্ত পত্রিকায় ভারতীয় ফৌজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত সম্বন্ধে লিখেছেন:

হিন্দু (গুর্খাসমেত)	৫৪.৭	%
মুসলমান	৩৪	%
শিখ	৭	%
অন্যান্য	৫	%

(২) টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার নয়াদিল্লীর সংবাদদাতা ভারতীয় ফৌজে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত সম্বন্ধে ১৪ই মে (১৯৪৭) তারিখে উক্ত পত্রিকায় এই হিসাব দিয়েছেন:

সম্প্রদায়	অফিসার শ্রেণী	অন্যান্য শ্রেণী (Other Ranks)
হিন্দু	৪৭·৮ %	৫৫·৭ %
মুসলমান	২৩·৭ %	৩৩·৮ %
শিখ	১৬·৩ %	৭·৫ %
অন্যান্য	১২·২ %	৩·৭ %

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ সেনানায়ক কুঠির দেশীয় (নেটিভ) দারোয়ান ও পাহারাওয়ালাদের একটু ড্রিল প্যারেডের কায়দায় প্রথম দুরস্ত করে যে দলটি তৈরী করেছিলেন, সেটিই বর্তমান ভারতীয় বাহিনীর বীজ। তারপর থেকে ব্রিটিশের বহু কূটনীতি, বহু দূরদৃষ্টি, বহু অভিসন্ধি ও সাম্রাজ্যিক আকাঙ্খার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজাকার ভারতীয় ফৌজ বর্তমানে মহীরুহরূপে ইণ্ডিয়ান আর্মিতে পরিণত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই ইণ্ডিয়ান আর্মি ভারতের জাতীয় গৌরব নয়, এটা ইংরাজের গৌরব। ব্রিটিশগঠিত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস অবনত ভারতের ইতিহাস।

তবু আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার তোরণদ্বারে পৌঁছে জাতীয় ভারত এই ব্রিটিশগঠিত ভারতীয় বাহিনীকেই জাতীয় সম্পদরূপে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত। কেন? কারণ, বর্তমান ব্রিটিশ-চালিত ভারতীয় বাহিনী জাতীয় পরিচালনায় আসামাত্র সেই পুরাতন হুকুম-ই-সাহেবান ঐতিহ্য চিরকালের মত বাতিল হয়ে যাবে। পতাকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের মনের রঙ বদলে যেতে বাধ্য। যাকে এতদিন ভারতের জনসাধারণ ঘর-

জ্বালানো আগুন ভাবতো, তাকেই ঘরের প্রদীপ বলে মনে হবে। যা এতদিন দখলদার বাহিনীরূপে দেশের বুকে চেপে বসেছিল, তাই এবার দেশরক্ষা বাহিনীরূপে দেশের সহায় হয়ে উঠবে।

বর্তমান ভারতের জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অকিনলেক ভারতীয় ফৌজকে নতুন করে কতগুলি আবেদন শুনিয়েছেন। তার মধ্যে সত্যিসত্যিই ভাল কথা অনেক আছে। "ভারতীয় ফৌজ যেন আসন্ন 'নতুন ভারতকে' সেইরকম নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে সেবা করে যেরকম নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে তারা অতীত ভারতকে সেবা করেছে।" জঙ্গীলাট স্যার ক্লড ভারতীয় ফৌজকে তার গৌরবময় 'ঐতিহ্য' অটুট রাখবার জন্যেও আবেদন করেছেন।

কথাগুলি শুনতে ভাল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোন অর্থ এর মধ্যে পাওয়া যায় না। ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশ-শাসিত জীবনে দেশের প্রতি এ যাবৎ যে ধরণের নিষ্ঠার নিদর্শন দেখিয়ে এসেছে, নতুন ভারতে ঠিক সেই ধরণের নিষ্ঠা তাদের কাছে কেউ চাইবে না, নতুন ধরণের নিষ্ঠাই আশা করবে। আর ঐতিহ্য?

বৃটিশ সৈনিকের ঐতিহ্য, সে তার অস্ত্র ঝনৎকারের সঙ্গে মদভরে গান গেয়েছে:—

"Rule Britannia! Britannia rules the waves,
Britons never shall be slaves.

ফরাসী সৈনিকের ঐতিহ্য, সে তার প্রাণের আবেগ ঢেলে 'মার্সেইয়েজ' গায়:—

"Allons enfent de les patri
Le jour de les gioire et arrivezh."

আয় পিতৃভূমির সন্তানগণ, গৌরবের দিন এসেছে।

আর ভারতীয় সিপাহীর ঐতিহ্য, সে গত দু'শো বছর ধরে সমুদ্রোপকূল থেকে সুরু ক'রে হিন্দুকুশের হিমনদ পর্যন্ত, খৈবার থেকে চীন পর্যন্ত, মরু-অরণ্যে ও গিরি-প্রান্তরে ব্যাগপাইপের অনুনাসিক বিলাপের সঙ্গে এক উদ্ভট দাস্য গজল গেয়ে ফিরেছে:

"কভি সুখ আওর কভি দুখ
হম্ আংরেজকা নওকর"—

কখনো সুখ এবং কখনো দুঃখ, আমি ইংরাজের চাকর।

এই ঐতিহ্য যত শীঘ্র লুপ্ত করে দেওয়া যায়, ততই ভাল।
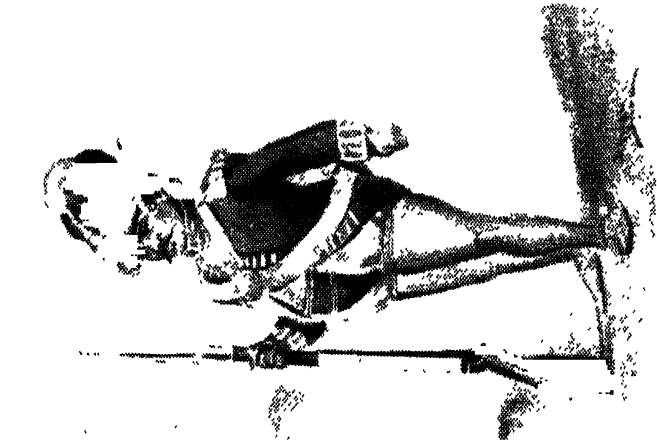
বোম্বাই গ্রেণেডিয়ার (১৮০১)
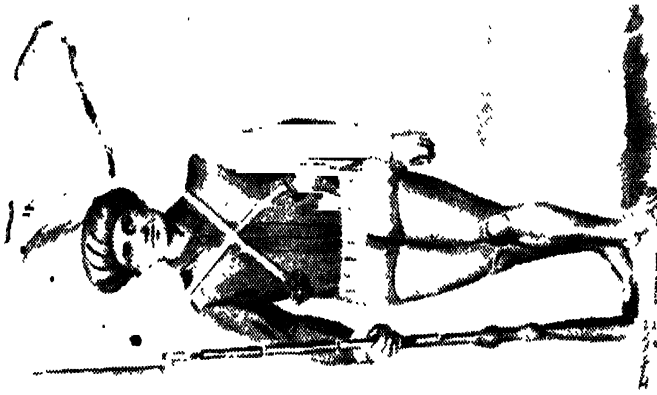
মারাঠা সিপাহী (১৭৭৩

সিপাহী (বেঙ্গল পদাতিক ১৮১৭)

গভর্ণর জেনারেলের বডিগার্ড (১৮১৫)

কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী

ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে প্রথম সংগঠনের অধ্যায় হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ। ইংরাজের কুঠি পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত দেশীয় দারোয়ানদের নিয়ে প্রথমে এক একটা ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। তারপর কোম্পানীর সামরিক উদ্যোগ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি এই নবগঠিত সিপাহী বাহিনীকেও সংখ্যাপুষ্ট করা হতে থাকে। কুঠির দারোয়ানদের নিয়ে গঠিত ব্যাটালিয়নগুলি অল্পকাল মধ্যে কোম্পানীর তিনটি বিখ্যাত প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে পরিণত হয়—বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী।

এই তিন প্রেসিডেন্সী বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হতো। কারণ ইংরাজের তিনটি ব্যবসায়িক উপনিবেশ—বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলকাতার অবস্থান বহু দূরত্বের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন ছিল, পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব ছিল না। ১৭৪৮ সালে এই তিনটি পৃথক প্রেসিডেন্সী বাহিনী মাত্র কাগজে কলমে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং ভারতীয় বাহিনী (Indian Army) নামটিও এই সময় প্রথম ব্যবহার করা হয়। প্রথম জঙ্গীলাট (Commander-in-chief) হলেন মেজর ষ্ট্রিংগার লরেন্স (Major Stringer Lawrence)। বাস্তবক্ষেত্রে তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা পৃথক হয়েই থাকে।

এই সময় ভারতবর্ষে বহু বিভিন্ন রাজশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছে—ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ এবং অনেকগুলি দেশীয় রাজশক্তি। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

তখন বস্তুতঃ রণক্ষেত্রে পরিণত, উত্থান, পতন ও সংঘর্ষের মধ্যে প্রতিনিয়ত অস্থির। এই সময়েই ব্যবসায়ী ইংরাজ তার রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করে ফেলে এবং এর পর থেকে ভারতে ইংরাজের সামরিক নীতি ও সৈন্য সংগঠন সম্পূর্ণভাবে এই এক রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছে।

ক্লাইভের রাজনৈতিক আদর্শ—য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহী

এই রাজনৈতিক আদর্শের ঋষি(?) হলেন ক্লাইভ সাহেব। এক রাজ্য ও এক রাজা—ভারতবর্ষ হবে একটি রাজ্য এবং তার একমাত্র রাজা হবে ইংরাজ। মোগল নয়—ফরাসী, পর্তুগীজ ডাচ কেউ নয়। এই নীতি গৃহীত হবার পর থেকে ইংরাজ কোম্পানীর সামরিক নীতির মধ্যে ব্যবসায়িক নীতিই প্রধান হয়ে রইল না, রাজনীতিই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

১৭৫৭ সালে ক্লাইভ ভারতীয় সিপাহী বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠন করেন। এতদিন পর্যন্ত সিপাহীরা নিজেদের দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করতো। তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রও তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং সিপাহীদের দলগুলি তাদের স্বজাতীয় দলপতির (Officer) দ্বারাই পরিচালিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কোম্পানী বাহাদুরের ইংরাজ বাহিনীর পক্ষে কাজ করতো। ক্লাইভ এই প্রথা বদলে দিলেন। দেশীয় সিপাহীদের জন্যও য়ুরোপীয় সৈনিকের মত পরিচ্ছদের (Uniform) ব্যবস্থা করা হলো। উন্নত য়ুরোপীয় মডেলের অস্ত্রশস্ত্রও সিপাহীদের হাতে দেওয়া হলো এবং দেশীয় দলপতি অফিসার সরিয়ে দিয়ে সমস্ত

অফিসারের পদে ইংরাজ সৈনিককে নিযুক্ত করা হলো। ক্লাইভ প্রবর্তিত এই পদ্ধতির কতগুলি বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীতে বজায় রাখা হয়েছিল।

অবশ্য ভারতীয় সিপাহীকে নিয়ে আধুনিক বাহিনী গঠন করার সুবিধা ও সার্থকতা সর্বপ্রথম ফরাসীরাই বুঝতে পেরেছিল এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে প্রথম য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহীফৌজও গঠন করে। ডুপ্লে (Dupleix) কর্ণাটের মুসলমান-দের ভেতর থেকে সিপাহী সংগ্রহ করে প্রথম এই ধরণের বাহিনী গঠন করেন। তাঁর দেখাদেখি মেজর স্ট্রিংগার লরেন্স মাদ্রাজে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই পদ্ধতিতে একটি দেশীয় বাহিনী গঠন করেছিলেন।

প্রথম অবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ ফৌজও খুব সুগঠিত ছিল না। কোম্পানীর ইংরাজ সৈনিক স্বদেশ থেকে আমদানী করা তো হতোই, তা ছাড়া যত পলাতক শ্বেতাঙ্গ নাবিক, ছত্রভঙ্গ বা ভেঙে-দেওয়া ফরাসী বাহিনীর যত সৈনিক, সুইস ও হানোভারিয়ান ভ্যাগাবণ্ড ও শ্বেতাঙ্গ যুদ্ধবন্দী—সবই ইংরাজ ফৌজে ভর্তি করা হতো। এক কথায় বলা যায়—ভারতবর্ষে জীবিকার জন্য আগত যেকোন 'সাদা মাল' ('any white material in search of livelihood') পাওয়া যেত তাকেই ইংরাজ বাহিনীতে ভর্তি করা হতো। (১)

প্রথম অবস্থায় এই সব শ্বেতাঙ্গ সৈনিক দলগুলি মাত্র এক একটি সামরিক কোম্পানী রূপে গঠিত হয়েছিল। ১৭৪৮ সালে ইংরাজ ফৌজকেও নতুন করে সংগঠিত ও উন্নত করা হয়।

*(১) The Armies of India—Major McMunn

বহু বিচিত্র ও বহু বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই সব ছাড়া ছাড়া সৈন্য কোম্পানীগুলিকে রেগুলার বাহিনীতে পরিণত করা হয়।

১৭৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের রাজকীয় (Royal) বাহিনী উপস্থিত হয়—৩৯নং ইংরাজ পদাতিক।

ফরাসী শক্তি, মারাঠা শক্তি ও মহীশূর শক্তির (হায়দার-টিপু) বিরুদ্ধে ক্ষান্তিহীন সংঘর্ষ ও অভিযানের ভিতর দিয়েই তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী বড় হয়ে গড়ে উঠতে থাকে, ফলে প্রেসিডেন্সী বাহিনীগুলির ব্রিগেড বিন্যাস ক'রে আর এক দফা উন্নতি করা হয়। ১৭৯৩ সালে পণ্ডিচেরীর পতনের সঙ্গে ভারতের ফরাসী শক্তির বস্তুতঃ মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। এর পর থেকে ফরাসী শক্তি ভারতবর্ষে কূটনৈতিক শক্তিরূপেই আরও কিছুকাল টিকে থাকে, কিন্তু রাজশক্তি বা সামরিক শক্তিরূপে নয়। এর পর ফরাসীরা প্রধানতঃ দেশীয় রাজশক্তির মারফৎ তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শকে সার্থক করার নতুন পন্থা গ্রহণ করে এবং বহু দেশীয় রাজশক্তির দেশীয় বাহিনীতে ফরাসীরা সেনানায়করূপে কাজ গ্রহণ করে। কোন কোন দেশীয় রাজশক্তির বাহিনী ফরাসী রণগুরুর কাছে ট্রেনিং নিয়ে সামরিক দক্ষতায় ইংরাজ বাহিনীর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পেরেছিল। ফরাসী সেনানায়কদের শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহ্য বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৯১১ সালে পর্যন্ত দেখা গেছে যে কোন কোন দেশীয় রাজ্যের হাবিলদার ফরাসী ভাষায় কম্যাণ্ডের হাঁক দিয়ে সিপাহীদের ড্রিল ও প্যারেড পরিচালনা করছে।

ফরাসী শক্তির পতনের পর অল্পকাল মধ্যেই মহীশূর শক্তির সঙ্গে ইংরাজের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে এবং টিপু সুলতান তখনো হীনবল হননি। এটা হলো ১৭৯৫ সাল।

ভারতীয় বাহিনীর প্রথম সংস্কার সাধন

এই সময়ে ভারতে ইংরাজের সমস্ত বাহিনীকে নতুন ভাবে একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সংগঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইংরাজ বাহিনীর সংখ্যাশক্তি এই সময় ছিল:
(১) ইংলণ্ডরাজের ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ সৈনিক সবশুদ্ধ ১৩ হাজার। (২) বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের দেশীয় সিপাহীর সংখ্যা ৩৩ হাজার।

নতুন সংগঠনের ফলে গোলন্দাজ কোম্পানীগুলিকে ব্যাটালিয়নে এবং সওয়ার দলগুলিকে রেজিমেণ্টে পরিণত করা হয়। পদাতিক বাহিনীকেও বিভিন্ন রেজিমেণ্টরূপে বিন্যস্ত করা হয়—দুই ব্যাটালিয়ন নিয়ে এক একটি রেজিমেণ্ট।

দেশীয় সিপাহীদের ব্যাটালিয়নগুলিকে নতুন করে নম্বর বিভাগ করা হয়। এর ফলে যে ব্যাটালিয়নের নম্বর হয়তো ছিল চার, তার নতুন নম্বর হলো সতের। ভারতীয় বাহিনীর এই নম্বর পরিবর্তনের ব্যাপার বহু বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। একবার দু'বার নয়—পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি নতুন সংগঠনের সময় বহু ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেণ্টের নাম এবং নম্বর পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমানে কোন বাহিনীর নাম ও নম্বরকে তার প্রাক্তন কীর্তি ও ইতিহাসের পরিচয়রূপে গ্রহণ করলে ভুল হবে। অতীতের কোন মাদ্রাজী ব্যাটলিয়নের নাম নম্বর ও কীর্তির পতাকা আজ হয়তো কোন পাঞ্জাবী রেজিমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়ে রয়েছে। যাই হোক্, ১৭৯৫ সালে নতুন নম্বর বিভাগের পর তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী, সত্যিকারের রেগুলার বাহিনীর রূপ গ্রহণ করে। শেতাঙ্গ ফৌজের কোন নম্বর পরিবর্তন হয়নি। দেশীয় সিপাহী ও ইংলণ্ডের

রাজকীয় ফৌজ—উভয় ফৌজের সৈনিকেরা একই ধরণের পরিচ্ছদ বা উর্দি ধারণ করতো। তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীকে এইভাবে গঠিত করা হয়:—

(১) বেঙ্গল বাহিনী—

(ক) য়ুরোপীয় গোলন্দাজ—তিনটি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের পাঁচটি করে কোম্পানী;

(খ) য়ুরোপীয় পদাতিক—তিনটি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি করে কোম্পানী;

(গ) দেশী সওয়ার—চারটি রেজিমেণ্ট;

(ঘ) দেশী পদাতিক—চারিটি রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকের ছ'টি করে ব্যাটালিয়ন।

(২) মাদ্রাজ বাহিনী—

(ক) য়ুরোপীয় গোলন্দাজ—ছ'টি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের পাঁচটি করে কোম্পানী। এ ছাড়া এর সঙ্গে পনেরটি দেশী লস্কর কোম্পানী;

(খ) য়ুরোপীয় পদাতিক—ছ'টি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি করে কোম্পানী;

(গ) দেশী সওয়ার—চারটি রেজিমেণ্ট;

(ঘ) দেশী পদাতিক—এগারটি রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকের ছ'টি করে ব্যাটালিয়ন।

(৩) বোম্বাই বাহিনী—

(ক) য়ুরোপীয় গোলন্দাজ—ছয়টি কোম্পানী;

(খ) য়ুরোপীয় পদাতিক—দু'টি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি করে কোম্পানী;

(গ) দেশীয় পদাতিক—চারটি রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকের দু'টি ক'রে ব্যাটালিয়ন। এ ছাড়া একটি নৌ-ব্যাটালিয়ন।

সিপাহীরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন?

এই তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর দেশীয় সৈনিকেরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন? স্থানীয় জনসাধারণের ভেতর থেকেই সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ হতো কি? উত্তর হলো—না। ভারতীয় বাহিনী গঠনের ব্যাপারে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের একটা বিশেষ কূটনৈতিক সতর্কতার সূচনা তখন থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজের সিপাহীরা সবই মাদ্রাজী ছিল না, বোম্বাইয়ের সিপাহীরা সবই কোঁকানী মারাঠা ছিল না এবং বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীরা বাঙ্গালী ছিল না।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীতে প্রথম দিকে অজস্র সংখ্যায় ভাড়াটিয়া আরব আফগান ও রোহিলা সৈনিক গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সময়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যিক বাহিনী শতছিন্ন হয়ে গেছে। সৈনিকেরা পেশাদার হয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জীবিকা খুঁজে বেড়াতো। যে বেশী পয়সা দেবে, তার পক্ষেই তলোয়ার বা বন্দুক ধরতে হাজার হাজার পেশাদার সৈনিক পাওয়া যেত। ইংরাজের বোম্বাই ও মাদ্রাজ বাহিনীতে এইসব উত্তর ভারতীয় মুসলমান পেশাদার সৈনিক যথেষ্ট সংখ্যায় ভর্তি হয়। এ ছাড়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সমাজ থেকেও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে। স্থানীয় রিক্রুটের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল উত্তর ভারতীয় পেশাদার সৈনিকদের জারজ সন্তান এবং অবনত শ্রেণীর হিন্দু—যারা উভয়েই

বিলাতী খাদ্য ও ইংরাজের ছোঁয়া খাদ্য গ্রহণে কোন দ্বিধা করতো না। আর একটা বিশেষ কারণে এই শ্রেণীর লোককে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ফৌজে ভর্তি করতেন। সেটা হলো—'এরা আনন্দের সঙ্গে তাদের অত্যাচারী উঁচু জাতের লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করতো।' (gladly fought the high-caste races that had oppressed them.) (2).

কিছুদিন পর অবশ্য মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীতে স্থানীয় সমাজের লোককেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় ভর্তি করা হয়। তবে বেঙ্গল বাহিনীতে কোন কালেই বাঙ্গালী ভর্তি করা হয়নি।

এ সময় ভারতে ইংরাজের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যেসব রাজশক্তি ছিল তারা অধিকাংশই হিন্দু। সুতরাং অবনত শ্রেণীর হিন্দুর সামাজিক মনের ক্ষোভকে এবং ভাড়াটিয়া আফগান আরব রোহিলা ও তাদের জারজদের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে হিন্দু-বিদ্বেষের কাজে ভালভাবে লাগানো যেতে পারে, এটা ইংরাজ কূটনীতিকেরা বুঝেছিলেন। ইংরাজ রাজ বুঝেছিলেন, ভারতে যে সমাজ হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন, হিন্দু বলতে যারা গর্ব করে, তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে একটা দেশগর্বও থাকবে। সেই হেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুর আনুগত্য সম্বন্ধে ইংরাজ রাজের মনে সন্দেহ ছিল। একমাত্র বেঙ্গল বাহিনীতে এই কূটনীতিকে সুরু থেকেই ইংরাজ বাহাদুর কায়েম করতে পারেননি। সম্ভবতঃ বাস্তব অবস্থার চাপে পড়েই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে বিহার ও আউধের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতকে অধিক সংখ্যায় ভর্তি করতে হয়েছিল। ইংরাজের সন্দেহ যে অভ্রান্ত ছিল, তা ঘটনার দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

*(২) The Armies of India—Major McMunn

১৮৫৭ সালের যে ভয়ানক সিপাহী অভ্যুত্থানে ইংরাজের ভারতীয় মসনদ সাময়িকভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেটা বলতে গেলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীর ব্রাহ্মণ-রাজপুত সিপাহীর জাতিগর্ব, সংস্কৃতি-গর্ব ও দেশ-গর্বের অভ্যুত্থান।

ইংরাজের সার্বভৌমত্বের প্রথম স্বপ্ন

১৭৯৮ সালে লর্ড মর্ণিংটন (পরবর্তীকালে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি) গভর্ণর জেনারেল হন। ক্লাইভের মত ইনিও ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে একমাত্র সার্বভৌম রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপক সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। ভারতে ফরাসী রাজশক্তির পতন ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ভারতের টিপু সুলতান, সিন্ধিয়া, হোলকার ও ভোঁসলা প্রভৃতি রাজশক্তির সঙ্গে সামরিক মৈত্রী স্থাপনের উদ্যোগ করছিলেন। ওয়েলেসলি অনতিবিলম্বে 'মহীশূরের বাঘ' টিপু সুলতানের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং জেনারেল লেক সিন্ধিয়ার মারাঠা বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেকে হয়তো পড়েছেন—'সিন্ধে আসিছে সঙ্গে তাহার ফিরিঙ্গী সেনাপতি।' দ্য বয়নে (De Boigne) ও পেরোঁ (Perron) নামে দু'জন সমরবিজ্ঞানী ফরাসী অধ্যক্ষের দ্বারা সিন্ধিয়ার মারাঠা বাহিনী শিক্ষিত হয়েছিল।

এর পর দেশীয় রাজশক্তির হাতে ব্রিটিশ রাজশক্তি দু'টি সংঘর্ষে এমন পাল্টা মার খায় যে, ভারতের জনসাধারণের মনে ইংরাজ সাহেবের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মোহ ভেঙে যেতে আরম্ভ করে। একটা হলো, হোলকারের বাহিনীর কাছে কর্ণেল

মনসন-চালিত ইংরাজ বাহিনীর পরাজয় এবং দ্বিতীয়টী হলো, জাঠ রাজশক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ ভরতপুর অধিকারে ইংরাজের ব্যর্থতা।

'সিল্লাদার' প্রথা

এই যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে ইংরাজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দ্রুত বাড়ানো হতে থাকে। সুনির্দিষ্ট সামরিক রেগুলেশন দ্বারা বাহিনী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই প্রকৃত রেগুলার বাহিনীর সঙ্গে এই সময় অ-রেগুলার বাহিনীও যুক্ত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে সিল্লাদার প্রথার কথা উল্লেখযোগ্য।

সিল্লাদার হলো, সে সময়ের এক একজন ফৌজী সর্দার যারা একদল সওয়ার পুষে রাখতো এবং ইংরাজের কাছ থেকে খরচা স্বরূপ একটা নিয়মিত বৃত্তিও পেত। ইংরাজের কাছ থেকে আহ্বান আসলেই এই সব সিল্লাদার নিজেদের ঘোড়সওয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইংরাজদের পক্ষে যুদ্ধে উপস্থিত হতো। যুদ্ধের জন্য আর এক দফা থোক টাকা এরা লাভ করতো। এই শ্রেণীর সওয়ার বাহিনীতে ইংরাজ অফিসার খুব সামান্যই নিয়োগ করা হতো। এই সিল্লাদার বাহিনী বস্তুতঃ তৎকালীন অ-রেগুলার দেশীয় বাহিনীর প্রধান নমুনা: এই প্রথা বহুদিন পর্যন্ত, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, ভারতীয় বাহিনীতে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু রেগুলার ভারতীয় বাহিনীতে দেশীয় অফিসারের সংখ্যা না-থাকার মতই ছিল। এক একটি সিপাহী ব্যাটালিয়নে ২২ জন করে ইংরাজ অফিসার থাকতো। কৃতিত্বের কারণে কোন জমাদার সুবাদার বা হাবিলদারকে পদোন্নত করার নিয়ম ছিল না। সুদীর্ঘকাল সার্ভিস করার পর মাথার চুলে যখন পাক ধরে গেছে, মাত্র তখনই বিশেষ কোন সৌভাগ্যবান জমাদার বা হাবিলদারের

হয়তো একধাপ পদোন্নতি হতো। চিলিয়াঁওয়ালার রণক্ষেত্রে আজও যে প্রাচীন সমাধির ট্রেঞ্চ রয়েছে, তাতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ সুবাদারের সমাধিতে উৎকীর্ণ পরিচয়লিপিতে দেখা যায় যে, রণক্ষেত্রে মৃত্যুকালে কারও বয়স ৬৫, কারও বয়স ৭৫ হয়েছিল!

ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কাছে সে সময়ের রেগুলার সিপাহী ফৌজের সমাদরই ছিল বেশী। অরেগুলারদের ওপর তেমন নয়। বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই ধারণা ছিল যে, অরেগুলার ভারতীয় ফৌজ (সিল্লাদার ইত্যাদি) যুদ্ধক্ষেত্রে খুব বড় একটা সহায় নয়। কিন্তু আফগান ও শিখ যুদ্ধেই এই ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে যায়। অরেগুলার ভারতীয় ফৌজের সামরিক কুশলতা এবং সামরিক অভিযানে এর প্রয়োজনের গুরুত্ব ভালভাবেই প্রমাণিত হয়।

রেগুলার ও অরেগুলার

ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিবরণীতে এবং ফৌজ-তালিকায় (Army List) রেগুলার (Regular) এবং অরেগুলার (Irregular) এই দুটো কথা সর্বদা ব্যবহার করেছেন। এই দুটী কথার অর্থ কি? এবং উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্যই বা কি?

ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সামরিক অভিযানে লিপ্ত হন। বস্তুতঃ পলাসীর যুদ্ধ (১৭৫৭) থেকে আরম্ভ করে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের (১৮৫৭-৫৮) কাল পর্যন্ত ভারতে ইংরাজের সামরিক উদ্যোগ এবং সামরিক সংঘর্ষের কোন বিরাম হয়নি। রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজও বড় হয়ে ওঠে, আরও নতুন নতুন ফৌজ

গঠিত হতে থাকে। পদাতিক এবং সওয়ার উভয় ফৌজই সংখ্যায় এবং আকারে বড় হতে থাকে।

প্রথম দিকে কোম্পানীর ফৌজ রেগুলার ফৌজ হিসাবে গঠিত হয়। অর্থাৎ ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষের রেগুলেশন (বিধিব্যবস্থা) অনুসারে নিয়ন্ত্রিত, ইংলণ্ডের রাজকীয় গোরাফৌজের (King's Troops) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, য়ুরোপীয় সৈনিকের অনুরূপ উর্দিতে ভূষিত, বহুল সংখ্যায় ইংরাজ অফিসার দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ফৌজই 'রেগুলার' ফৌজ। খাস ব্রিটিশ লাইনের যে ধরণের গঠনতন্ত্র ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রও সেই ধরনের করা হয় এবং এটাই হলো তথাকথিত রেগুলার প্রথা। রেগুলার ভারতীয় ফৌজের দেশীয় অফিসারের বস্তুতঃ পরিচালন ক্ষমতা বলে কিছু ছিল না। রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ অফিসারেরাই ভারতীয় রেগুলার ফৌজকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতেন। কৃতিত্ব ও দক্ষতার জন্য কোন ভারতীয় সৈনিককে পদোন্নত করার নিয়ম ছিল না। ছিল বয়স হিসাবে অর্থাৎ সার্ভিসের কার্যকালের পরিমাণ অনুসারে পদোন্নতি করার পদ্ধতি। সুতরাং দেশীয় অফিসারেরা অনেকেই ছিলেন বৃদ্ধ, চুল না সাদা হ'লে পদোন্নতির সুযোগ আসতো না। অবশ্য বড় বড় যুদ্ধের সময় বাধ্য হয়ে দেশীয় অফিসারকে সাক্ষীগোপাল করে না রেখে পরিচালন ক্ষমতাসম্পন্ন পদ (Commissioned Rank) দিতে হতো।

অপরদিকে অরেগুলার (Irregular) ভারতীয় ফৌজে ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্যা ছিল কম। দেশীয় অফিসারের হাতে সৈন্য পরিচালনের ক্ষমতা ছিল। সওয়ার ফৌজে সিল্লাদার প্রথার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এটাও বস্তুতঃ অরেগুলার প্রথা। সিল্লাদার প্রথার ঐতিহ্য ভারতীয় সওয়ার ফৌজে প্রায় স্থায়ী হয়ে থাকে। প্রথম

দিকে এই প্রথা ছিল—জনৈক দেশীয় সওয়ারকে (সিল্লাদার) ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ অর্থ দিতেন। তার বদলে সিল্লাদার নিজের ঘোড়া, নিজের অস্ত্র, নিজের উর্দি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ পক্ষে লড়াই করার জন্য উপস্থিত হতো। শেষ দিকে প্রথাটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়—একটা সওয়ার রেজিমেণ্টে মাথা প্রতি একটা খরচ ধরে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট রেজিমেণ্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার নিজের উদ্যোগে সওয়ার, ঘোড়া, উর্দি ইত্যাদি সমস্ত লোক ও উপকরণ সংগ্রহ করেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে শুধু অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। আর একটা নির্দেশ ছিল, সওয়ারের উর্দি যেন একধরনের হয়। সিল্লাদার প্রথায় গঠিত দেশীয় সওয়ার ফৌজেও দেশীয় অফিসারদের সংখ্যা বেশী, পরিচালন ক্ষমতা এবং দায়িত্বও দেশীয় অফিসারদের উপর অনেকটা ছেড়ে দেওয়া হতো।

ভারতীয় সওয়ার ফৌজ একটা কুলীন শ্রেণীর ফৌজ। শুধু পারিপাট্যের দিক দিয়েই এরা কুলীন নয়, সওয়ারেরা জাত হিসাবে কুলীন। নিতান্ত দরিদ্র কৃষক সাধারণতঃ সওয়ার ফৌজে আসে না। সম্পন্ন কৃষক সমাজ থেকেই অধিকাংশ সওয়ার সংগৃহীত হয়।

অরেগুলার (Irregular) কথাটার দ্বারা ঠিক একটা বিশেষ রকমের গঠনতন্ত্র বোঝায় না। য়ুরোপীয় রেজিমেণ্টাল গঠনতন্ত্রের প্যাটার্ণ অনুকরণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে কেতাদুরস্ত দেশীয় ফৌজ গঠন করেছিলেন সেগুলিকেই সাধারণতঃ রেগুলার ফৌজ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম ক'রে, স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী ক'রে যে ফৌজ গঠিত হয় সেগুলিই অরেগুলার নামে অভিহিত। অরেগুলার ফৌজ কম্যাণ্ডার মহাশয়ের একনায়ক সুলভ আধিপত্যের বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত।

বিদেশে ভারতীয় সিপাহী—সাম্রাজ্যিক বাহিনীরূপে কীর্তিকলাপ

দেশীয় সিপাহীকে ইংরাজের সাম্রাজ্যিক সৈনিকরূপে প্রথম যুদ্ধ করতে দেখা যায় ১৭৬২ সালে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র ৫ বছর পরে। সে সময়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। মাদ্রাজ সিপাহীবাহিনী থেকে একদল সৈনিক সমুদ্র পার হয়ে ফিলিপিন পৌঁছায় এবং স্পেনীয় বাহিনীকে পরাজিত করে ম্যানিলা অধিকার করে।

১৭৯৫ সালে মাদ্রাজ সিপাহী বাহিনীর আর একটি অভিযান সিংহলে প্রেরিত হয় এবং ওলন্দাজ-ফরাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধ পরাভূত করার পর সিংহল দখল করে।

১৭৯৫ সালে মাদ্রাজের সিপাহীরা আর একটি অভিযানে ওলন্দাজদের হারিয়ে দিয়ে মসলা দ্বীপ ও আমবয়না অধিকার করে।

১৮০১ সালে বোম্বাইয়ের ২নং এবং ১৩নং পদাতিক সিপাহী গোলন্দাজ স্যার ডেভিড বেয়ার্ডের (Sir David Baird) পরিচালনায় মিশরে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়।

১৮০৮ সালে বেঙ্গল বাহিনীর একটি সিপাহী দল মাকাও (চীন) দখল করে। ফরাসীরা মাকাও দখলের পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু সিপাহী বাহিনী তার পূর্বেই মাকাও অধিকার করে ফেলে।

১৮১০ সালে ব্রিটিশের বাণিজ্যিক জলপথ নিরুপদ্রব করার জন্য বোম্বাই, বাঙ্গলা ও মাদ্রাজের সিপাহী বাহিনীর কয়েকটি দল ফরাসী অধিকৃত মরিসাস, বুরবঁ ও রোড্রিগ দখল করে।

১৮১১ সালে ওলন্দাজদের কাছ থেকে জাভা (যবদ্বীপ) অধিকারের জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনী প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে

বেঙ্গল সিপাহী বাহিনীর কয়েকটি ভলাণ্টিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং মাদ্রাজের কিছু সওয়ার গোলন্দাজ ও পাইওনীয়ার দলও প্রেরিত হয়। ওলন্দাজরা পরাভূত হয় এবং জাভা ইংরাজের দখলে আসে।

ভারতে ইংরাজের রাজ্যপ্রসার ও সিপাহী বাহিনী

ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো—যার মধ্যে দেশীয় সিপাহীর সহযোগিতা হলো সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ভারতেও তখন ইংরাজের রাজ্যগ্রাসী পরিকল্পনা অনেকখানি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ১৮১৪ সালে—নেপাল অভিযান। জেনারেল অক্টারলোনীর নেপাল অভিযানকে দেশীয় সিপাহীর সহযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত করে। নেপাল যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই গুর্খারা তাদের দুদিন আগের শত্রু ইংরাজের ফৌজে সৈনিকরূপে ভর্তি হতে আরম্ভ করে।

এর পরের ঐতিহাসিক ঘটনা হলো পিণ্ডারী ও মারাঠা রাজশক্তিগুলির সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজের বিরাট অভিযান। ১৮১৭ সালের এই সামরিক সংঘর্ষ ভারতের রাজনৈতিক অদৃষ্টকে চরমভাবে বদলে দিয়ে যায়। কারকী, সীতাবলদি, মহিদপুরে, কড়িগাঁও ইত্যাদি রণক্ষেত্রে ইংরাজ রাজশক্তিকে মারাঠাশৌর্যের আঘাতে শোণিত সিক্ত হতে হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত ইংরাজশক্তিই জয়লাভ করে।

১৮১৭ সালে মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষে ইংরাজের যে ফৌজ নিষ্ঠার সংগে সংগ্রাম করেছিল তার মধ্যে ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রার পরিচালনায় চার ডিভিসন ইংরাজ সৈনিক (Grand Army) এবং স্যার টমাস হিসলপের নেতৃত্বে সাত ডিভিসন সিপাহী

ছিল। এ ছাড়া স্কিনারের সওয়ার (Skinner's Horse) এবং গার্ডেনারের সওয়ার (Gardener's Horse) নামে দুটি স্বতন্ত্র পেশাদার বাহিনীও ইংরাজের সহায়রূপে ছিল। এই দুইটি সওয়ার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা পেশাদার ইংরাজ সাহেব কিন্তু সওয়ারেরা সকলেই দেশীয়।

ষ্টাণ্ডার্ড বা সামরিক পতাকা হস্তে
দফা সওয়ার

"গার্ডেনারে"র সওয়ার

মাদ্রাজী সিপাহী (১৮৩০)
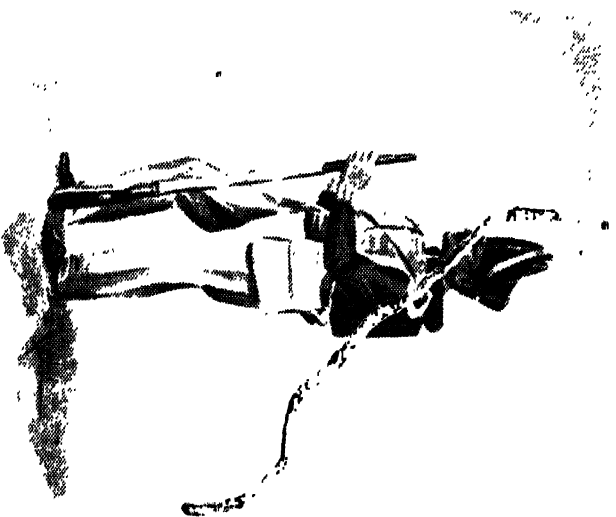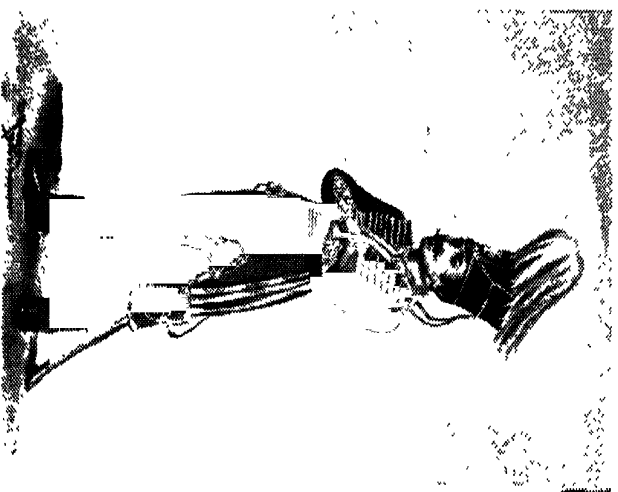
অফিসার (মাদ্রাজ ক্যাভালারি ১৮৪০)

সিপাহী বাহিনী—দ্বিতীয় দফা পুনর্গঠন

১৮২৪ সালে আবার ভারতীয় বাহিনীকে নতুন করে সংগঠন এবং নতুন করে নম্বর বিভাগ করা হয়। দুই ব্যাটালিয়ন নিয়ে রেজিমেণ্ট গঠনের প্রথা বাতিল করা হয় এবং এক ব্যাটালিয়ন প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ব্যাটালিয়নগুলির গঠন-কালের ক্রম অনুসারে পুনরায় নতুন করে নম্বর দেওয়া হয়। যে ব্যাটালিয়নের জন্ম সবচেয়ে আগে তার নম্বর এক এবং তারপর দুই—এইভাবে বয়স অনুসারে নম্বর। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসারের আধিক্য পূর্বের মতই বজায় থাকে। এই দ্বিতীয়বারের নতুন সংগঠনের পর ভারতীয় বাহিনীর পরিণত রূপ, জনবল ও প্রকৃতি নিম্নের বিবরণ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে।

(১) বেঙ্গল বাহিনী—

(ক) ৩টি ঘোড় গোলন্দাজ ব্রিগেড (Horse Artillery)—প্রত্যেক ব্রিগেডের ৪টি ক'রে ট্রুপ, এর মধ্যে একটি সিপাহী গোলন্দাজ ট্রুপ।

(খ) ৫টি পদাতিক গোলন্দাজ বাহিনী, প্রত্যেকের ৪টি ক'রে কোম্পানী।

(গ) ১টি বেলদার বাহিনী (Sappers & Miners) যার সঙ্গে ৪৭ জন ইঞ্জিনীয়ার অফিসার ও একটি পাইওনীয়ার দল (মজুর সিপাহী)।

(ঘ) ২টি ব্যাটালিয়ন—য়ুরোপীয় পদাতিক।

(ঙ) ৮টি রেজিমেণ্ট—লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার সওয়ার।

(চ) ৫টি রেজিমেণ্ট—অরেগুলার সওয়ার।

(ছ) ৬৮টি ব্যাটালিয়ন—দেশীয় পদাতিক সিপাহী।

(জ) কতগুলি স্থানীয় সেনাদল।

(২) **মাদ্রাজ বাহিনী—**

(ক) ২টি ব্রিগেড—ঘোড়-গোলন্দাজ (Horse Artillery) তার মধ্যে একটি হলো য়ুরোপীয় ব্রিগেড, একটি হলো দেশী ব্রিগেড।

(খ) ৩টি ব্যাটালিয়ন—পদাতিক গোলন্দাজ, প্রত্যেকের ৪টি করে কোম্পানী। এই ৪টি কোম্পানীর মধ্যে ১টি হলো দেশীয় লস্কর কোম্পানী।

(গ) ৩টি রেজিমেণ্ট—লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার সওয়ার।

(ঘ) ২টি কোর (Corps)—পাইওনিয়ার (মজুর সিপাহী)।

(ঙ) ২টি ব্যাটালিয়ন—য়ুরোপীয় পদাতিক।

(চ) ৫২টি ব্যাটালিয়ন—সিপাহী পদাতিক।

(ছ) ৩টি স্থানীয় ব্যাটালিয়ন।

(৩) **বোম্বাই বাহিনী—**

(ক) ৪টি ট্রুপ (Troop)—ঘোড়-গোলন্দাজ।

(খ) ৮টি কোম্পানী—পদাতিক গোলন্দাজ।

(গ) ১টি কোর—ইঞ্জিনীয়ার ও পাইওনীয়ার।

(ঘ) ৩টি রেজিমেণ্ট—লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার সওয়ার।

(ঙ) ২টি রেজিমেণ্ট—অ-রেগুলার সওয়ার।

(চ) ২টি ব্যাটালিয়ন—য়ুরোপীয় পদাতিক।

(ছ) ২৪টি ব্যাটালিয়ন—সিপাহী পদাতিক।

১৭৯৫ সালের ভারতীয় বাহিনী এবং ১৮২৪ সালের ভারতীয় বাহিনী—পূর্বোল্লিখিত দুটি বিবরণ তুলনা করলে বোঝা যায়, কত দ্রুত ভারতীয় বাহিনী জনবলে, অস্ত্রশস্ত্রে, পদ্ধতিতে ও ব্যবস্থায় বৃহদাকার হয়ে উঠছিল।

স্বদেশের রণক্ষেত্রে সিপাহী ফৌজ

ভারতীয় সিপাহী বাহিনীর সাহায্যে ইংরাজ কর্তৃক যুদ্ধ জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী ঘটনাগুলিকে পর পর উল্লেখ করা যেতে পারে:

(১) ১৮২৪ সাল—বর্মা অভিযান।

(২) ১৮২৫ সাল—ভরতপুর দুর্গ অধিকার ও জাঠ রাজশক্তির পতন।

(৩) ১৮৩৮ সাল—রুশ শক্তির প্রভাব ও প্রসার প্রতিহত করার জন্য আফগানিস্থানে ইংরাজের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। কাবুল অভিযান, গজনী অধিকার এবং তারপরেই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ইংরাজ ফৌজের কাবুল ত্যাগ। পলায়নের পথে শীতে ও আফগানদের নিদারুণ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন ও ধ্বংস হয়ে মাত্র অল্পসংখ্যক ইংরাজ সৈনিক ও সিপাহী পেশোয়ার পৌঁছতে সমর্থ হয়। এর ফলে ইংরাজের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আবার একটা সন্দেহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কাবুল অভিযানের এই শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর নতুন করে প্রতিশোধ বাহিনী প্রেরিত হয়। পোলক (Pollock) ও নটের

(Nott) পরিচালনায় ইংরাজ সৈনিকের সঙ্গে সিপাহী পদাতিক সওয়ার ও গোলন্দাজ আফগানিস্থানে প্রেরিত হয় এবং অবশ্যই প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলতে সমর্থ হয়।

(৪) ১৮৪০ সাল—চীনের আফিং যুদ্ধ (Opium War)। মাদ্রাজ সিপাহী বাহিনী থেকে দক্ষিণ চীনে একটী সৈন্যদল প্রেরিত। হয়

(৫) ১৮৪২ সাল—সিন্ধিয়ার সঙ্গে আর একবার, ইংরাজের সংঘর্ষ। স্যার চার্লস নেপিয়ারের নেতৃত্বে বোম্বাই সিপাহী বাহিনীর পদাতিক ও সওয়ার বাহিনী মারাঠা বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ও তাদের পরাভূত করে।

(৬) ১৮৪৩ সাল—গোয়ালিয়র অভিযান। মহারাজপুর ও পুন্নিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের কাছে গোয়ালিয়র বাহিনীর পরাভব।

(৭) ১৮৪৫ সাল—শিখযুদ্ধ, ইংরাজের শতক্র অভিযান। বেঙ্গল সিপাহী বাহিনী এই অভিযানে ইংরাজের সহায়ক হয়।

(৮) ১৮৪৮ সাল—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ। বোম্বাইয়ের একটি সিপাহী ব্রিগেড শিখ বাহিনীকে পরাভূত করে মূলতান দুর্গ দখল করে। তারপর চিলিয়াঁওয়ালা ও গুজরাটের রণক্ষেত্রে জীবনপণ সংগ্রামের পর শিখ বাহিনীর পরাজয়। বেঙ্গল সিপাহী বাহিনীর সৈনিকেরাই এই যুদ্ধে প্রধান ইংরাজ-ফৌজরূপে উপস্থিত ছিল।

পাঞ্জাবে শিখশক্তির পতনের পর ছত্রভঙ্গ খালসা সৈনিকদের নিয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সীমান্ত রক্ষার জন্য একটী অরেগুলার বাহিনী গঠন করেন—পাঞ্জাব সীমান্ত বাহিনী (Punjab Frontier Force.)

(৯) ১৮৫৩ সাল—দ্বিতীয় বর্মা যুদ্ধ।

(১০) ১৮৫১ সাল—পারস্য অভিযান। বোম্বাই সিপাহী বাহিনীর কয়েকটী দল পারস্য অভিযানে যোগদান করে।

এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৫৭ সালের কথা। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর ইতিহাসে সে এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ঘটনা, নিদারুণ ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানের ভারতব্যাপী এক রাজনৈতিক পরিকল্পনার সামরিক উদ্যোগের দৃষ্টান্ত। হুকুম-ই-সাহেবান্ ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৫৭ সাল একটা মস্ত বড় ফাঁক। ভারতীয় সিপাহীর জীবনে সে এক অভিনব অধ্যায়।

কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় গঠিত ভারতীয় বাহিনীর ক্রমবিবর্ত্তনের একটা পরিচয় আমরা পেলাম। 'দারোয়ান ব্যাটালিয়ন' রূপে গঠিত এই ভারতীয় বাহিনী এক শত বছরের মধ্যেই সংখ্যায় ও দক্ষতায় পৃথিবীর বিরাট বাহিনীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট বাহিনীরূপে সুখ্যাতি (বা কুখ্যাতি) অর্জন করে। এক একটি দেশীয় রাজশক্তির পতনের পর ঐ রাজ্যের ছত্রভঙ্গ বাহিনীর সৈনিকেরা দলে দলে ইংরাজের ফৌজে ভর্তি হতে থাকে। এর ফলে সিপাহী বাহিনী অত্যন্ত জনবল-পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর কর্মক্ষেত্র আর স্ব স্ব নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্সীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রেসিডেন্সীগুলিতে দখলদার বাহিনীরূপে স্থায়ীভাবে থেকেও ব্রিটিশের রাজ্য বিস্তারের দাবীতে ভারতের সর্বপ্রান্তে দেশীয় সিপাহিকে আক্রমণ বা অভিযাত্রী বাহিনী (Invading Army) রূপে কাজ করতে হয়েছে।

তা ছাড়া আর একটা প্রথা কোম্পানীর আমলেই প্রথম আরম্ভ হয়। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ও ইংরাজের আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ একটা নতুন ধরণের ফৌজী ব্যবস্থা করেন।

প্রথমে ওয়েলেসলী এবং পরে লর্ড ময়রা দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এক একটা দেশীয় বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর খরচ দেশীয় রাজাকেই দিতে হতো কিন্তু বাহিনীটির সমস্ত অফিসার ইংরাজেরাই হতো। যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধে এই দেশীয় রাজ্যের বাহিনীও ইংরাজের সহযোগী হতে বাধ্য ছিল।

১৮৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ও কর্তৃত্বে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর দেশী সিপাহীর সংখ্যা দাঁড়ায়, ৩১১,৫৩৮ (Imperial Gazeteer-এর বিবরণী) এবং য়ুরোপীয় সৈনিকের (রাজকীয় ও কোম্পানীর) সংখ্যা ছিল ৩৯,৫০০ ; দেশী সিপাহীর পরিচ্ছদ য়ুরোপীয় স্টাইলের ছিল। গায়ে লাল কোট ও প্রবল আঁটসাট সাদা প্যাণ্টালুন, লম্বা ও উঁচু কালো রঙের টুপি (Shako) এবং সাদা ক্রসবেল্ট।

এই রঙীন ও বিচিত্র উর্দি গায়ে দিয়ে সিপাহীকে পুরা-পোষাকেই (Full-dress) যুদ্ধ করতে হতো। রণক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ধরণের কোন পরিচ্ছদের রেওয়াজ ছিল না।

কয়েকটি 'মিউটিনি'—১৮৫৭ সালের আগে

সাধারণতঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানই ভারতীয় বাহিনীর একমাত্র 'মিউটিনি' বা বিদ্রোহ নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে অছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। পলাশী যুদ্ধের সময় থেকে (১৭৫৭) আরম্ভ করে বিখ্যাত সিপাহী মিউটিনির সময় (১৮৫৭) পর্যন্ত—এই একশত বৎসরের ইতিহাসে ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা হয়েছিল। আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, এর মধ্যে দুটি বিদ্রোহ হলো শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ অফিসার ও সৈনিকের বিদ্রোহ।

১৭৬৪ সালে বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীরা উচ্চতর বেতন ও ভাতার জন্য বিদ্রোহ করে। এর দুবছর পরে বেঙ্গল বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারেরাও অ্যালাওয়েন্স বা ভাতার প্রশ্ন নিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করে এবং বিদ্রোহ করে। লর্ড ক্লাইভ কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

১৮০৬ সালের ভেলোর (Vellore) বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারবর্গ ইংরাজের পেন্সনভোগী হয়ে ভেলোরে বাস করছিলেন। বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে দুটি অভিমত প্রচলিত আছে—(১) টিপুর পরিবারবর্গের অবস্থা ও মনোবেদনা প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় সিপাহী বাহিনীর মনের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। (২) ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ একটা অদ্ভুত নির্দেশ দিয়েছিলেন, সিপাহীরা কি ধরণের পাগড়ী পরবে এবং কপালে তিলকের মত একটা চিহ্ন জাতের পরিচয় হিসাবে উর্দির ওপর চিহ্নিত থাকবে। এই দুটি কারণের মধ্যে কোনটি সত্য, গল্প দুটির মধ্যে একটিও সত্য কিনা—সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু ধারণা করা যায় না। যে কারণেই হোক ভেলোরে অবস্থিত মাদ্রাজ বাহিনীর সিপাহীরা হঠাৎ দুর্গের ইংরাজ সৈনিকদের আক্রমণ করে, বহু ইংরাজ নিহত হয়। এই বিদ্রোহ নিতান্ত স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর প্রতিক্রিয়া নানাস্থানেও দেখা দিয়েছিল।

১৮০৯ সালে মাদ্রাজ বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারেরা বিদ্রোহ করে।

১৮২৪ সালে বেঙ্গল বাহিনীর কয়েকটি পদাতিক সিপাহী ব্যাটালিয়নকে আরাকানে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হয় ও বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের ভয়ানকভাবে শাস্তিও দেওয়া হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরবর্তীকালে অনুসৃত প্রায় প্রত্যেকটি ফৌজী পলিসির বীজ এর মধ্যেই

বপন করা হয়েছিল। ভারতীয় সিপাহীকে স্বদেশের স্বাধীনতা দমনে দখলদার বাহিনী (Army of Occupation) রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বিদেশে সাম্রাজ্যিক বাহিনী (Imperial Troop) হিসাবেও কাজে লাগানো হয়েছে। আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির অসহায় আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরই খরচে কতগুলি চুক্তিবদ্ধ অধীন ফৌজ (Subsidiary Army) গঠনের প্রথা চালু করা হয়েছে। ভারতব্যাপী সার্বভৌম অধিকারের আদর্শকেই সামরিক নীতির প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ জাত বাছাই করে ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে সৈন্য সংগ্রহের নীতিও বিশেষ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে ইংরাজের এক বণিক সংঘ ভারতের মানুষকেই সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ ভাড়াটিয়া সৈনিকে পরিণত ক'রে তাদেরই সাহায্যে একশত বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতভূমিকে জয় করে ফেললো।

"And the marvel of it all is that these tramping disciplined legions are not the beef and porridge and potato reared lads of the Isles but for the most part, men of the ancient races of Hindusthan, ruled and trained and led after the manner of the English."

সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো, ভারত-বিজয়ী এই সুগঠিত চলচঞ্চল ফৌজী জনতা শ্বেত দ্বীপের আলু-গোমাংস-পরিজ লালিত সন্তানেরা নয়, এরা হলো ভারতীয় বনিয়াদী জাতিগুলিরই সন্তান, যারা ইংরাজের দ্বারা ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও পরিচালিত হয়েছে। *

ব্যাপারটা ইংরাজের পক্ষে নিশ্চয় বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় এবং অপরদিকে ভারতের পক্ষে অবশ্যই বিস্ময় ও লজ্জার বিষয়।

* The Armies of India—Major MacMuna

ভারতীয় ফৌজের প্রথম একশত বছরের ইতিহাস বস্তুতঃ ভারতের রাজনৈতিক দৈন্যের ইতিহাস।

সিপাহী বিদ্রোহ—রাজনৈতিক অভ্যুত্থান

১৮৫৭ সাল, পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বছর পর, মার্চ মাসের একটি সন্ধ্যা—ব্যারাকপুরের শিবিরে ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর এক ব্রাহ্মণ সৈনিকের হাতের বন্দুক হঠাৎ গর্জন করে উঠে। অশ্বারূঢ় অ্যাডজুট্যাণ্ট সাহেবের দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সিপাহীদের প্রতি হুঁশিয়ারী হুমকি অর্ধোচ্চারিত হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই ব্রাহ্মণ সৈনিকের নাম মঙ্গল পাণ্ডে, এক সপ্তাহের মধ্যে তার প্রাণদণ্ড হয়। তার পরেই ক'টি দিনের মত সব শান্ত। শুধু ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর জেনারেল সাহেব নয়, সমস্ত বেঙ্গল বাহিনীর ইংরাজ সেনানায়ক ও অফিসারের দল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অতি দূরদর্শী কর্তৃপক্ষও এই ঝড়ের আগের শান্তিকে চিরস্থায়ী শান্তি বলেই মনে করলেন। কেউ কল্পনা করতেও পারেনি, মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক থেকে সেই সন্ধ্যায় যে স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হলো সেটা একটা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সঙ্কেত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে আরম্ভ করে পূর্বে কলিকাতা পর্যন্ত বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীর অভ্যুত্থান বৃটিশ রাজশক্তিকে বিকল করে দেয়। কিন্তু এই সংগ্রাম বস্তুতঃ এক বৎসর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং বৃটিশ এক বৎসর পরেই তার বিধ্বস্ত শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে ফেলে।

বেঙ্গল বাহিনী সিপাহীদের এই বৃটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের কারণ কি ছিল? এই প্রসঙ্গে ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুগ্রহে ভারতের স্কুলপাঠ্য পুস্তকে 'চর্বিমাখা টোটা' (greased cartridge)

থিওরিটি অনেকের মনে পড়বে। টোটার মধ্যে গরুশূয়রের চর্বি আছে সন্দেহ করে সিপাহীরা নাকি ক্ষুব্ধ হয় ও বিদ্রোহ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সত্যকে চাপা দেবার জন্য কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কতখানি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, এই 'চর্বি-মাখা টোটা থিওরিটী' তার একটি উদাহরণ। কোন আধুনিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনায়াসে আর একটা থিওরী প্রচার করতে পারেন যে, টেলিগ্রাফের তারে ভূত আছে সন্দেহ করেই ভারতবাসীরা ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্রোহ করেছিল। এই থিওরীটা যতখানি সত্য চর্বিমাখা টোটা থিওরিও তার চেয়ে কম সত্যি নয়।

তবে সব ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মত নয়। সিপাহী বিদ্রোহের নিন্দা করেও অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক এই সংগ্রামকে রাজনৈতিক এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই মনে করেছেন। সিপাহী অভ্যুত্থান একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত ঘটনা। রাজা-মহারাজা ইত্যাদি সামন্তবর্গের নেতৃত্ব দ্বারা এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। তাঁতিয়া টোপে অর্থাৎ টোপে মহারাজ নামে বিদ্রোহীদের সর্ববরেণ্য নেতা সত্যিই মহারাজ ছিলেন না, নিতান্ত মধ্যশ্রেণীর (Middle Class) ভদ্রলোক ছিলেন। অন্যতম নেত্রী ঝাঁসীর রাণীও সত্যিই 'রাণী' ছিলেন না, প্রাক্তন রাজপারবারের একটি মেয়ে। নানাসাহেবও 'রাজা' ছিলেন না। বিদ্রোহের যাঁরা সংগঠক ও নেতা ছিলেন তাঁরা মধ্যশ্রেণীর মানুষ ছিলেন। দানাপুরের কুমার সিংও জমিদার ভদ্রলোক। একটিও দেশীয় রাজ্য বিদ্রোহী সিপাহীদের সহযোগিতা করেনি, বরং বেশীর ভাগ ইংরাজের পক্ষেই ছিল। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণও বিদ্রোহে যোগদান করেছিল।

সুতরাং তথাকথিত সিপাহী অভ্যুত্থানকে নিছক 'ফৌজী বিদ্রোহ' বলা উচিত নয়। সমগ্রভাবে গণ-সংগ্রামও বলা যায় না, তেমনি সামন্তিক বা ফিউড্যাল (Feudal) অভ্যুত্থান বললেও ঘটনার ঐতিহাসিক মর্যাদাকে ছোট করা হয়। বলতে পারা যায়, ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের রাজনীতি-সচেতন দেশপ্রেমিক এবং ব্রিটিশবিদ্বেষী সমাজের অভ্যুত্থান। কুইট ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান ছোড় দো, ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম এই ভাবের ঝটিকা দেখা দেয়।

এই বিদ্রোহে ভারতের সমস্ত ফৌজ যোগদান করেনি। একমাত্র বেঙ্গল বাহিনী বিদ্রোহী হয়। মাদ্রাজ বাহিনী এবং বোম্বাই বাহিনী ইংরাজের পক্ষে ছিল। দেশীয় রাজ্যের বাহিনীগুলির মধ্যে কেউ নিরপেক্ষ এবং কেউ ইংরাজের পক্ষে ছিল, সিপাহীর পক্ষে কেউ নয়। আবার বেঙ্গল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত শিখ ও গুর্খা সৈনিকেরা অবিচল আনুগত্যের সঙ্গে ইংরাজের পাশে দাঁড়িয়ে 'পুরবিয়া' সিপাহীকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করেছিল।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মনে করেন—বেঙ্গল বাহিনীতে এত পুরবিয়া রাজপুত আর ব্রাহ্মণ ভর্তি করা মস্ত বড় অদূরদর্শিতার কাজ হয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীর মত বেঙ্গল বাহিনীতে 'নীচ জাত' থেকে সৈন্য সংগ্রহ করলে এ বিদ্রোহ সম্ভব হতো না।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়েই ইংরাজ কর্তৃপক্ষ একটা লক্ষণ দেখেও সতর্ক হয়নি। ইংরাজ চালিত হিন্দুস্থানী পুরবিয়া সিপাহী অর্থাৎ বেঙ্গল বাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় কেমন একটু অপ্রসন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী রিপোর্টেই লিপিবদ্ধ আছে যে, হিন্দুস্থানী সিপাহীরা ভারতের একটা মাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন

রাজ্যকে (অর্থাৎ শিখরাজ্যকে) ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে যেন বিবেকের বাধা অনুভব করেছিল। বেঙ্গল বাহিনী এ যুদ্ধে কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই লড়াই করে। 'একমাত্র অবশিষ্ট হিন্দু (শিখ) রাজ্যের প্রতি সিপাহীদের মধ্যে বেশ কিছু মমতা ছিল।' ("There was considerable feeling towards the last Hindu State")।

বেঙ্গল বাহিনীর মনস্তত্বের যে পরিচয় এই সরকারী স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই সিপাহী বিদ্রোহের আদর্শের প্রধান সূত্রটুকু আমরা পাই। পুরবিয়া ব্রাহ্মণ রাজপুত আর ছত্রী সিপাহী শিখরাজ্যকে একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপে অনুভব করেছিল। এই চিন্তা ও চেতনাই ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের ঐতিহাসিক কারণ, চর্বিমাখা টোটা নয়। শিখরাজ্যকে একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলে মমতাবোধ যে মনে সম্ভব হতে পারে, সে মন ভারতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম দ্বারাই তৈরী। সুতরাং আজ আমাদের বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক সেদিন এই দেশাত্মবোধের আবেগেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সিপাহী অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে এবং মর্যাদা দিতে তৎকালীন ভারতীয় জনসমাজের একটা বৃহৎ অংশও পারেনি। বেঙ্গল বাহিনীর দেশপ্রেমিক সিপাহীর মনের আবেগ সারা ভারতবর্ষে তো নয়ই, সমগ্র সিপাহীর মনেও সংক্রামিত হয়নি। ইংরাজভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির সেই দ্বন্দ্বে ভারতের অধিকাংশ জনসমাজ ইংরাজভক্তির রসেই সিক্ত হয়েছিল। বাংলার কবি ঈশ্বরগুপ্তের এই কবিতাংশ পড়লেই বুঝা যায় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের জনসমাজের একটা

বৃহৎ অংশ সিপাহী বিদ্রোহের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেননি, বরং রূঢ়ভাবে নিন্দাই করেছিলেন:

"হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?"

* * *

"রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড
কলিন কাম্বেল,
সাধু সাধু সাধু তুমি বিপক্ষের শেল।"

এ গেল এক দিক, আর একটা দিক আছে। উত্তর ভারতে ভাট চারণের মুখে আজও প্রাচীন গাথার সঙ্গীতময় রেশ পল্লীর পথে ধ্বনিত হয়, যাঁদের পূর্বপুরুষ কবিকুল সন সাতান্নের 'বলোয়া'তে স্বদেশীগৌরবের লাল জ্যোৎস্না প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হৃদয় দিয়ে তার মর্যাদা অনুভব করেছিলেন—

"গগন ভরি চন্দ্রিকা চমকই লালে লাল।"

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে আরও অনেক বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যথা—কম মাইনে, ছুটির অভাব, কালাপানি বা সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাবার নির্দেশ, বাহিনীতে উঁচু জাতের লোক ভর্তি, বাহিনীর গঠনগত ত্রুটি ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো এসবই সত্যি, কিন্তু এগুলি আনুষঙ্গিক কারণ, মূল কারণ নয়।

ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই কারণে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা এই প্রসঙ্গে বলা হলো। সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখিত সাহিত্য অতি বৃহৎ। পৃথিবীতে

কোন ঘটনা সম্বন্ধে এত বিস্তৃত ঐতিহাসিক সাহিত্য রচিত হয়নি। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক সাহিত্য রচিত হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে রচিত ঐতিহাসিক রচনাবলী তার চেয়ে বেশী।

১৮৫৭ সালের এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক অগ্ন্যুৎসবে বেঙ্গল বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আত্মাহুতি দেয়। বিখ্যাত রাজভক্ত 'লাল পল্টন' চিরকালের মত অদৃশ্য হয়। বিদ্রোহ শান্ত হবার পর দেখা গেল যে, বেঙ্গল বাহিনীর ৭০টি পদাতিক রেজিমেণ্টের মধ্যে মাত্র ১৫টি ব্যাটালিয়ন অটুট আছে। বিরাট সওয়ার বাহিনীর একটিও অবশিষ্ট নেই, সবই বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে ব্রিটিশ গ্যারিসন শূন্য করে চলে গিয়েছিল।

এর পর ভারতবর্ষের পক্ষে আর একটা বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে খাস সম্রাটের শাসনাধীনে বদলি করা হয়। ভারতীয় ফৌজ আর কোম্পানীর ফৌজ না হয়ে ব্রিটিশের সরকারী ফৌজে পরিণত হয়। ভারতীয় ফৌজকে আমূল সংস্কার করার নতুন পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ যে শিক্ষা লাভ করেন সেই শিক্ষা স্মরণ রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে নতুন করে ভারতীয় ফৌজকে সংগঠিত করার আয়োজন হতে থাকে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় যে সব রাজনৈতিক এবং সমরনৈতিক শিক্ষালাভ করেন, তার মধ্যে প্রধান কয়টি শিক্ষা হলো:—

(ক) উচ্চ জাতির হিন্দুকে যতদূর সম্ভব ফৌজে গ্রহণ না করা।

(খ) বোম্বাই মাদ্রাজ ও বেঙ্গল বাহিনীর মধ্যে প্রথম থেকেই সব জাতের লোককে মিশ্রিতভাবে দলবদ্ধ করা হয়েছিল। জাত হিসাবে ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানী গঠনের কোন প্রথা ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে জাত হিসাবে দল গঠনের (class composition) গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

(গ) সব সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতের লোক থেকে সৈন্য সংগ্রহ না করে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতের লোক থেকে সৈন্ত সংগ্রহ করা।

(ঘ) 'দেশীয় রাজ্য' নামে করদ রাজ্য প্রথাটি ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতি অনুকূল ব্যবস্থারূপে প্রমাণিত হয়। কোন দেশীয় রাজা বিদ্রোহে সহযোগিতা করেনি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন।

(ঙ) রেগুলার বাহিনী ও অরেগুলার বাহিনীর পরস্পরের কৃতিত্ব তুলনা করে দেখা গেল যে, বিদ্রোহ দমনে এবং সঙ্কটকালে অরেগুলার বাহিনী ইংরাজের পক্ষে বেশী সহায় এবং কার্যকরী হয়েছে। অরেগুলার প্রথার গুরুত্ব ও সার্থকতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেশী করে উপলব্ধি করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতালব্ধ এই শিক্ষাগুলিকে কিভাবে পরবর্তী কালে নীতি হিসাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রবর্তন করেন, সে প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে আলোচিত হবে।

তথাকথিত সামরিক জাতি

সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে নতুন ক'রে এক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ভারতের কতগুলি প্রদেশ, সমাজ, সম্প্রদায় ও জাত থেকে সৈন্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে ভেবে চিন্তে একটি সামরিক কুলীন জাতের তালিকা প্রস্তুত হয়। যেসব সমাজ ও জাতের রাজভক্তি তথা ইংরাজভক্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিঃসংশয় হয়েছিলেন, তাদেরই সৈন্যবিভাগে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে আর একটা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বিত হয়—সহুরে লোক গ্রহণ না করা। মাত্র তালিকানুযায়ী সামরিক জাতির লোক হলেই চলবে না, সেই জাতের গ্রাম্য কৃষক হওয়া চাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গবেষণা অনুযায়ী এরাই হলো সামরিক জাতি :

১। প্রাচীন আর্যবংশের জাতিগুলি (Races)

(ক) পাঞ্জাবের আর্যজাতি

(খ) হিন্দুস্থানের আর্যজাতি

২। জাঠ এবং গুজর (গুর্জর) জাতি

৩। পাঠান ও মোগল

ভারতের বাইরে থেকেও কয়েকটি সামরিক জাতি থেকে ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা হয়। তারা হলো—

১। সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলের পাঠান ও আফগান।

২। গুর্খা

এই তালিকাটির দিকে তাকিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সামরিক জাতিবাদকে খুব সঙ্কীর্ণ বলতে পারা যায় না, বরং উদার বলেই মনে হয়। কিন্তু এটা হলো মোটামুটি স্থূল রকমের একটা পরিচয়। পাঞ্জাব বা হিন্দুস্থানের যে কোন আর্যবংশ থেকে, সীমান্তের যে কোন পাঠান বা আফগানকে, অথবা নেপালের যে কোন গুর্খাকে, কিম্বা যে কোন জাঠকে ভারতীয় বাহিনীতে গ্রহণ করা হয়—এটা সত্য নয়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, তবু ব্যাপারটা বর্ণে বর্ণে সত্য—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমত, গোত্র ও জাত হিসাবেই লোক সংগ্রহ করেন। মজবুত চেহারার একজন জাঠ যুবক রিক্রুটিং অফিসে উপস্থিত হয়ে ইংরাজ বাহাদুরের জন্য পৃথিবীর যেকোন স্থানে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিলেই যে তাকে তখুনি ফৌজে ভর্তি করা হবে, ব্রিটিশ রিক্রুটিং পদ্ধতি এতটা সরল নয়। কোন্ গোত্রের জাঠ? গোত্র যদি বা মিলিটারী তপশীল অনুযায়ী হয়, তখন প্রশ্ন উঠবে—কোন অঞ্চলের জাঠ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, অমুক নদীর এপারে না ওপারে, কোথায় বসতি? এপারের লোক হলে সামরিক জাতি, ওপারের হলে অসামরিক। এইভাবে গাঁই ও গোত্র বিচার করে, তারপর শারীরিক যোগ্যতার বিচার ক'রে ফৌজে লোক সংগৃহীত হয়। ব্রিটিশ সামরিক সংহিতা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন সামরিক জাতি বা শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

শিখ:—শিখ ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণের (Baptism) বিধান আছে। পাহুল বা দীক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সত্যিকারের শিখ হয় না। পাহুল গ্রহণে যে আচার ও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়, তার দ্বারা কঠোর জীবন বরণ করার মত একটা যোগ্যতা অর্জিত হয়।

বর্তমানে শিখসমাজে অনেকের মধ্যে পাহুল গ্রহণে অনিচ্ছার ভাব দেখা যায়। কিন্তু পাহুল সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত শ্রদ্ধা। পাহুলের কৃচ্ছাচার গ্রহণ ক'রে শিখ যে ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা দেয়, তার জন্যই নাকি শিখেরা বিশ্বাসী সৈনিক হবার যোগ্যতা অর্জন করে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাই এমন কোন শিখকে ফৌজে ভর্তি করেন না, যার পাহুল হয়নি। রেজিমেণ্টের রিক্রুটিং অফিসারদের ওপর এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ আছে।

জাঠ-শিখ নামে একটা কথা আছে। বর্তমানে জাঠ বলতে সাধারণতঃ পাঞ্জাবের এক শ্রেণীর হিন্দু কৃষক বোঝায়। এরাই এককালে দলে দলে শিখধর্ম গ্রহণ করেছিল। বংশের দিক দিয়ে শিখরা প্রধানতঃ জাঠ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রথম একমাত্র জাঠ শিখকেই সামরিক জাতিরূপে গণ্য করেন এবং তাদের ভেতর থেকেই সৈন্য সংগৃহীত হতে থাকে।

কিছুদিন পরে, শিখেদের ওপর ব্রিটিশের বিশ্বাসের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং ক্ষেত্রি শিখ, বেনিয়া শিখ এবং লোবানা শিখ, বেহারা ও মুটে শ্রেণী ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি শিখ শ্রেণীকে ফৌজে ভর্তি করা হতে থাকে। মজ্‌বি শিখ নামে আর একটি শ্রেণী আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীকেও ফৌজে স্থান দিয়েছেন। মজ্‌বি অর্থ বিশ্বাসী। জনৈক ভাঙ্গি (মেথর) মোগল সম্রাটের আদেশে নিহত গুরু তেগবাহাদুরের দেহ বহন করে নিয়ে এসেছিল, সেই অস্পৃশ্য ভাঙ্গিই হলো মজ্‌বিদের পূর্বপুরুষ। সম্ভবতঃ যেসব অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু শিখধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারাই মজ্‌বি শিখ নামে পরিচিত। মহারাজা রণজিৎ সিংও মজ্‌বিদের নিজ ফৌজে গ্রহণ করেছিলেন।

পাঞ্জাবী মুসলমান: বর্তমান উচ্চশ্রেণীর পাঞ্জাবী মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা ছিল হিন্দু রাজপুত। মিঃ জিন্নার পাকিস্থান তত্ত্ব প্রখর হয়ে উঠবার আগে পাঞ্জাবী মুসলমানেরা নিজেদের 'রাজপুত মুসলমান' বলে পরিচয় দিত। মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন একদিন বেশ গর্বের সঙ্গে নিজেকে রাজপুত বলে পরিচয় দিতেন। পাঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে আজও তাদের প্রাক্তন রাজপুত ঐতিহ্যের গোত্রগত বিভাগগুলি রয়ে গেছে এবং এরাই হলো পাঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত সমাজ। যথা, ভাত্তি স্থত্তি, চিব, জাঞ্জুয়া, তিওয়ানা ইত্যাদি। পাঞ্জাবী মুসলমানকেও ফৌজে ভর্তি করার সময় তার গোত্র বিচার করা হয়—যে কোন মুসলমান হলেই চলবে না। পূর্বে বলা হয়েছে—রেজিমেণ্টের অন্তর্গত এক একটা কোম্পানী এক একটা বিশেষ সমাজ বা জাতির সৈন্য নিয়ে গঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। অমুক নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অন্তর্গত একটি কোম্পানী হয়তো পাঞ্জাবী মুসলমান-দের নিয়ে তৈরী। এটা হলো মোটামুটিভাবে সত্য। প্রকৃত ব্যবস্থা আরও সূক্ষ্ম। ব্রিটিশের সামরিক জাতিবাদকে প্রকৃতপক্ষে গোত্রবাদই বলা উচিত। কারণ, ঐ একটি শিখ কোম্পানীর সব শিখ এক শ্রেণীর (বা গোত্রের) লোক হওয়া চাই। পাঞ্জাবী মুসলমান নিয়ে তৈরী কোম্পানীটিও তাই, সব সৈন্য এক গোষ্ঠী বা গোত্রের মুসলমান হওয়া চাই—চিব অথবা তিওয়ানা কিংবা স্থত্তি। অনেক লোক প্রকৃত বংশের পরিচয় চাপা রেখে অন্য গোত্রের পরিচয় দিয়ে ফৌজে ভর্তি হবার চেষ্টা করে থাকে। তাই মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সিভিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রার্থী রংরুটের বংশপরিচয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে এবং নিঃসন্দেহ হয়ে তবে লোক ভর্তি করেন।

ডোগরা : ডোগ্‌রা অর্থে কোন গোষ্ঠী বোঝায় না, বরং একটা সমাজ বোঝায়। ডোগ্‌রা হলো হিন্দু, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী গিরি-অঞ্চলেই (কাংড়া জিলা ইত্যাদি) এদের বাস। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজপুত ইত্যাদি বিভিন্ন জাত আছে। ইসলামের প্রভাব এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। পাঞ্জাবের যে চিব গোষ্ঠীর মুসলমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা বস্তুতঃ ডোগ্‌রা সমাজের লোক। বর্তমানে এই ডোগ্‌রা অঞ্চলে চিব গোষ্ঠীও রয়েছে—যারা হলো হিন্দু। জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজাও ডোগ্‌রা, জম্বল গোষ্ঠীর রাজপুত। ১৮৮৬ সালের পর থেকেই বস্তুতঃ ডোগ্‌রাদের ভারতীয় ফৌজে ভর্তি করা হতে থাকে। ডোগ্‌রারা সাহসী ও দক্ষ সৈনিক। ভারতবর্ষের ফৌজ সমাজে ডোগ্‌রা সৈনিকের সৌজন্যবোধ ও সচ্চরিত্রতা আদর্শস্থানীয়। হিন্দু-নিন্দুক ব্রিটিশ কর্তামহলের অনেকে স্বীকার করেছেন যে, ডোগ্‌রাদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সৈনিকের চরিত্রগত ঐতিহ্য অনেকখানি অবিকৃতভাবে রয়ে গেছে, কারণ ডোগ্‌রারা মোগল-পাঠান আদর্শের সংস্পর্শে বা প্রভাবে কখনো পড়েনি।

পাঠান : ভারতবর্ষের মুসলমানদের এক সম্প্রদায় নিজেদের পাঠান বলে পরিচয় দেয়। সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান—ভারতের এই ইস্‌লামীয় চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্গত পাঠানের সঙ্গে সামরিক জাতি নামে কথিত পাঠানের কোন সম্পর্ক নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আফগান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আজাদ এলাকার ('no man's land') অধিবাসী পুশতুভাষী পাঠানই হলো বর্তমান পাঠান জাতি। পাঞ্জাবেও কিছু পাঠান বাস করে।

সীমান্তবাসী পাঠানের পক্ষে গর্ব করার মত কোন রাজনৈতিক বা সামরিক ইতিহাস নেই। মারামারি করার একটা সুদীর্ঘ

ঐতিহ্য তাদের আছে, এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে। ভারতীয় এলাকার গ্রামাঞ্চলের ওপর মাঝে মাঝে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করা এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি করা, প্রধানতঃ এই দুটি ব্যাপারের জন্যই তারা অস্ত্র চর্চা করে এসেছে। এরা সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু এবং দুর্দান্ত—সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। সীমান্ত-বাসী পাঠানদের চেহারার লক্ষণ থেকে ধারণা হয় যে তারা সম্ভবতঃ সেমিটিক (ইহুদী) বংশের মানুষ। বিশেষতঃ দুরাণী প্রভৃতি আফগানদের মধ্যে এই লক্ষণ বেশী পরিস্ফুট। অন্যান্য পাঠান গোষ্ঠীর চেহারার লক্ষণ দেখে তাদের প্রাচীন রাজপুত গোষ্ঠীর লোক বলে ধারণা করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে আফ্রিদি পাঠানের চেহারার মধ্যে এই লক্ষণ সব চেয়ে বেশী।

আফগান যুদ্ধ এবং পাঞ্জাব অধিকার—এই দুটি ঘটনার ভেতর দিয়েই ব্রিটিশ সমর বিভাগের সঙ্গে পাঠানের প্রথম সম্পর্ক হয়। পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স প্রথম গঠিত হবার সময় কিছু পাঠানও এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানের সমাদর বৃদ্ধি পায়। পেশোয়ার উপত্যকায় ইয়ুসুফজাই, খৈবার অঞ্চলের আফ্রিদি, খৈবারের উত্তরের মোমন্দ ও উতমানজাই—ইত্যাদি পাঠান গোষ্ঠীকে প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। এছাড়া ওরকজাই, খট্টক এবং বংগাশ (মিয়ানজাই) ইত্যাদি গোষ্ঠীর পাঠানকেও কিছু কিছু ফৌজে স্থান দেওয়া হতো। তারপর হলো, ওয়াজিরিস্থান অঞ্চলের কুরাম উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্তী অধিত্যকাভূমির মাসুদ গোষ্ঠী, এদেরও প্রথম প্রথম ভারতীয় ফৌজে ভর্তি করা হয়েছিল।

খাস আফগানিস্থান থেকে সংগৃহীত কিছু ডুরাণী আফগান ভারতের সওয়ার বাহিনীতে প্রথমে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শুধু 'ভারতীয় আফগান' রিক্রুট করা হতো। পাঞ্জাবের মূলতান ও ডেরাজাত অঞ্চলে কিছু ডুরাণী আফগান বাস করে এবং এদের ভেতর থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করে কিওরটনের মুলতানী (Cureton's Multani), বেলুচ সওয়ার ও পাঞ্জাব ফ্রন্টীয়ার ফোর্সের ২১নং ক্যাভাল্‌রি ইত্যাদি সওয়ার বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল।

হাজারা নামে আর একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা ঠিক পাঠান জাতীয় লোক নয়, তাতার বংশীয়। সীমান্তের এই তাতার গোষ্ঠীর লোক ভারতীয় বাহিনীতে প্রথম দিকে বহু সংখ্যায় প্রবেশ করে।

বেলুচি : বেলুচিরা সম্ভবতঃ আরব বংশের লোক। এদের সমাজও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। বেলুচি জাতির মধ্যে কতগুলি গোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে, কতগুলি গোষ্ঠী সিন্ধু উপত্যকায় সমতলভূমিতে কৃষকজীবন যাপন করে। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের নীতি হলো শুধু সমতলভূমিবাসী কৃষক বেলুচিকে সৈন্য বিভাগে গ্রহণ করা। পার্বত্য অঞ্চলে বেলুচির প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রাজপুত ও ব্রাহ্মণ : রাজপুত বলতে কোন অঞ্চল বিশেষের লোক বোঝায় না। নেপালে, বিহারে, অযোধ্যায়, দিল্লীতে, জম্মুতে, রাজপুতনায় ও পাঞ্জাবে রাজপুত আছে। প্রত্যেক অঞ্চলের রাজপুত নামে এই যোদ্ধা হিন্দুকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা থাকলেও অসামরিক জাতি বলে চিহ্নিত করেননি। বিদ্রোহী বেঙ্গল বাহিনীর রাজপুতের কীর্তিকলাপ দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

অবশ্যই রাজপুত সমাজের ওপর বিরূপ ছিলেন। সেই কারণে 'রাজপুতকে' সামরিক শ্রেণী বলে গণ্য করা হলেও পুরবিয়া রাজপুতকে বর্জন করা হয়। শুধু দিল্লী, পাঞ্জাব, নেপাল, রাজপুতনা ও জম্মু ইত্যাদি অঞ্চলের রাজপুতকে ফৌজে গ্রহণ করার নীতি গৃহীত হয়।

ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও একটি নীতি অনুসরণ করা হয়। পুরবিয়া ব্রাহ্মণ সুবিধার নয় কারণ বিদ্রোহের ব্যাপারে এরা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। সেই কারণে 'গৌড়িয়া' আর 'দ্রাবিড়' —এই দুই প্রধান শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দ্রাবিড় ব্রাহ্মণকেই বেশী সংখ্যায় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেন। 'গৌড়িয়া' ব্রাহ্মণকে প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। দ্রাবিড় অর্থাৎ দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাত্র কয়েকটী বিশেষ গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণকে সৈন্য বিভাগে কাজ দেওয়া হয়, সব গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণকে নয়।

জাঠ ও গুজর : অনেক ঐতিহাসিক ভারতের জাঠকে শক (Scythian) বংশীয় বলে মনে করেন। বর্তমানে জাঠ বলতে সাধারণতঃ হিন্দু জাঠকেই বোঝায়; যদিও জাঠ-শিখ ও জাঠ-মুসলমান আছে। জাঠদের মধ্যে নানা শ্রেণী ও জাত আছে। ক্ষত্রিয় জাঠেরা অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিত। রাজপুতনাতেও সূর্যবংশীয়, চন্দ্র-বংশীয় ইত্যাদি ক্ষত্রিয় ছাড়া অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয়ও আছে। দিল্লী, মীরাট, রোহটক ইত্যাদি অঞ্চলেই জাঠ সমাজের প্রধান বাসভূমি। ভরতপুর একটা ইতিহাস বিখ্যাত জাঠ রাজ্য। ভরতপুর দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে ইংরাজ ফৌজ প্রথম জাঠের হাতে মার খায়। বর্তমানে জাঠেরা একটি পরিশ্রমী কৃষক সমাজ এবং 'জাঠ' বলতেই সাধারণতঃ কৃষক বোঝায়। পদাতিক এবং

সওয়ার হিসাবে জাঠেরা ভারতীয় ফৌজে প্রচুর সংখ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে।

গুজ্জরদের অনেকে প্রথমাগত শক-সমাজের ইয়ুচি গোষ্ঠীর লোক বলে অনেকে ধারণা করেন। এদের সমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ (Tribal)। পাঞ্জাব, গুজ্জরাট, কাশ্মীর ও রাজপুতানা এদের বাসভূমি। গুজ্জর অর্থ বর্তমানে গোচারক (Grazier) বোঝায় এবং গোচারণ অথবা পশুপালন করাই অধিকাংশ গুজ্জরের জীবিকা। বর্তমানে গুজরেরা মুসলমান।

দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে জাঠ ও গুজর, এই দুটি কথা বিশেষ দুটি অঞ্চলের লোকের জীবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। মীরাট অঞ্চলে কৃষক মাত্রই জাঠ এবং কাশ্মীর বা পাঞ্জাবের পশুপালক মাত্রই গুজর। সুতরাং বর্তমানে এই দুটি কথার দ্বারা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক বংশগত পরিচয় বোঝায় না।

গুর্খা: বর্তমান ভারতীয় বাহিনীতে নেপাল থেকে সংগৃহীত যেকোন লোককেই গুর্খা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গুর্খারা হলো নেপালের বিশিষ্ট একটি সমাজ। এরা রাজপুত বংশীয় এবং উত্তর ভারতের হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম, লোকাচার, সংস্কৃতি ও আকৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে এদের সাদৃশ্য আছে।

নেপালের অন্যান্য সমাজ মঙ্গোল বংশীয় এবং ধর্মমতের দিক দিয়েও অর্ধ-হিন্দু এবং অর্ধ-বৌদ্ধ। নেপাল যুদ্ধ শেষ হয়ে নেপাল রাজের সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির সন্ধি হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই নেপাল থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লোক সংগ্রহ ক'রে ভারতীয় বাহিনীতে ভর্তি করতে থাকেন। প্রথম দিকে গুর্খা সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ করা হতো না, যদিও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই 'গুর্খা' নামটী ব্যবহার করতেন। প্রথম দিকে প্রকৃত 'গুর্খাকে' গ্রহণ না করার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সেই কূটনীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় অর্থাৎ উচ্চ জাতের হিন্দু সম্বন্ধে সতর্কতা।

প্রথম দিকে মধ্য নেপাল থেকে বেছে বেছে একশত মঙ্গোলীয় নেপালীকে ফৌজে গ্রহণ করা হয়, যথা মঙ্গর ও গুরুং সমাজের নেপালী। কিন্তু যখন নেপাল থেকে আরও বেশী লোক সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, তখনও ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজপুত বা ক্ষত্রিয় গুর্খাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন। তখন নেপালের পূর্বাঞ্চল থেকে আরও দুটী মঙ্গোলীয় সমাজ থেকে লোক নেওয়া হতো—রায় ও সিন্ধু সমাজ। সব শেষে সত্যিকারের রাজপুত নেপালী অর্থাৎ গুর্খা সমাজকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ফৌজে ভর্তি করতে রাজী হন। মঙ্গর ও গুরুং নেপালীরা খর্বাকার, রায় এবং সিন্ধু সমাজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার, গুর্খারা দৈহিক উচ্চতায় মোটামুটি ভাবে ভারতীয়দের সমান।

গুর্খা সৈনিকের উর্দি বা সামরিক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই একটু বৈশিষ্ট্য বিধান করেন। গুর্খা সৈনিকের পরিচ্ছদ ভারতীয় সিপাহীর মত না করে ভিন্নভাবে পরিকল্পনা করা হয়। কারণ, গুর্খা সৈনিককে ভারতীয় সিপাহী থেকে স্বতন্ত্র করে রাখার নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে প্রথম থেকেই ছিল, পরবর্তী কালে ভারতীয় বাহিনীর গঠণতন্ত্রেও গুর্খা বাহিনীর স্বতন্ত্রতা আরও ভালভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ইংরাজ সৈনিকেরা যে ধরণের টুপি মাথায় দিতেন, গুর্খা সৈনিকের জন্য ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই কিলম্যার্ণক (kilmanerock) টুপি ধারণের প্রথা প্রবর্তন করেন।

গাড়োয়ালী : অর্থাৎ গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসী। নেপালের পশ্চিমে হিমালয়ের পার্বত্য সানুদেশ গড়োয়ালি নামে পরিচিত। ব্রিটিশ মিলিটারী পণ্ডিতদের গবেষণা অনুযায়ী গাড়োয়ালিরা মূলতঃ 'খাস' নেপালী সমাজের গোষ্ঠী, কালক্রমে ভারতীয় রাজপুতের সঙ্গে এদের শোণিতের সংমিশ্রণ হয়েছে।

গাড়োয়ালিদের বহুদিন পর্যন্ত গুর্খা রেজিমেন্টগুলিতে ভর্তি করা হতো। পরে গাড়োয়ালিদের গুর্খা লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মারাঠা: মারাঠারা অঞ্চল অনুসারে প্রধানতঃ দুটি নামে পরিচিত—দেকানি মারাঠা ও কোঁকানি মারাঠা, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার পূর্বে অর্থাৎ প্রকৃত দাক্ষিণাত্যে যে মারাঠা সমাজ বাস করে, তারাই হলো দেকানি। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ও আরবসাগরের উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চল হলো কোঁকান। সমুদ্রসংলগ্ন এই অঞ্চলের অধিবাসীরাই কোঁকানি মারাঠা নামে পরিচিত। শিবাজীর অভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালে মারাঠা শক্তি-সংঘের ভারতব্যাপী রাজ্যবিস্তার মারাঠার সামরিক প্রতিভার গৌরবময় ঐতিহ্যরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতে একমাত্র মারাঠার সঙ্গে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে দেকানি ও কোঁকানি উভয় শ্রেণীর মারাঠাকে বহু সংখ্যায় গ্রহণ করা হয়েছিল।

ভারতীয় মুসলমান: পাঞ্জাবের মুসলমানদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিশেষ সমাদরের নীতি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সর্বত্র শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান ইত্যাদি চারিটি মুসলমান সমাজ দেখা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই চারিটি সামাজিক নামকে সত্যিকারের বংশবাচক নাম বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি। মোগলত্ব বা পাঠানত্ব ইত্যাদি কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নেই, তারা নিতান্তই প্রাদেশিক মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের একটা বিশেষ টান থাকায় ভারতীয় মুসলমানকে অসামরিক জাতি বলে চিহ্নিত করা হয় নি। ভারতের (অর্থাৎ প্রধানতঃ উত্তর ভারতের)

মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র কৃষকশ্রেণীর মুসলমানকেই ফৌজে ভর্তি করার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন।

কর্ণাটী: ক্লাইভের আমলে মাদ্রাজ বাহিনী তেলেঙ্গা (তেলেগু) সিপাহীতে ভরা ছিল। তামিলভাষী হিন্দুও ছিল। বহুকাল পরে পাহাড়ী, কুর্গী এবং মোপ্‌লাদেরও (মুসলমান) ফৌজে ভর্তি করা হয়। তা ছাড়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ছোঁয়াছুয়ি বা বিধিনিষেধের কোন সংস্কার যাদের ছিল না, তাদেরও অজস্র সংখ্যায় ভর্তি করা হতো, বিশেষ করে বেলদার ফৌজে (Sappers & Miners) এবং মজুর ফৌজে (Pioneers)। 'পারিয়া' নামে অস্পৃশ্য সমাজের লোক স্যাপার ও পাইওনিয়ার হিসাবে মাদ্রাজ বাহিনীতে কাজ করতো। বর্তমানেও ভারতীয় বাহিনীর এই দুই শাখায় মাদ্রাজী 'নিম্নশ্রেণীর' হিন্দুই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী।

মাদ্রাজী মুসলমান নামেও ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে একটি 'সামরিক জাতি' আছে; ভেলোর অঞ্চলে এই মুসলমানদের বাস, এরা নাকি পাঠানবংশীয় এবং হায়দার আলিও নাকি তাই ছিলেন।

তেলেঙ্গা, কুর্গী ও মোপ্‌লা, এই তিন সমাজের লোক প্রথম দিকে ভর্তি করা হলেও পরে এদের ফৌজে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। শুধু তামিল হিন্দু, পারিয়া (অস্পৃশ্য) ও মাদ্রাজী মুসলমান (কর্ণাটী) ফৌজে স্থান লাভ করে।

ফৌজ গঠনে কূটনীতি

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মস্তিষ্কপ্রসূত সামরিক জাতিভেদ প্রথার যেটুকু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, এবং ব্রিটিশ-কথিত সামরিক জাতির যে তালিকাটি আলোচিত হয়েছে, তার তাৎপর্য বিশেষ কষ্ট ক'রে বুঝতে হয় না। থিওরীটা নিজের বীভৎস মিথ্যার পরিচয়ে নিজেকেই ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতে সামরিক জাতি খুঁজতে গিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সামরিকতার আদর্শ খোঁজ করেন নি, জাতিতত্ত্বেরও ধার ধারেন নি। নিছক একটা অভিসন্ধিবহুল পদ্ধতি যার দ্বারা স্বাজাত্যবোধ-সম্পন্ন লোক বাদ দিয়ে ফৌজের জন্য পুরোপুরি চাকুরিয়া মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। সমস্ত পরিকল্পনার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই রহস্য আপনা থেকেই প্রকট হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে এই বৈশিষ্ট্য হলো :

(১) সাধারণভাবে ফৌজ থেকে হিন্দু-বর্জন।

(২) যে সমাজের সিপাহীরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্ভব করেছিল, সেই সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বিশেষভাবে পুরবিয়া-বর্জন।

(৩) কৃষকশ্রেণী থেকেই লোক-সংগ্রহ করার নীতি।

(৪) উত্তর ভারতের লোককে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় গ্রহণের নীতি [অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীকে পাঞ্জাবীকরণের (Punjabisation) ব্যবস্থা]।

(৫) ভারতের বাইরের 'বৈদেশিক' সমাজ থেকে (উপজাতীয় অঞ্চলের পাঠান ও নেপালের গুর্খা) অধিক সংখ্যায় লোক সংগ্রহ।

(৬) যে সমাজের লোক প্রথমাবধি ইংরাজের ফৌজে অনুগত রাজভক্ত সিপাহীরূপে কাজ করেছে, সেই সব পুরাণো সামরিক সমাজকেও নতুন নীতি অনুসারে সামরিক বলে অস্বীকার করা; দৃষ্টান্ত—মাদ্রাজ বাহিনীর তেলেঙ্গা সিপাহী। অর্থাৎ যেসব সমাজে শিক্ষার প্রসার দেখা গেল, সেই সমাজকে ফৌজে গ্রহণ করার নীতিও সঙ্গে সঙ্গে বর্জিত হলো।

(৭) গুর্খা বাহিনীকে সাধারণ ভারতীয় বাহিনী থেকে কতগুলি বিষয়ে স্বতন্ত্র করে রাখা।

(৮) জাত হিসাবে ফৌজ গঠন করার নীতি অর্থাৎ এক এক জাতের লোক নিয়ে এক একটা কোম্পানী। আবার বিভিন্ন জাতের কোম্পানী নিয়ে একটা রেজিমেণ্ট।

(৯) গোরা ফৌজকে ভারতে 'স্থানীয় বাহিনী' না ক'রে ইংলণ্ডের রাজকীয় বাহিনী হিসাবে সাময়িক মেয়াদে ভারতে রাখবার নীতি।

(১০) ফৌজের অফিসার পদগুলি ইংরাজের দ্বারা ভর্তি করা।

(১১) যেসব সমাজের লোক কোনকালেই ইংরাজের ফৌজে সিপাহীগিরি করে নি, সেই সব নতুন ক্ষেত্র থেকে লোকসংগ্রহ করা।

পরিকল্পনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকিয়ে এক কথায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে এটা ফৌজের জন্য মানুষ সংগ্রহের পরিকল্পনা নয়, বস্তুতঃ লড়িয়ে জীব (fighting animal) সংগ্রহের পরিকল্পনা। স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক সংস্কার যে মানুষের মনে আছে, সে যেন কোনমতেই ফৌজে না ঢুকতে পারে। এই কূটনৈতিক সতর্কতার গ্রন্থি দিয়ে পরিকল্পনাটি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। শুধু তাই নয়, ফৌজে ঢুকেও যাতে বিভিন্ন সমাজ বা জাতের ভারতীয় সৈনিকের মধ্যে কোনরকমের ঐক্যবোধ জাগ্রত না হয়, তার জন্য শ্রেণী কোম্পানী (class company) বা জাত-কোম্পানী প্রথার

প্রবর্তন। কিন্তু একটা জাত-কোম্পানীতেও তো সিপাহীদের পরস্পরের মধ্যে বেশ বেরাদারী ভাব হয়ে যেতে পারে এবং তারা যদি ইংরাজবিরোধী একটা চক্রান্তের জন্ম ঐক্যবদ্ধ হয়? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কা সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। একই রেজিমেণ্টে ভিন্ন ভিন্ন জাতের কোম্পানী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, একটার প্রতিষেধকরূপে আর একটা। একটা শিখ কোম্পানীর প্রতিষেধক হিসাবে একটা পাঠান কোম্পানী, একটা রাজপুত কোম্পানীর প্রতিষেধক হিসাবে একটা বেলুচি কোম্পানী ইত্যাদি।

মিউটিনির পরে ভারতীয় বাহিনীকে নতুন করে গঠন করার নীতি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য যে রয়্যাল কমিশন (১৮৫৮ সাল) নিয়োগ করা হয়, তার একটি সুপারিশ হলো—

"The native Indian Army should be composed of different nationalities and castes and, as a rule, mixed promiscuously through each regiment."

অর্থাৎ—দেশীয় ভারতীয় ফৌজকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও জাতের লোক দ্বারা গঠন করতে হবে এবং এক একটি রেজিমেণ্টের মারফৎ এই বিভিন্ন জাতি বা জাতের সৈনিককে এমনভাবে মিশিয়ে রাখতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে কোন সংহতিবোধ সম্ভব না হয়।

কি গভীর কৌশল! এমন করে মেশাতে হবে, যাতে মিলতে না পারে!

স্যার জন লরেন্স যিনি মিউটিনির সময় পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার ছিলেন এবং পরে ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন—তিনি স্পষ্টভাবেই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বেঙ্গল বাহিনীর পক্ষে এত ভয়ানক বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে বেরাদারীর (brotherhood) ভাব তৈরী হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

তাঁর মতে, বেঙ্গল বাহিনীর অধিকাংশ সিপাহী এক জাতের বা সমাজের লোক ছিল বলেই এই বেরাদারী ভাব জমাট হতে পেরেছিল। প্রাক্ মিউটিনির ফৌজে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল। স্যার জন লরেন্সের মত আরও অনেক ব্রিটিশ ধুরন্ধর এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

"প্রতিষেধক" থিওরী

১৮৫৮ সালের রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ এবং গবেষণা অনুযায়ীই দু'টি প্রধান থিওরীর উদ্ভব হয়। একটির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—সামরিক জাতি (martial race) থিওরী। দ্বিতীয়টি হলো ফৌজের গঠনতন্ত্রগত নীতি, যার নাম দিতে পারা যায় প্রতিষেধক (counterpoise) থিওরী। সূত্রটি হলো ঐ রয়্যাল কমিশনের আর একটি সুপারিশ—

"Next to the grand counterpoise of a sufficient European force, comes the counterpoise of natives against natives."

ভাবার্থ—ভারতীয় ফৌজ যাতে বিদ্রোহী হয়ে কিছু করতে না পারে, তার জন্যে সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষে গোরা ফৌজ রাখা হয়েছে। আর একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ভারতীয় ফৌজের মধ্যেই—একটা জাতের ফৌজের প্রতিষেধকরূপে আর একটা জাতের ফৌজ।

ভারতীয় ফৌজে মুসলমানকে ভর্তি করার জন্য ব্রিটিশের এত আগ্রহের কারণ সহজেই বোঝা যায়। ভারতের মুসলমানেরা কখনো দেশপ্রেমিক (patriot) হতে পারে না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এটা বিশ্বাস করতেন। শিখদের সম্বন্ধে ব্রিটিশের মনোভাব ভাল ছিল, কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে শিখেরা ইংরাজ-ভক্তির

পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে শিখ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ ও সতর্কতা খুবই বেশী ছিল। গুর্খারা হিন্দু হ'লেও বিদেশের লোক এবং অত্যন্ত প্রভুভক্ত, সুতরাং এদের বিশ্বাস করা যায়। উপজাতীয় পাঠানের মনে সে সময়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা তো ছিলই না, বরং লুণ্ঠকসুলভ ও একটা আক্রমণপ্রবণ মনোভাব ছিল। এরাও ইংরাজের প্রিয় হয়ে ওঠে, প্রধানতঃ এদের ভারতবিরোধী মনোভাবের জন্যই। উপজাতীয় পাঠানকে শিখের প্রতিষেধকরূপেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফৌজে গ্রহণ করেছিলেন। আফ্রিদি, মাসুদ ইত্যাদি উপজাতীয় পাঠানকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ফৌজে ভর্তি করা হচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় উপজাতীয় পাঠানের অস্থির-মতিত্বের প্রথম প্রমাণ পেয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাবধান হন। ইংরাজের ফৌজের আফ্রিদি সৈনিকেরা এ সময় কিছু কিছু আফগান-প্রীতির পরিচয় দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় অঞ্চলে যে ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান দেখা দেয়, তার প্রভাব থেকে ইংরাজের আফ্রিদি সিপাহীও মুক্ত থাকতে পারে নি। ইংরাজের পেন্সনভোগী পাঠান সৈনিক ব্রিটিশের দেওয়া মেডাল বুকে ঝুলিয়ে উপজাতীয় লস্করের নেতা হয়ে ব্রিটিশ এলাকার ওপর হানা দিয়ে বেড়িয়েছে। এই সব কারণে উপজাতীয় পাঠানকে ফৌজে ভর্তি করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর উৎসাহবোধ করলেন না। ভারতীয় ফৌজে উপজাতীয় পাঠানের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে।

এই অভিজ্ঞতা লাভের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল, উপজাতীয় পাঠানকেও অসামরিক জাতি আখ্যা দেওয়া। যে কারণেই হোক্, মুখ ফুটে সেটা ঘোষণা না করেও কার্যক্ষেত্রে সেটা

সার্থক করা হয়েছে। পাঠান সমাজের আচরণে তীব্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের প্রমাণ কয়েকবার দেখা দিতেই উপজাতীয় পাঠান রিক্রুট করার উদার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সঙ্কীর্ণ ও সংযত করে ফেলেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে পাঞ্জাবের শিখ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রিয় সামরিক জাতি হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আগে বেঙ্গল বাহিনীতে শিখ ভর্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ না হোক্, সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ছিল।

সুতরাং ব্রিটিশের সামরিক জাতিবাদের মধ্যে জাতি প্রশ্নটা আদৌ প্রশ্ন নয় এবং সামরিকতাও নয়। প্রশ্নটা হলো জাতিয়তাবোধহীন মানুষ সংগ্রহ করা। ফৌজের জন্য কৃষক সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ করার নীতির মধ্যেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আসল মনোভাবটি নিহিত রয়েছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধারণা, কৃষকেরা সাধারণতঃ সহরে পলিটিক্সের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর; সুতরাং জাতীয়তাবোধহীন ফৌজী উপাদানরূপে উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ এই ধারণার জন্যেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রংরুট সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে কৃষক সমাজকে বেশী পছন্দ করেন।

যত বেশী অশিক্ষিত, ফৌজের পক্ষে তত বেশী উপযোগী—ফৌজে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই নীতি সুদীর্ঘকাল ধরে অবিচল রয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যেসব অঞ্চল থেকে ফৌজের জন্য বেশী লোক সংগ্রহ করা হয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেখানে শিক্ষা প্রসারের নীতি কার্যকরী করেন নি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে ইচ্ছে করেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে, যাতে সেখান থেকে আনকোরা অশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব হয়। প্রধানতঃ শিক্ষিত হয়ে ওঠবার অপরাধের

জন্যই মাদ্রাজের হিন্দুকে ফৌজ থেকে বিদায় করে দেবার নীতি গৃহীত হয়। মাদ্রাজী হিন্দুর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষণ দেখামাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাবধান হয়ে যান।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, বাঙ্গালী সমাজকেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই শিক্ষিত হওয়ার অপরাধে ফৌজে গ্রহণ করেন নি। কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাতের পর শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজভক্ত সমাজ হয়ে ওঠে। তবু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালীকে ফৌজে গ্রহণ করেন নি, কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই। সে সময়ের বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সামরিক ঐতিহ্যের কোন নিদর্শন ছিল না। নবাবী ফৌজও বস্তুতঃ অবাঙ্গালী সৈনিকে গঠিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু কিছু কিছু নবাবী ফৌজে এবং কোম্পানীর ফৌজে শিবিরানুচর (camp follower) 'পাইওনিয়ার' দল হিসাবে অবশ্য কাজ করতো। বাঙ্গালী হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ফৌজী চাকুরীকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল না। তা ছাড়া পেশাদার অবাঙ্গালী সিপাহী এত সুলভ ছিল যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য-সংগ্রহে বাঙ্গলাদেশের ওপর দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। শোনা যায় ফরাসীদের চন্দননগর ব্যাটালিয়নে বাঙ্গালীকে সিপাহী হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

কিন্তু রাজভক্ত বাঙ্গালী সমাজকে অসিচালনার কাজে নিযুক্ত না করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আর একটি সমগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন—মসীচালনা। এ বিষয়ে বাঙ্গালী কেরাণী ব্রিটিশকে যে সাহায্য করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কাছে তার ঐতিহাসিক মূল্য রাজভক্ত অবাঙ্গালী সিপাহীর সাহায্যের তুলনায় কম নয়। হয়তো পরবর্তীকালে বাঙ্গালীকে ফৌজে ভর্তি করার কথা উঠতো।

১৮৫৮ সালের রয়্যাল কমিশন বাঙ্গালীকে সামরিক জাতির তালিকায় স্থান দেয় নি কিন্তু সেটা বাঙ্গালীর ইংরাজভক্তির অভাবের জন্য নয়, কারণ বাঙ্গালী তখন শ্রেষ্ঠ ইংরাজভক্ত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর ইংরাজভক্তির ঐতিহ্য একটানা চলে এসে উনবিংশ শতকের শেষদিকেই মন্দীভূত হয় এবং বাঙ্গালীর স্বদেশীয়ানার অভ্যুত্থান ব্রিটিশের চক্ষে বাঙ্গালীকে রাজদ্রোহী জাতিরূপে চিহ্নিত করে দেয়। সমর বিভাগে বাঙ্গালীকে যে কখনই গ্রহণ করা যেতে পারে না, এই বিষয়ে ১৯০৫ সালের পর থেকেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ হন।

ফৌজী গঠনতন্ত্রের রূপান্তর

১৯০২ সালে ভারতীয় ফৌজকে ব্যাপকভাবে পুনঃসংগঠন করা হয়। এই সময় লর্ড কিচেনার ভারতের জঙ্গীলাট অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী এক প্রধান সেনাপতির পরিচালনাধীনে হলেও তিনটি বাহিনীর নম্বরানুক্রম স্বতন্ত্রভাবেই ছিল। সে সময় রুশ-জাপানের যুদ্ধ চলেছে এবং ব্রিটিশ শক্তিও সেই সময়ে বুঝতে পারে যে নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর একটা যুদ্ধবহুল অধ্যায় আরম্ভ হবে। সেই জন্য ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে শান্তিকালীন (peace time) ব্যবস্থা বলে বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকবে না। সর্বদা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। শান্তির সময়েও অর্থাৎ যুদ্ধের ব্যাপার না থাকলেও ভারতীয় ফৌজকে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকালীন (wartime) রীতিনীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হবে।

এই সময় থেকেই ভারতীয় ফৌজের বিধি ও ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরী করা হয়, যা দেখলে মনে হবে যে ভারতীয় ফৌজ যেন সদাসর্বদা রণক্ষেত্রের শিবিরে রয়েছে। এবং সত্য সত্যই ভারতীয় বাহিনীকে এই সময় থেকে 'রণক্ষেত্রের ফৌজ' বা 'Field Army' বলা হতে থাকে। ১৯০২ সালের পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় ফৌজের বস্তুতঃ ধর্মান্তর এবং রূপান্তর, দুই-ই গঠন করা হয়। 'সাম্রাজ্যিক বাহিনী' (Imperial Army) হিসাবে ধর্মান্তর এবং 'রণক্ষেত্রের ফৌজ' (Field Army) হিসাবে রূপান্তর। লর্ড কিচেনারের পরিকল্পনা অনুসারে এই ব্যবস্থা করা হয় যে,

ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যেক রেজিমেণ্টকে কিছুকালের জন্ম ভারত সীমান্তের শিবিরে থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।

ব্রিটিশ ফৌজী পলিসির এই আর একটি বৈশিষ্ট্য। সীমান্তবাসী পাঠানের সংসারকে চিরকালের রণক্ষেত্রে পরিণত করে রাখা, যাতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ফৌজ উভয়েই সেখানে হাত পাকিয়ে নেবার সুযোগ পায়।

তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর নম্বরস্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে একাদিক্রমে সবগুলি রেজিমেণ্টের নম্বরীকরণের ব্যবস্থা হয়। কোন্ রেজিমেণ্টগুলির নম্বর আগে পড়বে এবং কোন্‌গুলির পরে, এর মীমাংসার জন্ম ব্যবস্থা হয় যে, বেঙ্গল বাহিনীর রেজিমেণ্টগুলির থেকেই নম্বর আরম্ভ হবে—এক নম্বর থেকে পর পর সংখ্যা। বেঙ্গল বাহিনীর নম্বরীকরণ যে সংখ্যায় শেষ হবে, তার পরের সংখ্যা থেকে আরম্ভ হবে পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ব্যাটালিয়নগুলির নম্বর, তারপর আবার একটা বাহিনীর নম্বর।

প্রথম বেঙ্গল বাহিনী, তারপর পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, তারপর মাদ্রাজ বাহিনী, তারপর হায়দরাবাদ কন্টিনজেণ্ট এবং সব শেষে বোম্বাই বাহিনী—এই ক্রম অনুসারে বিভিন্ন বাহিনীর সমস্ত ব্যাটালিয়নগুলিকে যেন এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পর পর নম্বর দেওয়া হয়।

ভারতীয় ফৌজের নম্বরীকরণের ইতিহাস অতি বিচিত্র। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বার বার ফৌজের নম্বর পরিবর্তন করেছেন এবং বার বার এ সম্পর্কে ফৌজের মধ্যে মান, অভিমান ও প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছে। অভিমানের কারণ হলো ফৌজী সমাজের নম্বর মোহ। যে ব্যাটালিয়ন বহুদিন ধরে এক নম্বর দ্বারা চিহ্নিত হয়ে এসেছে, তার কাছে এই '১নং' চিহ্নটিই শ্রেণী মর্যাদার প্রতীকের

মত মনে হয়েছে। সুতরাং কারও বনিয়াদী ১নংটিকে রহিত করে ১৩নং চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা হ'লেই স্বভাবতঃ এক নম্বরীদের মনে এই অভিমান হতো যে, তাদের যেন বার ধাপ নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো।

ফৌজী সমাজের এই অভিমানের মর্যাদা রাখতে গিয়ে ১৯০২ সালের পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটা অঙ্কের কৌশল অবলম্বন করেন। যথা:

বেঙ্গল বাহিনীর ব্যাটালিয়নগুলির নম্বর এক থেকে আরম্ভ করে দেখা গেল যে ৫০ নম্বরে এসে সব ব্যাটালিয়নের নম্বরীকরণ শেষ হয়ে যায়। এর পরেই পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নম্বরীকরণের পালা এবং পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্রথম ব্যাটালিয়ন হলো ১নং শিখ। সুতরাং নতুন নিয়ম অনুসারে ১নং শিখ ব্যাটালিয়নের নম্বর হলো ৫১নং। পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ২নং ব্যাটালিয়নটি হলো ৫২নং—ইত্যাদি। ১নং শিখের পক্ষে ৫১নং ব্যাটালিয়নে পরিণত হ'য়েও অভিমানের বিশেষ কারণ রইল না। কারণ '৫১নং' চিহ্নের মধ্যে '১' সংখ্যাটি তো রাখাই হলো। ২নং ব্যাটালিয়নেরও দুঃখ নেই, '৫২নং' চিহ্নের মধ্যে তার প্রিয় '২' সংখ্যাটি আছে। এইভাবে ক্রমানুসারে নম্বর লাভ করে পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের শেষ ব্যাটালিয়নটি ৬৫নং চিহ্ন ধারণ করে।

পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পরেই মাদ্রাজ বাহিনীর নম্বরীকরণের পালা। সুতরাং ১নং মাদ্রাজ পদাতিকের পক্ষে এইবার ৬০নং গ্রহণ করার কথা। কিন্তু '৬০নং' চিহ্নটির মধ্যে তার বনিয়াদী '১' সংখ্যাটি নেই। অতএব উপায়? ১নং মাদ্রাজ পদাতিককে ৬১নং চিহ্ন দিলে '১' সংখ্যার গর্ব অটুট থাকে, কারণ ৬১টির মধ্যে '১' আছে। ৬০-এর মধ্যে নেই। কার্যতঃ তাই হলো। ১নং মাদ্রাজ

পদাতিকের নতুন নম্বর হলো ৬১, ২নং মাদ্রাজ ব্যাটালিয়নের নম্বর হলো ৬২, ইত্যাদি। মাঝখানে '৬০নং' চিহ্নের স্থান শূন্য রাখা হলো। এইভাবে ১নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ারের নতুন নম্বর হয় ১০১নং।

পদাতিক বাহিনীর নম্বরীকরণের যে ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও নীতি গৃহীত হয়, সওয়ার বাহিনী সম্বন্ধেও তাই হয়।

নতুন নম্বরীকরণ হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রেজিমেণ্টগুলির পুরণো আখ্যা (Title) অটুট রাখেন, শুধু আখ্যা নয়, যে কোন রেজিমেণ্টের প্রাক্তন কীর্তিচিহ্নস্বরূপ যত মেডাল ও পতাকার উপহার রেজিমেণ্টেরই নিজস্ব করে রাখা হয়, এবিষয়ে হস্তান্তর বা পরিবর্তন হয় নি।

সমস্ত ভারতীয় ফৌজকে এইভাবে একাদিক্রমে পর পর নম্বর দিয়ে যথার্থ একটি সাধারণ লাইন (General Line) সম্ভব করা হয়। গুর্খা ব্যাটালিয়নগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বতন্ত্র 'গুর্খা লাইন' গঠিত করা হয়।

১নং থেকে আরম্ভ করে ১৩০নং-এরই মধ্যে সমস্ত ভারতীয় পদাতিক ব্যাটালিয়নের নম্বরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। রেজিমেণ্টগুলি একটি করে ব্যাটালিয়নে গঠিত, শুধু ৩নং গাড়োয়াল রাইফেলের দুটি ব্যাটালিয়ন ছিল। ১নং থেকে আরম্ভ করে ১৩৩নং—এর মধ্যে ১৪টি নম্বরের স্থান শূন্য পড়ে থাকে।

গুর্খা লাইনে সবশুদ্ধ ১০টি রেজিমেণ্ট (১নং থেকে আরম্ভ ক'রে ১০নং) থাকে। গুর্খা রেজিমেণ্টগুলি ডবল-ব্যাটালিয়নে গঠিত।

১৯০২-১১ সাল, এই সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যার পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ভারতীয় বাহিনী একটি নতুন পরিণত রূপ লাভ করে। সওয়ার বাহিনীর মধ্যে সিল্লাদার প্রথা পূর্ববৎ অপরিবর্তিত থাকে। শুধু তিনটি লাইট ক্যাভাল্‌রি (২৬নং, ২৭নং ও

২৮নং) অ-সিল্লাদার প্রথার নিদর্শন হিসাবে থাকে। লাইট ক্যাভাল্‌রির ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, উর্দি ইত্যাদি সবই সরকারী (সমর বিভাগের) সম্পত্তি। সিল্লাদার প্রথা হলো ঠিকাদার সওয়ার প্রথা—ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, উর্দি ইত্যাদি সিল্লাদারের নিজস্ব, পরিচালনা সমর বিভাগের।

১৯১১ সালের মধ্যেই ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নম্বরীকরণ ও পুনর্গঠন অনেকখানি অগ্রসর হয়। ১নং থেকে আরম্ভ করে ৩৯নং-এরই মধ্যে সওয়ার রেজিমেণ্টগুলির নম্বর পড়ে। শুধু মাঝখানে ৪নং ও ২৪নং শূন্য পড়ে থাকে। উক্ত ৩৯টি নম্বর চিহ্নিত সওয়ার রেজিমেণ্ট ছাড়া, ভারতীয় ফৌজে আরও কতগুলি সওয়ার দল থাকে, যথা, গাইড্‌স্ ক্যাভাল্‌রি (Guides Cavalry), তিনটি বডিগার্ড (Body Guard) কোর, এডেন ট্রুপ (Aden Troop) ইত্যাদি।

নম্বরপ্রাপ্ত সওয়ার রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে কয়েকটি জাত-রেজিমেণ্ট হয়। ১নং স্কিনারের সওয়ার (Skinner's Horse) রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মুসলমান দ্বারা গঠিত রেজিমেণ্ট। ১৪নং মারের জাঠ ল্যান্সার (Murray's Jat Lancers) রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে জাঠ সওয়ার দ্বারা গঠিত রেজিমেণ্ট। ১৫নং কিওরটনের মুলতানী (Cureton's Multanis) রেজিমেণ্টটি সম্পূর্ণরূপে মুলতানী পাঠান সওয়ার দ্বারা গঠিত। অন্যান্য সওয়ার রেজিমেণ্টগুলি জাত-রেজিমেণ্ট (Class Regiment) নয়—বিভিন্ন জাত-স্কোয়াড্রন দিয়ে গঠিত এক একটি রেজিমেণ্ট। শিখ, ডোগরা, পাঠান, পাঞ্জাবী, জাঠ, রাজপুত ও দেকানি মুসলমান সওয়ারদের দিয়ে জাত হিসাবে এক একটি স্কোয়াড্রন। গুর্খা লাইনে সওয়ার ফৌজ নেই।

লর্ড কিচেনারের উদ্যোগে পুনর্গঠিত ভারতীয় ফৌজ প্রথম

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিয়ৎকাল পূর্ব পর্যন্ত যে আকৃতি, প্রকৃতি ও গঠনতন্ত্র লাভ করে তারই পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

কিন্তু লর্ড কিচেনারের পরিকল্পনাটির প্রত্যেকটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হতে না হতেই ১৯১৪ সাল এসে পড়ে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং পরিকল্পনার কিছুটা কাজও স্থগিত থাকে এবং ভারতীয় ফৌজকে রণক্ষেত্রে ছুটে যেতে হয়।

১৯১৪ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র জনবলের পরিমাণ ছিল—১ লক্ষ ৫৫ হাজার। যুদ্ধের জন্য নব-সংগৃহীত সৈন্য নিয়ে নতুন নতুন দল গঠিত হয় এবং ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে ভারতীয় ফৌজের জনবলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী রণক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। নতুন বাহিনী গঠিত হয়ে তাদেরও কিছু অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয়, কিছু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজের কতগুলি ত্রুটি ধরা পড়ে। এক-ব্যাটালিয়ন প্রথা এবং রিজার্ভ প্রথা যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে আশানুরূপ কার্যকরী হতে পারে নি। সিল্লাদার প্রথায় গঠিত সওয়ার বাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে নি।

১৯২১ সালে ভারতীয় ফৌজকে আবার সংস্কার করার আয়োজন আরম্ভ হয়। সিল্লাদার সওয়ার ফৌজ উঠিয়ে দেওয়া হয়। ৩৬টি সওয়ার রেজিমেন্টের অন্তর্গত দু'দুটো করে রেজিমেন্টকে মিলিয়ে একটি রেজিমেন্ট করা হয়। সুতরাং এভাবে নবগঠিত ১৮টি সওয়ার

রেজিমেণ্ট এবং তার সঙ্গে পূর্বেকার অ-সিল্লাদার ২টি সওয়ার রেজিমেণ্ট (২৭ নং ও ২৮ নং লাইট ক্যাভাল্‌রি) ও গাইডস্‌ ক্যাভাল্‌রি (Guides Cavalry)—সবশুদ্ধ মিলিয়ে দাঁড়ায় ২১টি রেজিমেণ্ট।

এই ২১টি রেজিমেণ্টের তিনটি করে রেজিমেণ্ট নিয়ে আবার ৭টা গ্রুপে ভাগ করা হয়। গ্রুপ গঠন করার সময় দেখা হয় যে, তিনটি রেজিমেণ্টের জাতগত গঠন (racial class composition) একই রকমের কিনা। এভাবে গ্রুপ করার অর্থ রিজার্ভ তৈরীর উদ্দেশ্য। একটু ব্যাখ্যা করেই বলা যাক, গ্রুপের একটি রেজিমেণ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হলো এবং তার মধ্যে একটি ডোগরা জাত-কোম্পানী হয়:তো ফ্রণ্টে কিছুদিন লড়াই করার পর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হবে অথবা অন্যত্র বদ্‌লি হ'তে বাধ্য হবে। তখন গ্রুপের অন্য রেজিমেণ্টের একটি ডোগরা জাত-কোম্পানীকে ফ্রণ্টে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এই গ্রুপ প্রথাকে ১৯৩৭ সালে আর এক ধাপ অগ্রসর করা হয়। ৭টা করে রেজিমেণ্ট নিয়ে একটি গ্রুপ হয়। সবশুদ্ধ ৩টি গ্রুপ হয়। একটি গ্রুপের ৭টি রেজিমেণ্টের মধ্যে ১টি রেজিমেণ্টকে স্থায়ীভাবে ডিপো ইউনিট হিসাবে গ্রুপের সকল রেজিমেণ্টের জন্য ট্রেনিং (শিক্ষাদান) রেজিমেণ্ট করে রাখা হয়।

১৯৩৮ সালে ঐই সব সওয়ার রেজিমেণ্টের মধ্যে ২টি রেজিমেণ্টকে যন্ত্রোপেত করা হয় এবং অন্যান্যগুলিকে যন্ত্রোপেত (mechanized) করার নীতি ঘোষিত হয়।

১৯২১ সালে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীরও আর এক দফা সংস্কার সাধিত হয় এইবার বিশুদ্ধ রেজিমেণ্টীয় আদর্শে পদাতিক ফৌজ পুনর্গঠন করা হয়। ৬টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি রেজিমেণ্ট

গঠনের ব্যবস্থা হয়, এবং তার মধ্যে একটি ব্যাটালিয়ন ট্রেনিং ব্যাটালিয়ন হিসাবে থাকে। ট্রেনিং ব্যাটালিয়নগুলিকে '১০নং' চিহ্ন দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টের প্রথম ৫টি ব্যাটালিয়নের পরেই একটি ১০নং চিহ্নিত ব্যাটালিয়ন হলো। সুতরাং মাঝখানে ৬নং থেকে ৯নং পর্যন্ত ৪টি ব্যাটালিয়নের স্থান শূন্য থাক্‌ছে। ইচ্ছে করেই এই স্থান শূন্য রাখা হয়, ভবিষ্যৎ জরুরী প্রয়োজনে বা যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে নবগঠিত ব্যাটালিয়নের জন্য।

১৯২১ সালে ভারতীয় পদাতিক ফৌজকে হ্রস্ব করা (reduction) হয়। ১৯২৩ সালে আর এক দফা ছাঁটাই হয়। ১৯৩২ সালে পাইওনীয়ার বাহিনীকেও ছোট করে ফেলা হয়। এইভাবে প্রথম যুদ্ধের পর পুনর্গঠন ও হ্রস্বতা সাধনের পর ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বিস্ফোরণ দেখা দেবার প্রাক্কালে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর যে রূপ আমরা দেখতে পাই, সেটা হলো : ১৮টি ভারতীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকের ৬টি করে ব্যাটালিয়ন ; আর ১০টি গুর্খা রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকের ২টি করে ব্যাটালিয়ন।

ভারতীয়করণের (Indianisation) প্রথম ঘোষণা

ভারতীয় ফৌজের দায়িত্বপূর্ণ অফিসারের পদগুলি ব্রিটিশ অধিকৃত। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই এই কূটনৈতিক সতর্কতা চলে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়-ফৌজকে ভারতীয়করণের নীতি প্রথম ঘোষণা করেন। ভারতীয়-করণ অর্থে অফিসার পদে ভারতীয়ের নিয়োগ, কারণ সাধারণ সৈনিক সমাজ তো ভারতীয়ই ছিল।

নীতি ঘোষিত হলো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে উদ্যোগ দেখান

হলো সেটা নীতির পিত্তিরক্ষার মত ব্যাপার। ২টি সওয়ার রেজিমেণ্ট এবং ৬টি পদাতিক ব্যাটালিয়নকে বেছে নেওয়া হলো, যার সমস্ত অফিসার পদে ভারতীয়কে নিয়োগ করা হবে। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহের সীমা আর একটু প্রসারিত হয়—আরও একটি সওয়ার রেজিমেণ্ট, আরও ৬টি পদাতিক রেজিমেণ্ট এবং তাদের সম্পর্কিত এঞ্জিনিয়ার ও সিগন্যাল কোরগুলিতেও ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করে ভারতীয়করণের নীতিকে একটুখানি কাজের রূপ দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালে ভারতীয়করণ নীতি ঘোষিত হবার পর ভারতীয় ফৌজে অফিসার পদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারতীয় যুবককে ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্টে রয়্যাল মিলিটারী কলেজে (Royal Military College, Sandhurst) গিয়ে শিক্ষালাভ করতে হতো। ১৯৩১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম একটি সামরিক শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়—দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারী অ্যাকাডেমি (Indian Military Academy)। ভারতীয় যুবক এই শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেই ভারতীয় ফৌজে অফিসার পদ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে।

ভারতীয় আর্টিলারী বা গোলন্দাজ ফৌজ

সেই যে সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ভারতীয় গোলন্দাজ ফৌজ উঠিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সুদীর্ঘকালের মধ্যেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈনিকের হাতে কামান চালাবার ভার দিতে সাহস করেন নি। পূর্বে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মিউটিনির পর ভারতীয় বলতে মাউণ্টেন ব্যাটারি (mountain battery) রূপে তিনটি ছোট গোলন্দাজ দল থাকে। ১৯৩৫ সালে আবার

নতুন করে ফিল্ড ব্যাটারী (field battery) রূপে ভারতীয় গোলন্দাজ ফৌজ গঠিত হয়।

ভারতীয় ফৌজের চতুর্বর্গ দায়িত্ব

ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজের ওপর যতগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব চাপানো হয়েছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কোন ডোমিনয়ন ফৌজের তা নেই। অবশ্য কর্তব্যগুলি হলো কর্তৃত্বহীন কর্তব্য এবং দায়িত্বগুলি হলো বস্তুতঃ বাধ্যতামূলক কর্তব্য। ভারতীয় ফৌজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার দ্বারা কিছু আসে যায় না।

(১) প্রথম হলো—ভারতীয় ফৌজের সাম্রাজ্যিক (imperial) দায়িত্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রমণের আশঙ্কা হলে, অথবা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য কোন দেশ আক্রমণ করলে, অথবা ব্রিটিশের স্বদেশেও শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হলে ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য। এ বিষয়ে ১৯১৪ সালের ভারত শাসন বিধানেও ভারত গবর্ণমেণ্টের ওপর কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার দেওয়া হয় নি। ভারতের বাইরে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় ফৌজকে সর্বদা-যুদ্ধের-জন্য-প্রস্তুত ফিল্ড আর্মি (field army) হিসাব তৈরী করে রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ ফিল্ড আর্মি বলতে ভারতের দেশীয় ফৌজকেই বোঝায়।

(২) দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো—অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজ। ভারতের অভ্যন্তরেই কোন অরাজকতা অশান্তি বা আইনভঙ্গের ঘটনা দেখা দিলে, সেসব দমন করার কাজে ভারতীয় ফৌজ নিযুক্ত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজকে অসামরিক কর্তৃপক্ষের (civil power)

নির্দেশ মেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতীয় ফৌজ শুধু সামরিক কর্তৃপক্ষের বাহন নয়, অসামরিক কর্তৃপক্ষেরও বাহন।

(৩) তৃতীয় দায়িত্ব হলো—দেশরক্ষার দায়িত্ব (defence)। ভারতবর্ষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে ভারতীয় ফৌজ অবশ্যই দেশের সীমান্ত রক্ষা করবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ফৌজের ওপর বিশেষ কোন নির্দেশ নেই, এটা কাগজে লেখা একটা নীতি মাত্র। দেশরক্ষার নীতি অনুযায়ী ভারতীয় ফৌজকে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ আদর্শে কখনো গঠন করা হয় নি। ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ভারতীয় ফৌজকে কিভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে নিযুক্ত করা হবে, সে পরিকল্পনা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের "গোপন পরিকল্পনা"।

(৪) চতুর্থ দায়িত্ব হলো—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'চির-অশান্ত' ব্রিটিশবিরোধী উপজাতীয় সমাজকে সায়েস্তা করে রাখার দায়িত্ব।

ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটা বিশেষ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় ফৌজের ওপর নির্ভর করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাহস করেন নি। ভারতে অবস্থিত গোরা ফৌজের অধিকাংশকে অভ্যন্তরীণ 'নিরাপত্তা ফৌজ' (internal security troop) বলা হয় এবং এরাই হলো ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধান ভরসা।

১৯৩৫ সালের একটা হিসাব উধৃত করা যাক, যাতে এই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কূটনীতিগত তথ্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

ফিল্ড ফৌজ (field army) হিসাবে ভারতবর্ষে ১২টি ব্রিটিশ

ব্যাটালিয়ন এবং ৩৬টি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ২৮টি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন এবং ২৭টি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় ফৌজের অধিকাংশ ভারতের বাইরে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত এত বিরাট একটা ফৌজ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখার কি প্রয়োজন? দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি বলতে গেলে তো শুধু কয়েকটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের অস্ত্রহীন আন্দোলন! এই অশান্তি দমন করতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তো ছিলই।

এই প্রশ্নের উত্তর হলো—'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ' কথাটা একটা কথার কথা মাত্র। মিষ্টি ভাষায় ওস্তাদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই ফৌজকে দখলদার ফৌজ (army of occupation) আখ্যা না দিয়ে 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ' আখ্যা দিয়েছেন। আসলে এই ফৌজ দখলদার ফৌজ মাত্র।

ভারতীয় ফৌজ সম্বন্ধে আর একটা সতর্কতার নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চিরকাল পালন করে আসছেন। ভারতে অবস্থিত গোরা ফৌজ ও ভারতীয় ফৌজের অস্ত্রশস্ত্রের তারতম্য। ভারতীয় ফৌজের তুলনায় গোরা ফৌজের হাতে উন্নততর অস্ত্রোপকরণ থাকবেই, এই নীতির নড়চড় করা হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে এই নীতি চলে আসছে, মাত্র ১৯৩৫ সালে পৌঁছে এই নীতির ব্যতিক্রম করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনস্থ করেন। ভারতীয় ফৌজের সম্বন্ধে মেজর ডোনোভান জ্যাকসন লিখেছেন—

"His (Indian soldier's) arms and equipment are

identical with those of his British comrades, and now no longer one slip behind as was formerly the case".

"পূর্বে ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে (১৯৩৫ সালের পর থেকে) সে পার্থক্য নেই।" মেজর জ্যাকসন যতখানি স্পষ্টতার সঙ্গে এই অস্ত্রগত সমানাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন কার্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা সমানাধিকার হয় নি। ব্রিটিশ সৈনিকের অস্ত্রোপকরণের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রোপকরণ নানা বিষয়ে এখনো নিকৃষ্ট হয়ে আছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর

১৮৫৮ সালে পেশোয়ার শিবিরে এক প্রাতঃকালে সারবন্দী ভারতীয় সৈনিকের দল জনৈক রাজপুরুষের মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পাঠ শুনছিল। একদিকে দাঁড়িয়েছিল 'খাকি' পরিচ্ছদে সজ্জিত পাঞ্জাব ও সীমান্তের সৈন্য। অপরদিকে দাঁড়িয়েছিল লাল কোর্তায় সজ্জিত বেঙ্গল বাহিনীর একটি রাজভক্ত অথচ বিষণ্ণ ব্যাটালিয়ন, যারা বিদ্রোহে যোগদান করে নি।

খাকি কোর্তারা হলেন 'উত্তুরে' মানুষ (men of the north) এবং লাল কোর্তারা হলো 'পুরবিয়া' (men of the east) মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় ফৌজ থেকে পুরবিয়া বর্জনের নীতি গৃহীত হয় এবং হাজার হাজার উত্তুরে লোক ভর্তি করে ভারতীয় ফৌজ গঠিত হয়ে উঠতে থাকে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে অতি তাড়াতাড়ি লোক সংগ্রহ করে অনেকগুলি অরেগুলার সৈন্যদল তৈরী করা হয়। পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান এবং সীমান্তের পাঠান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ব্রিটিশের আবেদনে সাড়া দেয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন, শিখ ও পাঠানের পক্ষে ইংরাজের প্রতি এত প্রবল বন্ধুত্বের আগ্রহ হওয়ার দুটি প্রধান কারণ ছিল। পুরবিয়া সিপাহীর প্রতি শিখদের মনে একটা তীব্র বিদ্বেষ ছিল, কারণ কয়েক বৎসর পূর্বেই পুরবিয়া সিপাহী ইংরাজের সঙ্গে এসে শিখের দেশ আক্রমণ করেছিল। প্রকৃত আক্রমণকারী ইংরাজের ওপর রাগ না হয়ে, ইংরাজের অনুচর পুরবিয়া সিপাহীর ওপর শিখদের রাগ হওয়া একটু বিস্ময়ের বিষয়। শিখেরা নিশ্চয়

কল্পনা করতে পারে নি যে, এই পুরবিয়া সিপাহীরা মনেপ্রাণে শিখরাজ্য আক্রমণের বিরোধী ছিল। যাই হোক্, উভয়ের মধ্যে মনস্তত্বগত একটা মস্ত বড় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। বহুদিন ইংরাজের দাসত্ব করা সত্ত্বেও পুরবিয়া সিপাহীর মনে সে-সময় জাতীয় এবং ভারতীয় গর্বের সংস্কার সচেতন হয়ে উঠেছে, আর সদ্য-পরাধীন শিখ সৈনিকের মন ভারতীয়তাবোধ বিসর্জন দিয়ে ইংরাজ ভক্তির দীক্ষা নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সীমান্তের পাঠানদের পক্ষে এত ব্যস্ত হয়ে ইংরাজের জরুরী ফৌজে যোগদান করার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, অর্থাৎ লুঠের লোভ। ইংরাজের ফৌজে যোগ দিলে বিদ্রোহী সিপাহীর দেশ হিন্দুস্থানের ধনরত্ন দু'হাতে লুঠ করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে—এই সুস্বপ্নের তাড়নায় সীমান্তের পাঠান ১৮৫৭ সালের জরুরী অরেগুলার বাহিনীতে দলে দলে ভর্তি হয়। তাদের স্বপ্ন সফলও হয়েছিল। (১) বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিকার থেকে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধার করার কাজে ইংরাজের অনুচরফৌজরূপে পাঞ্জাব ও সীমান্তের নতুন সৈনিক যে ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে দেশে ফিরেছিল, তার কাহিনী আজও পাঞ্জাব ও পেশোয়ারে রূপকথার মত প্রচলিত রয়েছে।

বিদ্রোহ দমনের জন্য আর একটি সমাজ থেকে এই সময় খুব বেশী করে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এরা হলো নেপালের বিখ্যাত যুদ্ধনিপুণ গুর্খা সমাজ।

বিদ্রোহ শান্ত হবার পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা মাত্র

(1) "Probably first, however among the motives of those who enlisted in the new corps was the thought of the wealth of Hindusthan."—Sir George McMunn

ভারতীয় বাহিনীকে আবার নতুন করে সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একটি রয়্যাল কমিশন এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনা করেন। সমগ্র দেশীয় ফৌজকে অরেগুলার প্রথায় সংগঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিষয়ে অরেগুলার পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স (Punjab Irregular Force) নামে বাহিনীটিকেই মডেল রূপে ধরে নেওয়া হয়।

তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী পূর্ববৎ স্বতন্ত্রভাবেই থাকে। মাদ্রাজ বাহিনী ছাড়া আর সব বাহিনীর সমস্ত সওয়ার দলকে সিল্লাদার প্রথায় গঠন করা হয়। ভারতীয় সৈনিকের হাতে কামানদাগার কাজ না দেওয়ারই সিদ্ধান্ত হয়, দেশী গোলন্দাজ বাহিনী বাতিল করা হয়। প্রত্যেক সিপাহী ব্যাটালিয়নে পূর্বে ২২ জন করে ব্রিটিশ অফিসার থাকতো, অতঃপর প্রতি ব্যাটালিয়নে ৬ জন করে ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়।

প্রেসিডেন্সী বাহিনীগুলি এবং তার সঙ্গে পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স ও হায়দরাবাদ কণ্টিনজেণ্ট (Hyderabad Contingent) নামে দুটি 'স্থানীয়' (Local) বাহিনী যোগ করলে, এই সময়ে ভারতীয় ফৌজের মোট শক্তি দাঁড়ায়—৪২টি সওয়ার রেজিমেণ্ট, ১৪২টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং ৩টি এঞ্জিনিয়ার কোর। সর্বসমেত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈনিক।

পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স নামে যে 'স্থানীয়' বাহিনীটি পূর্বে গঠন করা হয়েছিল, তার পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব ছিল পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের, জঙ্গীলাটের নয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সাত তাড়াতাড়ি যেসব পদাতিক দল গঠিত হয়েছিল, সবই এই স্থানীয় পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নম্বর দিয়ে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

নম্বর বিভ্রাটের ইতিহাস

ভারতীয় ফৌজের নম্বর বিভ্রাটের ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক নতুন সংগঠন ও সংস্কারের সময় নতুন করে নম্বরীকরণেরও প্রয়োজন হয়। সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার ঠিক অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে সমগ্র দেশীয় ফৌজের নম্বরগত একটা রূপ কল্পনা করা যেতে পারে।

(ক) বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনী—১নং থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নম্বরের ব্যাটালিয়ন ও দল। (খ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বাহিনী—১নং থেকে আরম্ভ করে ক্রমোর্ধ বিভিন্ন নম্বরের ব্যাটালিয়ন ও দল। (গ) পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের অধীন একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় বাহিনী অর্থাৎ পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স—এরও স্বতন্ত্র নম্বর ব্যবস্থা, ১নং ব্যাটালিয়ন থেকে আরম্ভ করে পর পর সংখ্যায় বিভিন্ন নম্বরের ব্যাটালিয়ান। (ঘ) এ ছাড়া হায়দরাবাদ কন্টিনজেন্ট ইত্যাদি আরও বহু স্থানীয় বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে নম্বরীকৃত। (ঙ) এর ওপর আবার নবগঠিত গুর্খা দলগুলি, বেঙ্গল বাহিনীর শেষ ব্যাটালিয়নের নম্বরের পরের নম্বরগুলি দ্বারা চিহ্নিত। যেমন নাসিরি ব্যাটালিয়ন নামে একটি গুর্খাদল বেঙ্গল বাহিনীর ৬৬নং ব্যাটালিয়ন রূপে চিহ্নিত ছিল। (চ) সবার ওপর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনী, যার অধিকাংশ ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহের ঝড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু কয়েকটা রাজভক্ত ব্যাটালিয়ন যার নম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রম (Seriality) ছিল না, যথা ২১ নম্বরের পরেই ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং, তারপরেই ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৯ ইত্যাদি নম্বরের ব্যাটালিয়ন। মাঝখানের নম্বরগুলি বিভিন্ন বিদ্রোহী ব্যাটালিয়নের নম্বর, যারা চিরকালের মত শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

বিদ্রোহের পরে নতুন ক'রে গঠিত হবার সময়েও ভারতীয় বাহিনীর নম্বরগত পরিচয়ের মধ্যে যেন একটা অরাজকতার রূপ দেখা যায়। অনেকগুলি ১নং, অনেকগুলি ২নং ইত্যাদি—নম্বরের একটা পর্যায়ক্রম ছিল না। নতুন করে সংস্কারের পরিকল্পনাতেও এই নম্বরগত অরাজকতাকে পরিচ্ছন্ন করা হলো না। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বাহিনীগুলি তাদের প্রাক্তন নম্বরের পরিচয় নিয়েই রয়ে গেল। গুর্খা সৈন্যদলও স্বতন্ত্রভাবে নম্বরীকৃত হলো। একমাত্র বিদ্রোহাবশিষ্ট খাপছাড়া বেঙ্গল বাহিনীর শূন্য স্থানগুলি নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন দিয়ে পূর্ণ করে আবার একটা পর্যায়ক্রম নম্বর দেওয়া হলো।

১৮৬১ সালে বেঙ্গল বাহিনীর নতুন নম্বরীকরণ চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ করা হয়। পাঞ্জাবের নবগঠিত সৈন্যদলগুলি ও বিদ্রোহাবশিষ্ট রাজভক্ত ব্যাটালিয়নগুলি উভয়কে মিলিয়ে নিয়ে পর্যায়ক্রমে নতুন নম্বর দেওয়া হয়। বেঙ্গল বাহিনীর নতুন নম্বরীকৃত ব্যাটালিয়নগুলি ও তাদের পুরাতন নম্বর পাশাপাশি উধৃত করা হলো—

(বেঙ্গল বাহিনীর নতুন রাজভক্ত বাহিনী, যারা বিদ্রোহে যোগদান করে নি)

নতুন নম্বর	পূর্বে যে নম্বর ছিল
১ নং পদাতিক	২১ নং
২ নং "	৩১ নং
৩ নং "	৩২ নং
৪ নং "	৩৩ নং
৫ নং "	৪২ নং
৬ নং "	৪৩ নং

৭ নং	,,	৪৭ নং
৮ নং	,,	৫৯ নং
৯ নং	,,	৬৩ নং
১০ নং	,,	৬৫ নং
১১ নং	,,	৭০ নং
১২ নং	,,	খেলাত-ই-খিলজাই রেজিমেণ্ট
১৩ নং	,,	শিখাবতী ব্যাটালিয়ন

১৪ নং (এরা হলো শিখ) ফিরোজপুর রেজিমেণ্ট
১৫ নং (এরা হলো শিখ) লুধিয়ানা রেজিমেণ্ট
১৬ নং লক্ষ্ণৌ রেজিমেণ্ট
১৭ নং কয়েকটি পুরবিয়া রেজিমেণ্টের অবশিষ্টাংশ
১৮ নং আলিপুর রেজিমেণ্ট (ক্যালকাটা মিলিশিয়া)

খেলাত-ই-খিলজাই রেজিমেণ্ট (নতুন ১২ নং) প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সমর্থিত আমীর শাহ সুজাকে সাহায্যের জন্য গঠন করা হয়েছিল। ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রাপ্ত শিখ ব্যাটালিয়নগুলি বিদ্রোহের পূর্বে শিখযুদ্ধ অবসানের পরেই গঠিত হয়েছিল। ১৬ নম্বরে চিহ্নিত সিপাহী দলটি লক্ষ্ণৌ শিবিরে রাজভক্ত সিপাহীর দল। ১৭ নম্বরটি বিভিন্ন বিদ্রোহী পুরবিয়া সিপাহীর ব্যাটালিয়নের কিছু কিছু অবিদ্রোহী ও রাজভক্ত সিপাহীদের নিয়ে তৈরী। ১৮ নম্বর প্রাপ্ত দলটি একটি পুরাতন দল, যারা বিদ্রোহের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিল।

নানাবিধ বেঙ্গল বাহিনীর (পদাতিক দলের) পরের নম্বরগুলি এইভাবে দেওয়া হয়:

(১৯ নং থেকে ৩২ নং পর্যন্ত)—১৮৫৭-৫৮ সালে পাঞ্জাবের দ্রুতগঠিত বাহিনীর ১৪টি রেজিমেণ্ট। পূর্বে পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নম্বরে চিহ্নিত ও যুক্ত ছিল।

৩৩ নং থেকে ৪০ নং পর্যন্ত—সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে 'লেভি' (Levy) প্রথায় যেসব 'স্থানীয়' সৈন্যদল তৈরী করা হয়েছিল।

৪১ নং—১নং গোয়ালিয়র কণ্টিনজেণ্ট।

৪২, ৪৩ ও ৪৪ নং—আসাম ও সিলেটের লাইট পদাতিক (Light Infantry)।

৪৫ নং (শিখ দল)—র‍্যাটরের শিখ ফৌজ (Rattray's Sikhs)। (১৮৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিশ ব্যাটালিয়ন হিসাবে তৈরী হয়েছিল)।

গুর্খা সৈন্যদলকে ভিন্নভাবে নম্বরীকৃত করা হয়। যথা :—

পুরাতন নাম		নতুন নম্বর
নাসিরি ব্যাটালিয়ন	...	১ নং গুর্খা
সিরমুর ব্যাটালিয়ন	...	২ নং গুর্খা
কুমায়ুন ব্যাটালিয়ন	...	৩ নং গুর্খা
অতিরিক্ত (Extra) গুর্খা ব্যাটালিয়ন	...	৪ নং গুর্খা
হাজারা ব্যাটালিয়ন	...	৫ নং গুর্খা

গুর্খাদের অন্যান্য সৈন্যদলগুলি পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে বেঙ্গল বাহিনীর বহু ভারতীয় সওয়ার দল লুপ্ত হয়। অবিদ্রোহী দলগুলিকে নিয়ে ১৮৬১ সালে বেঙ্গল বাহিনীর সওয়ার দল বা ক্যাভালরিকে নতুন ক'রে নম্বর দেওয়া হয় :

নতুন নম্বর	পুরাতন নম্বর
১ নং বেঙ্গল ক্যাভালরি	১ নং অরেগুলার
২ নং " "	২ নং "

৩ নং বেঙ্গল ক্যাভাল্‌রি		৩ নং অরেগুলার
৪ নং ”	”	৪ নং ”
৫ নং ”	”	৭ নং ”
৬ নং ”	”	৮ নং ”
৭ নং ”	”	১৭ নং ”
৮ নং ”	”	১৮ নং ”

এই নানাবিধ ও নতুন নম্বরীকৃত সওয়ার বাহিনীগুলি হলো পুরণো বাহিনীরই বিদ্রোহাবশিষ্ট অংশ। এর সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের জন্য মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্বে গঠিত সওয়ার দলগুলিকেও পর্যায়ক্রম নম্বর দিয়ে যুক্ত করা হয়। যথা :

নতুন নম্বর	প্রাক্তন পরিচয়
৯ নং বেঙ্গল ক্যাভল্‌রি	১নং হডসনের সওয়ার (Hodson's Horse)
১০ নং ” ক্যাভাল্‌রি	২ নং হডসনের সওয়ার
১১ নং ” ক্যাভল্‌রি	ওয়েলের সওয়ার (Wale's Horse)
১২ নং ” বেঙ্গল ক্যাভাল্‌রি	২ নং শিখ অরেগুলার ক্যাভাল্‌রি
১৩ নং ” ক্যাভাল্‌রি	৪ নং শিখ অরেগুলার ক্যাভাল্‌রি
১৪ নং “ ক্যাভাল্‌রি	মারের জাঠ সওয়ার (Murray's Jat Horse)
১৫ নং ” ক্যাভাল্‌রি	কিওরটনের মুলতানী (Cureton's Multani)
১৬ নং ” ক্যাভাল্‌রি	রোহিলখণ্ড সওয়ার
১৭ নং ” ক্যাভ্যাল্‌রি	রবার্টের সওয়ার (Robert's Horse)
১৮ নং ” ক্যাভাল্‌রি	২ নং মারাঠা সওয়ার
১৯ নং ” ক্যাভাল্‌রি	ফেনের সওয়ার (Fane's Horse)

(এই সওয়ার দল বস্তুতঃ বিদ্রোহের পরে চীন অভিযানের সময় গঠিত হয়)।

পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার (অরেগুলার) ফোর্স নামে যে বাহিনীর কথা বার বার উল্লেখ করা হচ্ছে, সেই বাহিনী স্বতন্ত্রভাবেই জঙ্গীলাটের পরিচালনার বাইরে অর্থাৎ পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পরিচালনায় থাকে। ১৮৬১ সালে পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্সের শক্তি ছিল—৫টি ক্যাভাল্‌রি বা সওয়ার রেজিমেণ্ট, ৪টি শিখ পদাতিক (জলন্ধর দোয়াবের 'স্থানীয়' ফৌজ) ব্যাটালিয়ান এবং পাঁচটি পাঞ্জাব পদাতিক ব্যাটালিয়ান।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর কাঠামে রদবদল হয় নি, কারণ পুরবিয়া সিপাহীর মত রাজদ্রোহের ছোঁয়াচ এদের গায়ে লাগে নি।

এছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে, সমরবিভাগের উদ্যোগে নয়, ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে আরও কয়েকটি সওয়ার এবং পদাতিক দল গঠিত হয়। বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা তাঁতিয়া টোপেকে খুঁজে বের করার জন্য সমগ্র মধ্যভারতে যে সন্ধানী-অভিযান হয়, তারই জন্য এই ফৌজগুলি গঠিত হয়—মধ্যভারত সওয়ার (Central India Horse), এরিনপুরা অরেগুলার ফোর্স, দেওলি অরেগুলার ফৌজ ইত্যাদি।

ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে এতাবৎকাল যুক্ত সমস্ত য়ুরোপীয় গোলন্দাজ ফৌজ ও এঞ্জিনিয়ার দলগুলিকে ভারতীয় বাহিনীভুক্ত না রেখে রাজকীয় (Royal) বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, দেশী গোলন্দাজ বাহিনী উঠিয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত করা হয়। এই নীতির শুধু এক ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম করা হয়—বিশুদ্ধ ইংরাজভক্ত পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স নামক বাহিনীতে

৪টি গোলন্দাজ দল (battery) থাকে। রাজভক্তির অনুগ্রহস্বরূপ হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্টের ৪টি গোলন্দাজ দল (battery) রাখা হয়।

ভারতীয় ফৌজের সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধানতঃ দু'টি অভিমতের খুবই দ্বন্দ্ব হয়। প্রথম হলো—রেগুলার প্রথা ও অরেগুলার প্রথার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে, এই নিয়ে। দ্বিতীয় হলো—তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা অথবা একত্র করা, এই নিয়ে।

প্রথম দিকে শুধু নতুন বেঙ্গল বাহিনীকে অরেগুলার প্রথায় গঠন করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তিনটি বাহিনীকে স্বতন্ত্র করেই রাখা হবে, কারণ ভবিষ্যতে যদি কখনো বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ দেখা দেয়, তবে এই স্বতন্ত্রতার জন্যই বিদ্রোহ সর্বব্যাপী হতে পারবে না। আশঙ্কিত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে তিনটি বাহিনীকে স্বতন্ত্র করার অভিমত অধিকাংশ সমরবিশেষজ্ঞের দ্বারা সমর্থিত হয়। বেঙ্গল বাহিনীর পুরবিয়া সিপাহীর বিদ্রোহের হাওয়া অপর দু'টি স্বতন্ত্র বোম্বাই ও মাদ্রাজ বাহিনীকে বিচলিত করতে পারেনি, সেই দৃষ্টান্ত থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর সদ্যলব্ধ এই অভিজ্ঞতাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

শ্বেত বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার পর যখন শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় ফৌজকে নতুন ক'রে গঠন করার কাজ চলছে, সে সময়ে আর একটা অদ্ভুত বিদ্রোহ হয়, এমন যে হবে সামরিক কর্তৃপক্ষ তা কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু এ বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতক পুরবিয়া ব্রাহ্মণ

আর রাজপুত সিপাহীর বিদ্রোহ নয়, এটি বিশুদ্ধ ব্রিটন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের বিদ্রোহ (White Mutiny)।

বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর সঙ্গে যে সব য়ুরোপীয় ব্যাটালিয়ন যুক্ত ছিল, এই সময় তাদের আর ভারতীয় বাহিনীতে না রেখে খাস ইংলণ্ডীয় বাহিনীতে বদলী ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়। বিদ্রোহের সময় দ্রুতগঠিত তিনটি য়ুরোপীয় লাইট ক্যাভাল্‌রি বা সওয়ার দলকে এইভাবে ইংলণ্ডীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে ১৯নং, ২০নং ও ২১নং হুজার্স (Husars) রূপে পরিণত করা হয়। য়ুরোপীয় সৈনিকেরা এই বদলী পছন্দ করেনি। তাদের প্রতিবাদ ক্রমে উত্তেজিত হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হয়। ঠিক কি কারণে য়ুরোপীয় সৈনিকেরা 'ভারতীয় সার্ভিস' ছেড়ে 'বিলাতী সার্ভিসে' বদলী হতে এত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, সেটা আজও দুর্বোধ্য রহস্য হয়েই রয়েছে। সামরিক বিবরণীতে লিখিত আছে, য়ুরোপীয় সৈনিকেরা দাবী করে যে এভাবে বদলী করা বেআইনী ব্যাপার, বদলী না ক'রে তাদের সোজাসুজি কর্মচ্যুত (discharge) করা হোক্, এবং খেসারত হিসাবে থোক টাকা দেওয়া হোক্। এই নাকি তাদের দাবী ছিল। কর্তৃপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, এতকাল কোম্পানীর অধীনে য়ুরোপীয় সৈনিকেরা যে সার্ভিস করেছে, সেটা বস্তুতঃ রাজার (Crown) সার্ভিসই ছিল, কেননা রাজার অনুমতি ও ইচ্ছানুসারেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায়, রাজ্যজয়, সমরাভিযান, শাসন ও আইন প্রবর্তন ক'রে এসেছে; সুতরাং কোম্পানীর য়ুরোপীয় সৈনিককে রাজবাহিনীতে বদলী করা বেআইনী ব্যাপার নয়।

যাই হোক্, বিশুদ্ধ গোরা সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে এবং নিয়তির এমনই লীলা যে গোরা বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে কালা

ভারতীয় ফৌজের সাহায্য নিতে হয়। গোরা বিদ্রোহের নেতার প্রাণদণ্ড হয়।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মত পরিবর্তন করেন, বদলীর ব্যাপারে জবরদস্তি না ক'রে স্বেচ্ছায় বদলী হবার অধিকার দেওয়া হয়। কিছু গোরা সৈনিক স্বেচ্ছায় বদলী গ্রহণ করে এবং হাজার হাজার গোরা সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে দেশে (বিলেতে) চলে যায়।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় অর্থাৎ গোরা সৈন্য রাখার নীতি পূর্ববৎ অটুট থাকে। শুধু প্রশ্ন উঠেছিল, ভারতে অবস্থিত গোরা সৈন্যকে 'স্থানীয়' (local) সৈন্য হিসাবে রাখা হবে অথবা রাজবাহিনীর (Crown Army) সৈন্য হিসাবে রাখা হবে? শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ভাবেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে, অথবা একটা স্বতন্ত্র 'স্থানীয়' বাহিনী হয়ে ভারতবর্ষে কোন গোরা দল থাকবে না। খাস রাজবাহিনীর য়ুরোপীয় সৈন্যই ভারতে সাময়িকভাবে সার্ভিস করার জন্য প্রেরিত হবে, এবং নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের সার্ভিসের পর তাদের আবার 'হোমে' (স্বদেশে) ফিরিয়ে নেওয়া হবে— অথবা সাম্রাজ্যের অন্যত্র প্রেরিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় ফৌজের আর একটা দল ইংলণ্ড থেকে এসে নির্দিষ্ট সাময়িক মেয়াদে ভারতে কাজ ক'রে যাবে।

দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গোরা ফৌজকেও স্থানীয় বাহিনী ক'রে রাখতে ভয় পেয়ে থাকেন। আশঙ্কা, স্থানীয় হয়ে থাকার ফলে যদি এই বিশুদ্ধ গোরাদের মনেও এক আধটু ভারতীয়তার ছোঁয়াচ লেগে যায়। দীর্ঘকাল কোন দেশে অবস্থান করলে সৈনিকের মনে সে দেশের প্রতি একটা মমত্ববোধ দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। য়ুরোপীয় ফৌজ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিদেশী মনোভাব নিয়েই থাকবে, নইলে

তাদের দ্বারা প্রয়োজনকালে যথোপযুক্ত নিষ্ঠুরতা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, নিষ্ঠুর না হতে পারলে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর পক্ষে সমর দক্ষতাও সম্ভবপর নয়। 'স্থানীয়' গোরা সৈন্যদল রাখবার প্রথা উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে প্রধানতঃ এই সকল যুক্তিই কাজ করেছিল।

রেজিমেণ্টে 'জাত-কোম্পানী'

বেঙ্গল বাহিনীকে পুনর্গঠন করার সময় আর একটা বড় অভিমতের দ্বন্দ্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠে—শ্রেণী রেজিমেণ্ট বনাম শ্রেণী কোম্পানী। প্রশ্নটা হলো—একটা রেজিমেণ্টের সমস্ত সৈনিক একই জাতির (race) লোক হবে—না, এক রেজিমেণ্টের অন্তর্গত কোম্পানীগুলি এক একটা জাতির লোক দিয়ে তৈরী করা হবে? পুরানো ভারতীয় ফৌজকে 'জাতি' হিসাবে তৈরী করা হয়নি, হিন্দু-মুসলমান, পুরবিয়া-পাঞ্জাবী, গা ঘেঁষা-ঘেঁষি ক'রে এক পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। কিন্তু এবার থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'শ্রেণী-কোম্পানী' গঠনের পরিকল্পনা করেন। একটা রেজিমেণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে একটা কোম্পানী হয়তো শুধু রাজপুতদের নিয়ে তৈরী, আর একটা কোম্পানীর সৈনিকেরা শুধু শিখ, অন্য আর একটা হয়তো শুধু পাঞ্জাবী মুসলমান। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোম্পানী মিলিয়ে একটা রেজিমেণ্ট। অর্থাৎ সমগ্রভাবে রেজিমেণ্টের রূপ হলো বহু-জাতীয়, কিন্তু এক একটা কোম্পানীর রূপ হলো এক-জাতীয়।

একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর মধ্যেই এই শ্রেণী-কোম্পানী অর্থাৎ জাত-কোম্পানী প্রথা আছে, এর উদ্ভাবক এবং প্রবর্তক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট। এর উদ্দেশ্য খুবই গর্হিত; ভারতীয় বাহিনীর সমর-

দক্ষতার বা অন্য কোন উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়নি। এই প্রথাটা যদি সত্যিই একটা উন্নত ফৌজী পদ্ধতি বলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, তবে নিজের দেশের বাহিনীতেও এই পদ্ধতি প্রবর্তন করতেন। একটি ব্রিটিশ রেজিমেণ্টের মধ্যে কতগুলি স্কচ কোম্পানী, কতগুলি আইরিশ কোম্পানী, কতগুলি ক্যাথলিক কোম্পানী অথবা প্রটেস্টাণ্ট কোম্পানী তৈরী করা হয় না। শুধু ভারতীয় বাহিনীর জন্যই এই বিদ্‌ঘুটে পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে যে গভীর অভিসন্ধি নিহিত রয়েছে, সেটা আমাদের চক্ষে খুবই খারাপ লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা নিশ্চয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার একটা বড় প্রমাণ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশের এই ফৌজী নীতির বিবর্তনের ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হলো।

শ্রেণী-কোম্পানী পদ্ধতি গৃহীত হবার ফলে, ভারতীয় বাহিনীর সব রেজিমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-কোম্পানীর দ্বারা গঠিত হয়। মাত্র কয়েকটি শিখ ও গুর্খা রেজিমেণ্টের সম্পর্কে এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়। কয়েকটা শিখ রেজিমেণ্টের সব কোম্পানীগুলিই শিখ-কোম্পানী এবং কয়েকটা গুর্খা রেজিমেণ্টের সব কোম্পানীগুলিই গুর্খা-কোম্পানী দিয়ে তৈরী করা হয়। এই ধরনের কয়েকটি শিখ ও গুর্খা 'এক-জাতীয়' রেজিমেণ্ট ছাড়া আর প্রত্যেকটি রেজিমেণ্টের রূপ 'বহু-জাতীয়' হয়ে যায়। ফৌজে পুরবিয়াদের প্রবেশ বস্তুতঃ নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কূটনীতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক থেকে একটা নতুন সমাজবিজ্ঞান প্রসূত হয়—সামরিক জাতি থিওরী। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ সমাজের লোক সৈন্য হবার যোগ্য এবং কোন্ কোন্ সমাজ অযোগ্য—তার একটি তালিকা তৈরী হয়। ভারতের বিভিন্ন সমাজের সামরিক যোগ্যতা নিরূপণ করার জন্য সত্য সত্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন

ভারতীয় শ্রেণী, সমাজ ও জাতের কুল-গোত্র বংশ বিচার করেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই অত্যদ্ভুত সমাজবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে হঠাৎ প্রমাণিত হয়ে গেল যে পুরবিয়া লোকেরা ঠিক সামরিক জাতি নয়। যে পুরবিয়া সিপাহী অর্থাৎ অযোধ্যা ও বিহারের ব্রাহ্মণ আর রাজপুত সিপাহীর সাহায্যে ব্রিটিশ মহারাষ্ট্র শক্তিকে, কাবুলের আফগান শক্তিকে, নেপাল শক্তিকে ও পাঞ্জাবের শিখ শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিল, হঠাৎ বোঝা গেল যে, শতরণজয়ী সেই পুরবিয়ারাই হলো প্রকৃত রণভীরু অসামরিক জাতি এবং আর সবাই সামরিক জাতি!

সাম্রাজ্যিক অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহ দমিত এবং ভারতীয় বাহিনী নতুন ক'রে সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক প্রসারের উদ্যোগ আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতের বাইরে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক সংগ্রামে ভারতীয় বাহিনীকে বহু অভিযানে প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে প্রধান অভিযানগুলির উল্লেখ করা হলো:

(১) ১৮৬০ সাল—পিকিন অভিযান। বিভিন্ন ভারতীয় বাহিনী থেকে কয়েকটি সৈন্যদল এবং পাঞ্জাবের নবগঠিত অরেগুলার রেজিমেণ্ট এই অভিযানে প্রেরিত হয়।

(২) ১৮৬০ সাল—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাসুদ উপজাতিকে দমনের জন্য ভারতীয় বাহিনীর অভিযান।

(৩) ১৮৬৪-৬৫ সাল—ভুটান অভিযান।

(৪) ১৮৬৭-৬৮ সাল—আবিসিনিয়া অভিযান। এই অভিযানে বোম্বাই সিপাহী বাহিনী সব চেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করে। বেঙ্গল বাহিনী থেকে একটি ব্রিগেডও প্রেরিত হয়।

(৫) ১৮৭৮ সাল—তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বেঙ্গল

বাহিনী, পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও বোম্বাই বাহিনী থেকেই অধিকাংশ সৈন্য প্রেরিত হয়।

(৬) ১৮৭৮ সাল—মাণ্টায় একটি সিপাহী ফৌজ প্রেরিত হয় —রুশ-তুর্কী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য।

(৭) ১৮৮২ সাল—একটি সুবৃহৎ সিপাহী ফৌজ মিশরে প্রেরিত হয়, যার সাহায্যে স্যার গার্নেট উলস্‌লি (Sir Garnet Wolsely) টেল-এল কোবের যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

(৮) ১৮৮৫ সাল—ভারতীয় বাহিনীর সুদান অভিযান।

(৯) ১৮৮৫ সাল—তৃতীয় বর্মাযুদ্ধ, ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী থেকে সিপাহী ফৌজ প্রেরিত হয়।

(১০) ১৮৮৫-১৮৯২ সাল—পামীর সীমান্তে (কৃষ্ণ পর্বত ও হুন্‌জা নাগার) দুইটি অভিযান। সিকিম অভিযান। উত্তর বর্মায় চিন ও কাচিন পাহাড়ে অভিযান।

(১১) ১৮৯৫ সাল—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাস্থদ দমনের অভিযান।

(১২) ১৮৯৫ সাল—চিত্রল অভিযান।

(১৩) ১৮৯৭ সাল—ওয়াজিরিস্থান অভিযান।

হিন্দুবর্জন ও পুনর্গঠন

ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যেই ভারতীয় বাহিনীর কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৭৮-৮০ সালে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি সুপারিশ করেন যে, তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর স্বতন্ত্রতা রহিত করা হোক্। এই তিনটি বিভিন্ন বাহিনীর অর্ডন্যান্স, সরবরাহ, যানবাহন

ইত্যাদি বিষয়গুলি যদিও একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতে থাকে, কিন্তু বাহিনী তিনটির সমন্বয় তখন ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়না।

আফগান ও বর্মা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ আবার আকস্মিকভাবে একটা নতুন শিক্ষালাভ করেন। তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ জাতের সিপাহীকে হঠাৎ নিতান্ত অপদার্থ বলে তাঁদের ধারণা হলো। আফগান ও বর্মার কঠিন যুদ্ধে তারা নাকি ভাল মত লড়াই করতে পারেনি। সুতরাং বাহিনী থেকে এই সব জাতের সৈন্য বিদায় ক'রে দিয়ে সামরিক জাতির লোক ভর্তি করার সিদ্ধান্ত হয়।

কারা এই বিশেষ বিশেষ জাত, যাদের হঠাৎ অপদার্থ ও রণভীরু বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করলেন? বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর হিন্দু, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বাহিনীর হিন্দু এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীর হিন্দু—যাদের সাহায্যে বিগত একশত বৎসরের অধিক কাল ব্রিটিশ ভারতের শত রণক্ষেত্রে জয়লাভ করেছিলেন।

তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী থেকে হিন্দুবর্জন ব্যাপকভাবেই সার্থক করা হয়। বহুসংখ্যক্ হিন্দু সিপাহী বিদায় ক'রে দিয়ে বেঙ্গল বাহিনীতে নতুন নতুন গুর্খা ব্যাটালিয়ন যুক্ত করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাহিনীকে বেলুচি, পাঠান ও পাঞ্জাবী সৈন্য দিয়ে নতুন ক'রে গড়া হয়। মাদ্রাজ বাহিনীতে স্থানীয় লোক বলতে গেলে কয়েকটি মোপ্‌লা কোম্পানী ও কুর্গী কোম্পানী মাত্র থাকে। মোপ্‌লারা হলো মুসলমান। কুর্গীদের মধ্যে আবার এক মাত্র পাহাড়ী কুর্গীদেরই ফৌজে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে মাদ্রাজ বাহিনী থেকে এই মোপ্‌লা ও কুর্গীদের বিদায় ক'রে

দেওয়া হয়। ভারতীয় বাহিনীকে পুনর্গঠনের এই অধ্যায়কে হিন্দু-বর্জনের অধ্যায় বলা যেতে পারে।

ব্যয়বহুল আফগান যুদ্ধের পর আর্থিক সামর্থ্য দুর্বল হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ১৮৮২ সালে ভারতীয় বাহিনীর কতগুলি পদাতিক ও সওয়ার দল ভেঙে দেন। ভারতে ব্রিটিশের ইতিহাসে এই প্রথম সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ১৮৮৫ সালে রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং মধ্য এশিয়ায় ঘাঁটি নেবার জন্য সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন হয়। যে সব পদাতিক ও সওয়ার দল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, দ্রুত নতুন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে নম্বরহীন শূন্য স্থানগুলি অধিকাংশ নতুন দলে পূর্ণ করা হয়।

১৮৮৬ সালে পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্সকে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনা থেকে বদলী ক'রে জঙ্গীলাটের পরিচালনাধীন করা হয়। এই সময়ই একটি রিজার্ভ ফৌজ গঠনের প্রথম ব্যবস্থা ও উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

১৮৯৫ সালেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর স্বতন্ত্রতা রহিত ক'রে দিয়ে এক জঙ্গীলাটের (Commander-in-Chief) অধীনে একটি বাহিনীতে পরিণত করা হয়। এতদিন পর্যন্ত তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনটি জঙ্গীলাটের অধীনে ছিল। যদিও 'ভারতে অবস্থিত বাহিনীর জঙ্গীলাট' "(Commander-in-Chief of the Army in India)" পদবীধারী একজন সর্বোচ্চ সমর নায়ক ১৭৪৮ সাল থেকেই নিযুক্ত হয়ে আসছিলেন, কিন্তু তিনটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী বাহিনীর তিনজন সমর নায়কও জঙ্গীলাট (Commander-in-Chief) পদবীধারী ছিলেন। এতদিন ভারতের সব বাহিনীর পরিচালনা কেন্দ্রগত করার পক্ষে একটা বাধা ছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থার

অভাব। রেলপথের বিস্তার না হওয়া পর্যন্ত তিনটি স্বতন্ত্র বাহিনীকে একতন্ত্রে আনবার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী ক'রে রাখা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে কিছু রেলপথের বিস্তার এবং নতুন ট্রাঙ্ক রোডের পত্তন ও প্রসার হওয়ায় তিনটি বাহিনীর পরিচালনা কেন্দ্রগত করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

বেঙ্গল বাহিনীকে দু'টি কম্যাণ্ডে ভাগ করা হয়। এছাড়া বোম্বাই বাহিনী একটি কম্যাণ্ড এবং মাদ্রাজ বাহিনী একটি কম্যাণ্ড—মোট চারটি কম্যাণ্ড। এক একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেলকে এক একটি কম্যাণ্ডের ভার দেওয়া হয়। সবার ওপর রইলেন একজন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বা জঙ্গীলাট।

পুনরায় বাহিনীর নতুন ক'রে নম্বর সাজাবার কথা ওঠে। সমস্ত বাহিনীকে একটি কেন্দ্রীভূত পরিচালনার অধীন করা সত্ত্বেও বাহিনীর বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানীর নম্বরগুলির মধ্যে ক্রমসূত্র ছিলনা। ১নং বেঙ্গল পদাতিক, ১নং বোম্বাই পদাতিক, ১নং মাদ্রাজ পদাতিক, ১নং গুর্খা, ১নং হায়দ্রাবাদ, ১নং পাঞ্জাব পদাতিক, ১নং শিখ, ১নং বর্মা পদাতিক, ১নং বেলুচি—এতগুলি ১নং কোন বাহিনীর মধ্যে নিতান্ত বিসদৃশ ও অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার। তাছাড়া সওয়ার বাহিনীর মধ্যেও প্রায় আরও ডজনখানেক ১নং ছড়িয়ে ছিল। ফৌজ পুনর্গঠিত হওয়া সত্ত্বেও নতুন নম্বরীকরণের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত থাকে। সাত বছর পরে ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড কিচেনারের সময়ে নম্বর সমস্যার সমাধান করা হয়।

একটি ফিল্ড সিগন্যাল অফিস

একজন স্যাপার যন্ত্রদ্বারা পাথর ফুটা করিতেছে

ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙ্গ দল

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের সাফল্য শুধু তারই সাহস আর রণদক্ষতার উপর নির্ভর করেনা। অতীতে যোদ্ধা সৈন্যদলের অনুগামী হিসাবে আর এক শ্রেণীর বাহিনী থাকতো, যারা নিজেরা লড়াই করতো না, কিন্তু লড়াইয়ের সাফল্য তাদের কর্মদক্ষতার ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতো। ফ্রন্টে লড়াই করতো যোদ্ধা সৈনিক (combatants), কিন্তু সমস্ত আনুষঙ্গিক আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে রাখতো এক দল অ-যোদ্ধা ফৌজ। বর্তমানেও সাপ্লাই (সরবরাহ), ট্রান্সপোর্ট (যানবাহন), মেডিক্যাল (চিকিৎসা), ভেটেরিনারী (মবেশী), এঞ্জিনিয়ার, অর্ডন্যান্স ও সিগন্যাল ইত্যাদি এক একটি বিভাগীয় দল প্রকৃত অর্থে অ-যোদ্ধা ফৌজ হলেও এর মধ্যে অধিকাংশ সৈনিক রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত দল। এই সব ব্যবস্থাপক ফৌজ যদি দক্ষতাহীন হয়, তবে ফ্রন্টের যোদ্ধা সৈনিকের দক্ষতাও ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাছাড়া, এই সব অ-যোদ্ধা সৈনিক শুধু ব্যবস্থাপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, এদেরও প্রতি পদে শৌর্য ও সাহসের পরীক্ষা দিতে হয়, তাই সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হতে হয়।

আধুনিক কালে সাধারণতঃ ফৌজী ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় বাহিনীর প্রয়োজন এবং ভারতীয় বাহিনীতেও এই ধরণের যেসব বাহিনী আছে, তাদের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

রয়্যাল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর

রয়্যাল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর (Royal Indian Army

Service Corps) : বাংলায় অনুবাদ করলে অর্থ হয়—ভারতের ফৌজী ব্যবস্থাপনার রাজকীয় সৈন্যদল। এই সৈন্যদলের কাজ হলো প্রধানতঃ দু'টি—সরবরাহ এবং যানবাহন ব্যবস্থা। ১৮১০ সালে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর জন্য আর্মি কমিশারিয়েট ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কাজ ছিল সরবরাহ। ১৮৮৩ সালে স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্র্যান্সপোর্ট বিভাগও স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে উভয় বিভাগ একসঙ্গে যুক্ত ক'রে একটি সর্বভারতীয় বিভাগে পরিণত করা হয়। পঞ্চম জর্জের রৌপ্য জয়ন্তীর সময় এই যুক্ত কমিশারিয়েট ট্র্যান্সপোর্ট দল 'রয়্যাল' আখ্যা লাভ করে এবং সেই থেকে ভারতীয় বাহিনীর বর্তমান 'রিয়াস' (R. I. A. S. C.) জন্মলাভ করে।

বর্তমান রিয়াসের ওপর দু'টি গুরুদায়িত্ব—সরবরাহ এবং যানবাহন ব্যবস্থা। সৈনিকের খাদ্য, সওয়ার ফৌজের ঘোড়ার খাদ্য, পেট্রল ইত্যাদি বস্তু সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সরবরাহের ভার রিয়াসের ওপর।

যানবাহনের ব্যাপারে বর্তমানে যন্ত্রচালিত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পূর্বে পশুচালিত যানবাহনই প্রধান অবলম্বন ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রিয়াসে যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। বস্তুতঃ ১৯২৮ সাল থেকেই যান্ত্রিক বাহনের ব্যবস্থা ভালভাবে হয়। রিয়াসের অফিসারেরা ব্রিটিশ, আর সকলেই ভারতীয়। ডিউক অফ্ কনট হলেন এই বাহিনীর প্রধান কর্ণেল (Colonel-in-Chief)।

মেডিক্যাল সার্ভিস

ভারতীয় ফৌজের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের চারটি উপবিভাগ আছে। এরা হলো প্রকৃত অযোদ্ধা ফৌজ।

(১) ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস (Indian Medical Service)।

(২) ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ (Indian Medical Department)।

(৩) ভারতীয় মিলিটারী নার্সিং সার্ভিস (Indian Military Nursing Service)।

(৪) ভারতীয় হাসপাতাল দল (Indian Hospital Corps)।

পূর্বে তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর তিনটি স্বতন্ত্র মেডিক্যাল সার্ভিস ছিল। বিজ্ঞ অর্ধ-বিজ্ঞ অথবা হাতুড়ে, যে ধরণের ইংরাজ চিকিৎসক সে সময়ে ভারতে আসতো, তাদেরই নিয়ে তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর মেডিক্যাল সার্ভিস গঠন করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে তিনটি স্বতন্ত্র সার্ভিসকে যুক্ত ক'রে একটি সর্বভারতীয় বিভাগে পরিণত ক'রে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস আখ্যা দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের একটা বৈশিষ্ট্য এই হলো যে, এটা একটি ফৌজী বিভাগ হলেও ইচ্ছা মত সিভিল বা অসামরিক বিভাগ থেকে চিকিৎসক আমদানী ক'রে নিয়োগ করা হয়। আবার অনেকে ফৌজী চিকিৎসক হিসাবেই কাজ আরম্ভ করে, পরে অথবা শান্তির সময়ে অসামরিক বিভাগে কাজ গ্রহণ ক'রে চলে যান। একমাত্র চিকিৎসক অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক এবং অসামরিক বিভাগের মধ্যে একটা আদান প্রদানের রীতি প্রচলিত রয়েছে।

বলতে গেলে ভারতীয় ফৌজের মধ্যে এই বিভাগটিতেই সর্বপ্রথম ভারতীয়করণ (Indianisation) হয়েছে। অল্পসংখ্যক কয়েকজন য়ুরোপীয় ছাড়া প্রত্যেক আই-এম-এস অফিসার ভারতীয়।

ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ—ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে কাজ করার জন্য কতগুলি ইংলণ্ডীয় ব্রিটিশ বাহিনীর দলও থাকে। যেমন গোরা বাহিনী, কিন্তু গোরা চিকিৎসক এদের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে আসে না। এদের শিবিরে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ

কাজ তদারক ও চিকিৎসার জন্য ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনদের নিয়োগ করা হয়। দেশীয় সৈনিকের সঙ্গে ভারতীয় সাব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন থাকে।

নার্সিং সার্ভিস—প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈনিকের জন্য নার্সিংয়ের কোন রীতি ছিল না। রেজিমেণ্টের অন্তর্গত একদল সৈনিকের ওপর রুগ্ন বা আহত ভারতীয় সৈনিকের শুশ্রূষার ভার ছিল। বস্তুতঃ এই সব রেজিমেণ্টীয় শুশ্রূষাকারীরা নার্সিং ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব ছাড়া আর সব কাজেই পোক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় ফৌজে একটি নার্সিং সার্ভিস চালু করা হয়। ভারতের হাসপাতালের অভিজ্ঞ মেয়ে নার্স এই সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে থাকে। এঁদের কাজ হলো মিলিটারী স্টেশন হাসপাতালে আর্দালি নার্সদের শুশ্রূষা-কার্য শিক্ষা দেওয়া এবং তদারক করা।

ভারতীয় হাসপাতাল দল—কেরাণী, স্টোর-কীপার, পুরুষ নার্স, অ্যাম্বুলেন্স, মেথর মুর্দাফরাশ, ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হাসপাতাল কর্মচারীর দল।

ভারতীয় ফৌজে পূর্বে হাসপাতাল ব্যবস্থা জঘন্য রকমের ছিল এবং আহতদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুবই বেশী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজের মেডিক্যাল সার্ভিসগুলি নিতান্ত অপদার্থ প্রমাণিত হয়। তারপর থেকে কতগুলি বিষয়ে পরিবর্তন এবং সংস্কার সাধন ক'রে দেশীয় ফৌজের চিকিৎসার সুবিধা কিছুটা উন্নত করা হয়েছে।

মেডিক্যাল সার্ভিসের লোকেরা অ-যোদ্ধা হলেও অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে তাদের সত্যিকারের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। আই-এম-এস-এর অনেক য়ুরোপীয় অফিসার এর জন্য 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পদক অর্জন করেছেন।

একজন ভারতীয় আই-এম-এস অফিসার ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে জার্মান আয়রন ক্রস* লাভ করেন। অফিসারের নাম সোম দত্ত। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকার সময় জনৈক আহত জার্মান কর্ণেলকে ইনি প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। জার্মান কর্ণেল তাঁর নিজের আয়রন ক্রসটি সোম দত্তকে তখনই উপহার দেন।

ভারতীয় ফৌজের 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস' কতগুলি কার্যের জন্য বিখ্যাত। পানীয় জল শোধনের জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বর্তমান লণ্ডন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রত্যেক আধুনিক সহরে সেই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আশঙ্কিত মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়ার প্রথা (mass inoculation) ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসই প্রবর্তিত করেন।

ইণ্ডিয়ান আর্মি ভেটেরিনারী কোর

(I. A. V. C.)

ইণ্ডিয়ান আর্মি ভেটেরিনারী কোর (Indian Army Veterinary Corps)—বাংলায় অনুবাদ করলে অর্থ হয়, ভারতীয় ফৌজের মবেশী দল।

যতদিন পর্যন্ত ঘোড়া নামক তুরঙ্গম জীবটি ফৌজের অন্যতম প্রধান বাহন হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত ফৌজের পশু-প্রজনন এবং পশু চিকিৎসার বিভাগটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। সওয়ার ফৌজের জন্য এবং কামান টানার জন্য লক্ষ লক্ষ ঘোড়ার প্রয়োজন

* ব্রিটিশ সৈনিকের কাছে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্' যেমন সম্মানজনক জার্মান সৈনিকের কাছে 'আয়রণ ক্রস্'ও ঠিক তেমনি।

ছিল। এবং ঘোড়ার খুরে লোহার নাল ঠোকার জন্য নিযুক্ত কামারের দলই ছিল ফৌজের প্রথম ভেটেরিনারী অফিসার।

১৭৯৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর জন্য তিন স্থানে পশু প্রজননের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থা ফলপ্রদ হয় না। ১৮০৮ সালে মুরক্রফট নামক এক ইংরাজ বিশেষজ্ঞ ভারতে এসে ইংলিশ ও আরবী ঘোড়া নিয়ে পুষাতে অশ্ব-প্রজনন ও পালনের কেন্দ্র স্থাপন করেন, কিন্তু এর ফলে ভাল জাতের ঘোড়া পাওয়া সম্ভব হলেও খরচ অত্যধিক হয়। এরপর তিনি মধ্য-এসিয়াতে রওনা হন, ভারতে তুরাণী জাতের ঘোড়া আমদানির জন্য। তিনি ভারতে আর ফিরে আসেননি। কেউ বলেন তিনি পামীরে অসুস্থ হয়ে মারা যান, কেউ বলেন বোখারায় নিহত হন। লাহোরে অবস্থানকালে তিনি যে গৃহে ছিলেন সেই গৃহটি আজও লাহোরের শালিমার উদ্যানে রয়েছে। মহারাজ রণজিৎ সিং এই গৃহের দরজায় একটি ফলকে 'পর্যটক' মুরক্রফটের নাম উৎকীর্ণ ক'রে গিয়েছেন। মুরক্রফট সত্যিই পর্যটক ছিলেন না। তিনি বস্তুতঃ ভারতের রিমাউণ্ট ও ভেটেরিনারী সার্ভিসের প্রথম ডিরেক্টর।

১৮২৬ সালে ভারতীয় ফৌজের জন্য একটি ভারতীয় মবেশী বিভাগ (Indian Veterinary Dept.) স্থাপন করা হয়। একটি সামরিক বিভাগরূপে আবির্ভূত হয়ে এই বিভাগটি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে অসামরিক বিভাগে পরিণত হয়। ফৌজের মবেশী কর্মচারীর দল নিজেরাই ওষুধ সরবরাহ ক'রে ঘোড়ার চিকিৎসা করতেন। ঘোড়া প্রতি দু'আনা ওষুধের দাম বাঁধা ছিল।

ভারতীয় ফৌজের ভেটেরিনারী বা মবেশী কর্মচারীর দল অ-যোদ্ধা হলেও একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ-কীর্তির জন্য এরা বিখ্যাত

হয়ে আছে। ১৮৫৭ সালে পারস্য অভিযানের সময় খুশাব নামক স্থানে বোম্বাইয়ের সওয়ার ফৌজ শত্রুপক্ষের ওপর চার্জ করে, জনৈক মবেশী কর্মচারীই প্রথম শত্রুর হাত থেকে পতাকা দখল করে নেয়।

১৮৬৮ সালে আবিসিনিয়ায় প্রেরিত ভারতীয় ফৌজ রণক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মবেশী হাসপাতাল (পশু হাসপাতাল) স্থাপন করে। ভারতীয় ফৌজ থেকে উদ্ভূত এই ফিল্ড হাসপাতাল প্রথাটি পরবর্তী কালে প্রত্যেক দেশের ফৌজে গৃহীত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজের রিমাউণ্ট বিভাগের একমাত্র কাজ ছিল ঘোড়া খরিদ করা। কারণ সে সময় সিল্লাদার প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্ট নিজের উদ্যোগে ঘোড়া যোগাড় করতো। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিল্লাদার প্রথা উঠে যাবার পর রিমাউণ্ট বিভাগের কাজেও নতুন পদ্ধতি দেখা দেয়। ভারতীয় ফৌজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পশু যোগাড় করা এবং প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে উপযুক্ত ভালজাতের ঘোড়া ও খচ্চর প্রজনন পালন ও সরবরাহ করা, এই বিভাগের কাজ।

১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভেটেরিনারী সার্ভিসের কাজ ছিল শুধু ভারতের গোরা ফৌজের ঘোড়ার চিকিৎসা করা, ভারতীয় ফৌজের ঘোড়ার চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, রেজিমেণ্টের লোকেরাই দেখাশোনা করতো।

কিন্তু তারপর থেকে ভারতীয় ফৌজের জন্য ইণ্ডিয়ান আর্মি ভেটেরিনারী কোর (Indian Army Veterinary Corps) নামে একটি ফৌজী পশু চিকিৎসক দল তৈরী হয়েছে। ভারতীয় ফৌজের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পশুর চিকিৎসা, পরিচর্যা ও ফিল্ড হাসপাতাল পরিচালনার ভার এই দলের ওপর।

ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ একটা বিষয় খুবই বেশী ক'রে প্রচার করেছেন যে, ভারতবর্ষে পশু প্রজননের কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, তাঁরাই ভারতে এসে এই পদ্ধতি প্রচলিত করেছেন।

কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হায়দার আলির 'অমৃত মহল' বিভাগটির নাম উল্লেখযোগ্য। অমৃত মহল কথাটির প্রকৃত অর্থ যদিও 'দুগ্ধ বিভাগ' কিন্তু বিভাগটি বস্তুতঃ একটি ভেটেরিনারী বিভাগ ছিল—উন্নত জাতের গরু-বলদ প্রজননের জন্য। হায়দার আলির ফৌজের বলদ-টানা কামানের দ্রুততার সঙ্গে ইংরাজ ফৌজের ঘোড়া-টানা কামান পাল্লা দিয়ে উঠতে পারতো না।

ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর (I. A. O. C.)

ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর (Indian Army Ordnance Corps)—বাঙলায় অর্থ করলে দাঁড়ায়, ভারতীয় ফৌজের অস্ত্র সরবরাহকারী দল। অর্ডন্যান্স কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো— বড় আগ্নেয়াস্ত্র।

পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে (১৭৯৬ সালে) তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে তিনটি অর্ডন্যান্স বিভাগ ছিল। ১৮৮৪ সালে তিনটিকে এক ক'রে ভারতীয় অর্ডন্যান্স বিভাগ স্থাপিত হয়। ১৯২২ সালে বিভাগটিকে ফৌজী রীতিতে গঠিত ক'রে ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর আখ্যা দেওয়া হয়।

বর্তমানে শুধু অস্ত্র সরবরাহ করাই এই দলের কাজ নয়। অস্ত্রশস্ত্র, মিলিটারী গাড়ী, উর্দি, বুট, বিস্ফোরক ইত্যাদি সামরিক সম্ভার যোগান দেবার ভার এই দলের ওপর।

সামরিক সম্ভার উৎপাদন করা অবশ্য এই দলের কাজ নয়।

কারখানা থেকে প্রস্তুত সামরিক সম্ভার পরীক্ষা করা, অর্ডার দেওয়া ইত্যাদি অবশ্য এদের কাজ। সেইজন্য অর্ডন্যান্স কোর দক্ষ টেকনিসিয়ান বা মিস্ত্রীদের দ্বারা গঠিত। ফিল্ডে অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করার দায়িত্বও এদের। সেইজন্য প্রত্যেক তোপখানা (arsenal) বা অস্ত্রের ডিপোর সঙ্গে একটি ক'রে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থাকে, অর্ডন্যান্স কোরের লোকেরাই এই কারখানায় মেরামতী কাজ ক'রে থাকে। একটা বড় ইঞ্জিন থেকে সুরু ক'রে দূরবীক্ষণ যন্ত্র পর্যন্ত সব কিছুর মেরামতের কাজ অর্ডন্যান্স কোরের লোকের দ্বারা চালিত হয়।

অর্ডন্যান্স কোরের অধিকাংশই ভারতীয়। এদের কাজে ফ্রণ্টের সৈনিকের মত রণোন্মত্তা থাকার কথা নয়। লাইনের বহু দূরে পেছনে শান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এদের কাজ করতে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা দিল্লীর বারুদখানা (magazine) আক্রমণ করে। বেঙ্গল বাহিনীর অর্ডন্যান্স বিভাগের লোকেরা মিস্ত্রী হয়েও বারুদখানা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু সিপাহীদের হাতে পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হলো তখন নিজেরাই বারুদখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র বারুদ-খানার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অর্ডন্যান্স বিভাগের লোকেরাও নিশ্চিহ্ন হয়, মাত্র তিন চারজন বেঁচে থাকে। ১৮৫৭ সালের এই ঘটনাকে একটি 'পোড়ামাটির' (scorched earth) দৃষ্টান্তরূপে ধরা যেতে পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র অর্ডন্যান্স কোর যে ব্যাজ পরিধান করে, ভারতীয় অর্ডন্যান্স কোরের লোকেরাও সেই ব্যাজ পরিধান করে। ব্যাজের প্রতিকৃতি হলো—একটি ঢালের ওপর তিনটি কামানের গোলা। তার ওপর 'মটো' লেখা—Sua Tez Torati; এর অর্থ

হলো—"প্রকৃতির কাছ থেকে বিজ্ঞান অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।" এই 'মটো' ক্রমওয়েলের প্রবর্তিত।

ভারতীয় ফৌজের প্রাচীন অর্ডন্যান্স বিভাগ ফৌজের বহু বিশিষ্ট অস্ত্র, উপকরণ ও সজ্জার আবিষ্কর্তা ও প্রবর্তক।

১৭৭৩ সালে ভারতীয় ফৌজে দেশী বাজনার টমটম ও নাকাড়া ঢাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। তার বদলে বিলাতী ড্রাম ও ফাইফ বাঁশী (fife) প্রচলিত হয়। ৩৫ বছর পরে বিউগল ও হুইসিল প্রচলিত হয়।

পদাতিক বাহিনীর হাবিলদারেরা ১৮০০ সাল থেকে সড়কি (pike) ধারণ করতো ;১৮৩১ সালে সড়কির বদলে ফ্যুজিল (fusil) বা পুরোনো ধরনের গাদা বন্দুক প্রচলিত হয়।

১৮৬৪ সাল থেকে সওয়ার ফৌজে পুরাতন ধরণের বন্দুকের ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে প্রসিদ্ধ 'ভিক্টোরিয়া কার্বাইন' (Victoria Carbie) নামে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলিত হয়।

১৮৬১-৭১ সালে পদাতিক বাহিনীর পুরাতন বন্দুক নিষিদ্ধ ক'রে বিখ্যাত এনফিল্ড রাইফেল (Enfield Rifle) প্রচলিত হয়। এই রাইফেলে টোটা ভরার সময় টোটার আচ্ছাদন দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হয়। এই রাইফেলের জন্যই 'চর্বিমাখা টোটা' কিংবদন্তীটি প্রচারিত হয়েছিল বলে বহু ব্রিটিশ অফিসার ধারণা করেন।

এনফিল্ড রাইফেল উঠে গিয়ে, ১৮৭১ সালে আসে স্লাইডার (Slider) রাইফেল । তারপর ১৮৯২ সালে বিখাত মার্টিনি-হেনরি (Martini-Henry) রাইফেল, তারপর ১৯০৫ সালে লী-মেটফোর্ড (Lee-Metford) রাইফেল।

১৮৬৪ সালে বল্লমের (lance) আকৃতি ও দৈর্ঘের পরিবর্তন

সাধিত হয়। দশ থেকে সাড়ে এগার ফুট দীর্ঘ সঙ্গীন-মুখ বল্লম প্রচলিত হয়।

১৮০১ সালে ঘোড়-গোলন্দাজ ফৌজের জন্য ছোট আকারের গ্যালপার কামান (galloper gun) প্রবর্তিত হয়।

১৭৮৭ সালে অর্ডন্যান্স বিভাগ ভারতীয় ফৌজের জন্য ছাউনী ফেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে আরম্ভ করে। মাত্র ব্রিটিশ অফিসার ও সার্জেন্টগণ ছাড়া আর কেউ তাঁবু পেত না। সিপাহীদের থাকার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল না।

ভারতীয় ফৌজের জন্য প্রথমে কালো রঙের চামড়ার সরঞ্জাম প্রচলিত ছিল। ১৮০৫ সালে সাদা বাফ্ (buff) রঙের চামড়ার সরঞ্জাম প্রচলিত হয় এবং ১৮৭৯ সাল থেকেই ব্রাউন রঙ প্রবর্তিত হয়।

পদাতিক বাহিনীর জন্য প্রথমে শুধু বিনামূল্যে লাল রঙের কোট দেওয়া হতো এবং অধোবাস সিপাহীরা নিজেরাই কিনে নিত। ১৮১৭ সালে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রথম সিপাহীদের অধোবাস হিসাবে ট্রাউজার প্রবর্তন করেন। ১৮০৯ সালে ৬ ইঞ্চি চওড়া কোমরবন্ধ প্রচলন করা হয়। ১৮৭৭ সালে ভারতীয় সিপাহীর পোষাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'পট্টি' প্রবর্তিত হয়।

সিপাহী ফৌজ প্রথমে পাগড়ী পরিধান করতো, তারপরেই য়ুরোপীয় স্টাইলের লম্বা টুপি (shako) প্রচলিত হয়। ১৮০৪-৪৪ সালে মাত্র গুর্খা ও গাড়োয়ালী ফৌজের জন্য কিলম্যার্নক টুপি প্রচলিত হয়। ব্যাপকভাবে 'খাকি' প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ সালে।

ভারতীয় ফৌজের জন্য অর্ডন্যান্স বিভাগ যেসব সামরিক উপকরণ সরবরাহ করতো, সেগুলি ভারতে উৎপন্ন হতো না, ইংলণ্ড থেকেই আসতো। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দেশীয় লোককে সম্পূর্ণভাবে

অস্ত্র রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এটা তাঁদের নিজস্ব সামরিক গুপ্ত বিষয় ছিল।

কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্যের প্রসার হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতে অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের আগেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অনেকগুলি গোলাবারুদ, কামান ও টোটা তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু, রাইফেল বন্দুক ইত্যাদি ছোট আকারের আগ্নেয়াস্ত্র বিলাত থেকেই আসতো।

বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে বহু অর্ডন্যান্স কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কাশীপুরের বন্দুক ও শেল (gun & shell), ইছাপুরের রাইফেল ও অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র, জব্বলপুরের মেশিনগান, সাজাহানপুরের সামরিক পরিচ্ছদ, কারকীর গোলাবারুদ, কানপুরের জিন ও বুট—এসব ভারতীয় শ্রমে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হচ্ছে।

সামরিক ব্যাপারে একটা সত্য কথা প্রবাদিত হয়ে আছে—'A nation fights with its factories'—কোন জাতি প্রধানতঃ তার কারখানার সাহায্যেই যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, অস্ত্রোৎপাদনের ব্যাপারে অর্ডন্যান্স বিভাগের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কতখানি।

মাস্টার জেনারেল অফ্ অর্ডন্যান্স (Master General of Ordnance) নামে জনৈক প্রধান অধ্যক্ষের পরিচালনায় সমগ্র অর্ডন্যান্স দলের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিস (M. E. S.)

ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ত বিভাগ (Public Works Dept.) মিলিটারি বোর্ডের অধীনে ছিল—এটা হলো ১৮শতকের অবস্থার কথা। ভারতীয়

এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদল (Indian Corps of Engineers) নামক ভারতীয় ফৌজেরই একটি অংশ দ্বারা এই বিভাগের কাজ নিষ্পন্ন হতো। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি অসামরিক বিষয়েও মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্ব পছন্দ করতে পারতেননা। ফলে ১৮৪১ সালে পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে অসামরিক বিভাগে পরিণত করা হয়। ফৌজের জন্য স্বতন্ত্র একটি এঞ্জিনিয়ার বিভাগ গঠনের প্রয়োজন নেই বলেই কর্তৃপক্ষ ধারণা করেন এবং ফৌজের জন্য যা কিছু পূর্ত কার্য অসামরিক পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের দ্বারাই করিয়ে নেওয়া হতো। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত শাসনের দায়িত্ব কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে বদলী হবার পর ভারতে অসামরিক পূর্ত কার্যের ব্যাপক প্রসার হতে থাকে।

ভারতীয় ফৌজী কর্তৃপক্ষও এবার পাল্টা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সামরিক পূর্তঘটিত বিষয়ে অসামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁরা অপছন্দ করেন। ১৮৮১ সালে ব্যারাক ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভৃতি ফৌজী পূর্ত তদারকের ভার ফৌজী কর্তৃপক্ষের ওপরেই ন্যস্ত হয় এবং সেই অনুসারে সামরিক পূর্ত বিভাগ (Military Works Dept.) গঠিত হয়। ১৮৯৯ সালে এই বিভাগটি সম্পূর্ণ ফৌজী পদ্ধতিতে গঠিত হয়।

১৯২৩ সালে আবার বিভাগটিকে নতুন ভাবে গঠন করা হয় এবং সেই সময় থেকেই মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের পত্তন হয়। সার্ভিসের তিনটি শাখা আছে—(১) অট্টালিকা ও সড়ক, (২) ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এবং (৩) স্টোর। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার স্টেশন, বরফের ফ্যাক্টরী, জল সরবরাহ, সড়ক পিটাই, কারখানা, এঞ্জিনিয়ার স্টোর, আসবাব ডিপো—ইত্যাদি ব্যাপারে এক একটি এঞ্জিনিয়ার ইউনিট নিযুক্ত থাকে।

মিলিটারি ফার্ম ডিপার্টমেণ্ট

মিলিটারি ফার্ম ডিপার্টমেণ্ট (Military Farm Dept.) অর্থ হলো সামরিক খামার বিভাগ। এই বিভাগটি ১৮৮১ সালে কমিশারিয়েটের একটি শাখা ছিল। ১৯১২ সালে স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়। ফৌজের ঘোড়া ইত্যাদি পশুর জন্য ঘাসের চাষ এবং সৈনিকদের জন্য দুধ, প্রধানতঃ এই দু'টি বস্তু উৎপাদনই বিভাগটির কাজ। কৃষি সম্বন্ধে নানারকম গবেষণার কাজও এই বিভাগের দ্বারা হয়ে থাকে।

ভারতীয় ফৌজের কেরাণী দল

ভারতীয় ফৌজের কেরাণী দল (Indian Army Corps of Clerks), ফিল্ডের যোদ্ধা সৈনিক ঠাট্টা ক'রে এদের 'টাইপ রাইটার সৈনিক' আখ্যা দিয়ে থাকে, যদিও কলমধারী কেরাণী ফৌজের সাহায্য ছাড়া রাইফেলধারী ফৌজের কোন অভিযান অগ্রসর হয় না। শান্তির সময় শিবিরের শান্ত অফিস ঘরে যেমন এদের প্রয়োজন, যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রেও এদের তেমনি প্রয়োজন। সেই কারণে সামরিক কেরাণী দলকেও ফৌজী পদ্ধতিতে গঠিত করা হয়ে থাকে।

অক্সিলিয়ারি ফৌজ

অক্সিলিয়ারি ফোর্স ইণ্ডিয়া (Auxliary Force India), বর্তমানে এই নামে ভারতীয় ফৌজের একটা উপবিভাগ আছে ; ১৮৮০ সালের পর ভারতের অসামরিক কাজে নিযুক্ত য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে ইণ্ডিয়ান ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হয় তা' থেকেই হলো বর্তমান বিরাট অক্সি-লিয়ারি বাহিনীর সূত্রপাত।

বিশেষ প্রয়োজনে এবং স্থানীয় প্রয়োজনে এক এক জায়গায় এই ধরণের স্বেচ্ছাসৈনিক দল গঠন করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইভাবে প্রথম গঠিত হয় মাদ্রাজ ভলান্টিয়ার গার্ড দল। এর তিন চার বছর পরে নানা স্থানে স্থানীয় প্রয়োজনে পদাতিক স্বেচ্ছাসৈনিক দল গঠিত হতে থাকে। ১৮৭৭ সালে প্রথমে স্বেচ্ছাসওয়ার ফৌজ গঠিত হয়। ১৮৭৯ সালে স্বেচ্ছাগোলন্দাজ দলও গঠিত হয়। ১৮৬৯ সাল থেকেই রেল কোম্পানীগুলি তাদের কর্মচারীদের ভেতর থেকে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ ক'রে এক একটি রেলওয়ে ভলান্টিয়ার ফৌজ তৈরী করতে থাকে।

খাস ফৌজ থেকে এক একজন অ্যাডজুট্যান্ট এনে এই সব ভলান্টিয়ার দল পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। ভলান্টিয়ার দলের অন্যান্য সকল অফিসার ও সাধারণ সৈনিক সকলেই বস্তুতঃ স্বেচ্ছাসৈনিক।

ভলান্টিয়ার দলের সামরিক দক্ষতা উন্নত স্তরের হওয়া সম্ভব ছিলনা। বস্তুতঃ এটা সখের সামরিকতাই ছিল। ভলান্টিয়ার সৈনিকেরা কিছু কিছু সামরিক ট্রেনিং অবশ্য গ্রহণ করতো, কিন্তু প্রধানতঃ তারা নিজের নিজের সিভিল বা অসামরিক চাকুরীতেই

ব্যস্ত থাকতো। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এইসব ভলাণ্টিয়ার দলের সামরিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়, যাতে খাস যোদ্ধা ফৌজের সহিত এরা সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

ভারতের য়ুরোপীয় সমাজ দাবী করে যে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে ভর্তি হওয়া এবং কাজ করা আবশ্যিক (compulsory) করা হোক্। এই দাবীর ফলে ১৯১৭ সালে ভারতীয় দেশরক্ষা ফৌজী আইন (Indian Defence Force Act) পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ইণ্ডিয়ান ভলাণ্টিয়ার নামে আখ্যাত স্বেচ্ছাসৈনিকের দলগুলি 'ভারতীয় দেশরক্ষা ফৌজ' (Indian Defence Force) আখ্যা ধারণ করে। ভারতে অবস্থিত ১৮ বছর থেকে ৪১ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভলাণ্টিয়ার ফৌজে যোগদান আবশ্যিক করা হয়। এছাড়া ভলাণ্টিয়ার ফৌজের বিশেষ কতগুলি ইউনিটে ভারতীয় লোক ভর্তি করারও অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯২০ সালে 'ভারতীয় দেশরক্ষা ফৌজ' নাম তুলে দিয়ে অক্সিলিয়ারি ফোর্স ইণ্ডিয়া (Auxiliary Force India) নাম দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসৈনিকের ইউনিটগুলিকে নতুন ক'রে নাম ও নম্বর দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসৈনিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট বিধান রচিত হয়। একটি ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে—স্বেচ্ছাসৈনিকের কর্মক্ষেত্র স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যেই থাকবে, বাইরে নয়।

দেখা যাচ্ছে যে, ডিফেন্স বা দেশরক্ষা এই অক্সিলিয়ারি দলেরও আদর্শ কিন্তু ব্যাপক অর্থে নয়। বলতে পারা যায় স্থানীয় দেশরক্ষা (local defence)। স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বুঝলেই স্থানীয় অক্সিলিয়ারি দলকে কাজে আহ্বান করতে পারেন। সারা বছরের মধ্যে কতগুলি দিন নির্দিষ্ট ক'রে স্বেচ্ছাসৈনিককে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাসৈনিকেরা দিন হিসাবে মাইনে পায় এবং বছর পূর্তি হলে একটা বোনাস।

অক্সিলিয়ারি ফোর্সের রূপ ও গঠনের পদ্ধতি থেকে কতগুলি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। ভারতের প্রত্যেক য়ুরোপীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে এইভাবে মোটামুটি সামরিক শিক্ষা দিয়ে রাখার উদ্দেশ্যকে বলা হয়েছে—স্থানীয় দেশরক্ষা। কিন্তু স্থানীয় দেশরক্ষার জন্য স্থানীয় লোক নিয়ে সখের ফৌজ গঠন করা হয়-নি কেন? শুধু য়ুরোপীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান কেন?

স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, এই অক্সিলিয়ারি ব্যবস্থা বস্তুতঃ ভারতের জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক অবিশ্বাসের জন্যই হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে কোনরকম রাজদ্রোহের সূচনা হলেই যাতে সেটা স্তব্ধ ক'রে দিতে পারা যায়। প্রয়োজন বুঝলে য়ুরোপীয় জনসমাজ যাতে ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সশস্ত্রভাবে দাঁড়াতে পারে তারই জন্যে এব্যবস্থা।

সুতরাং এক দিক দিয়ে বিচার করলে অক্সিলিয়ারি ফৌজ বস্তুতঃ ভারতের য়ুরোপীয় সমাজের আঞ্চলিক নিরাপত্তার অর্থাৎ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। অপর দিক বিচার করলে বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে অবস্থিত প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গকে গুণে ধর্মে একটি দখলদার সৈনিকে পরিণত ক'রে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে ভারতীয়দের নিয়েও একটা স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠন করা হয়—ভারতীয় আঞ্চলিক ফৌজ (Indian Territorial Force)। কিন্তু এর নীতি ও উদ্দেশ্য অক্সিলিয়ারি ফৌজের নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে আঞ্চলিক হলেও নীতির দিক দিয়ে টেরিটোরিয়াল ফোর্সের আদর্শ হলো দেশ রক্ষা।

অক্সিলিয়ারি বাহিনীর মধ্যে সওয়ার, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি সব রকম ইউনিট ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই সখের শ্বেতাঙ্গ ফৌজ কি পরিমাণ ছিল, তার তালিকা নিম্নে উধৃত হলো :

সওয়ার

(১) বিহার লাইট হর্স (Light Horse)
(২) ক্যালকাটা লাইট হর্স
(৩) সুর্মা ভ্যালি লাইট হর্স
(৪) আসাম ভ্যালি লাইট হর্স
(৫) ইউ. পি. (যুক্তপ্রদেশ) লাইট হর্স
(৬) নর্দার্ণ বেঙ্গল মাউণ্টেড রাইফেলস
(৭) পাঞ্জাব লাইট হর্স
(৮) সাদার্ণ প্রভিন্সেস (দক্ষিণ প্রদেশ) মাউণ্টেড রাইফেলস
(৯) ছোটনাগপুর রেজিমেণ্ট
(১০) বোম্বাই লাইট পেট্রল

গোলন্দাজ

(১) বেঙ্গল আর্টিলারী (Artillery)
(২) মাদ্রাজ ফিল্ড ব্যাটারি (Battery)
(৩) বোম্বাই ব্যাটারি
(৪) লক্ষ্ণৌ ফিল্ড ব্যাটারি
(৫) কারকী ফিল্ড ব্যাটারি
(৬) আগ্রা ফিল্ড ব্যাটারি

এঞ্জিনিয়ার

(১) ক্যালকাটা ফোর্ট্রেস কোম্পানী
(২) বোম্বাই ফোর্ট্রেস কোম্পানী

(৩) করাচী ফোর্ট্রেস কোম্পানী

সিগন্যাল

(১) মাদ্রাজ সিগন্যাল কোম্পানী

পদাতিক

(১) ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে রেজিমেণ্ট
(২) ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(৩) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে রেজিমেণ্ট
(৪) বোম্বাই বড়োদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে রেজিমেণ্ট
(৫) বেঙ্গল এণ্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(৬) নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(৭) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(৮) মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে রাইফেলস
(৯) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(১০) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন
(১১) মাদ্রাজ গার্ডস
(১২) নাগপুর রাইফেলস
(১৩) পাঞ্জাব রাইফেলস
(১৪) সিমলা রাইফেলস
(১৫) ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সী ব্যাটালিয়ন
(১৬) বাঙ্গালোর ব্যাটালিয়ন
(১৭) এলাহাবাদ রাইফেলস
(১৮) দেরাদুন কণ্টিনজেণ্ট
(১৯) বেরিলি কণ্টিনজেণ্ট
(২০) বোম্বাই ব্যাটালিয়ন
(২১) কানপুর রাইফেলস

(২২) নীলগিরি মালাবার ব্যাটালিয়ন
(২৩) সিন্ধ (সিন্ধু) রাইফেলস
(২৪) হায়দ্রাবাদ রাইফেলস
(২৫) ইস্টার্ণ বেঙ্গল কোম্পানী
(২৬) ইস্ট কোস্ট (coast) ব্যাটালিয়ন
(২৭) পুণা রাইফেলস
(২৮) কোলার গোল্ড ফিল্ড ব্যাটালিয়ন
(২৯) ক্যালকাটা স্কটিশ
(৩০) দিল্লী কন্টিনজেণ্ট
(৩১) কুর্গ ও মহীশূর কোম্পানী
(৩২) লক্ষ্ণৌ রাইফেলস
(৩৩) ইয়ারকউদ কোম্পানী
(৩৪) ভুসাওয়াল কোম্পানী

মেশিন গান

(১) করাচী কোম্পানী
(২) আগ্রা কোম্পানী
(৩) বাঙ্গালোর আর্মার্ড কার কোম্পানী

উল্লিখিত তালিকাকে একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, ইংরাজের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবার জন্য ব্রটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের সরকারী অর্থে বস্তুতঃ আর একটা কী বিপুল ও ব্যাপক 'প্রাইভেট' ফৌজ গঠন ক'রে রেখেছিলেন। ভারতের যে যে স্থানে ইংরাজেরা অধিক সংখ্যায় বাস করে, যেখানে ইংরাজের চা-বাগান আছে, শ্বেতাঙ্গের পারিবারিক স্বাস্থ্যনিবাস বা উপনিবেশ আছে, ইংরাজ মালিকের খনি আছে, যে যে বন্দরে ইংরাজ সদাগরের বড় বড় গুদাম ও অফিস আছে—এই ধরণের প্রত্যেকটি অঞ্চলের

দিকে লক্ষ্য রেখে অক্সিলিয়ারি দলগুলিকে গঠন করা হয়েছে।

অক্সিলিয়ারি দলগুলি শ্বেতাঙ্গদের একটা সাম্প্রদায়িক ফৌজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন দেশে একটা বিদেশী সমাজের পক্ষে এভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ফৌজী প্রথায় বসবাস করার অধিকার নেই।

দেশীয় রাজ্যের ফৌজ

দেশীয় রাজ্যগুলির ফৌজের ইতিহাস ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস থেকে কতগুলি বিষয়ে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র।

পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরাজেরা যেসময় ভারতে রাজ্য প্রসার করছিলেন, সে সময়ে স্বাধীন দেশীয় রাজশক্তিগুলির অনেকে ডাচ, ইতালীয় ও ফরাসী সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষতায় ফৌজ গঠন করিয়েছিলেন, যার দক্ষতা কোম্পানী বাহাদুরের ফৌজের সমকক্ষ ছিল। সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রের ছ বয়নে (De boigne), নিজাম হায়দ্রাবাদের রেমণ্ড (Raymond) রণজিৎ শিখ ফৌজের আভিতাবিল (Avitabile) ইত্যাদি ফিরিঙ্গী রণ-গুরুদের নাম ভারতের ফৌজী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

কিন্তু স্বাধীন অবস্থার অধ্যায় যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সব রাজ্যই দেশীয় করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং তার পর থেকে দেশীয় রাজ্যের ফৌজের সঙ্গে ইংরাজ ছাড়া আর কোন বিদেশীর সম্পর্ক রইল না। সব রাজ্যগুলি এক দিনে ইংরাজের অধীন হয়নি, কেউ আগে এবং কেউ পরে। সন্ধি ও সনদের দ্বারা ইংরাজের আশ্রিত ও রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বস্তুতঃ ব্রিটিশ ফৌজের অংশ হয়ে যায়। নামের দিক দিয়ে কোম্পানীর ফৌজ থেকে স্বতন্ত্র হলেও, কার্যতঃ এরা কোম্পানীর ফৌজই ছিল। যখনই ইংরাজ বাহাদুর আহ্বান করবেন, তখনই ইংরাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সার্ভিসে যোগদান করার জন্য প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য চুক্তিবদ্ধ ছিল।

ইংরাজ বাহাদুরের সেবায় উৎসর্গীকৃত দেশীয় রাজ্যের ফৌজ পোষণ করার সমস্ত ব্যয় দেশীয় রাজ্যকেই বহন করতে হতো। একটা বিচিত্র বিষয়, এর জন্য উল্টো ইংরাজ বাহাদুরের হাতেই প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হতো। তার কারণ, ব্রিটিশ অফিসারের দ্বারাই দেশীয় রাজ্যের ফৌজ পরিচালিত হতো। কোম্পানী বাহাদুর যেহেতু ব্রিটিশ অফিসার 'ধার' দিতেন, সেই হেতু ব্রিটিশ অফিসারের জন্য খরচ হিসাবে কোম্পানী দেশীয় রাজ্যের কাছে অর্থ আদায় করতেন; কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির রাজস্ব এমনই অবস্থায় ছিল যে, কোম্পানী বাহাদুরকে নগদ টাকা দেবার সামর্থ্য তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতো না। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের একটা জেলা বা কোন অঞ্চল ছেড়ে দিত। ব্রিটিশ অফিসার ধার দেবার বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ এই সকল জেলা বা রাজ্যাংশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতেন। হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেণ্ট (Hyderabad Contingent) নামে ব্রিটিশ পরিচালিত সেনা দলটির খরচ বাবদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজামের কাছ থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে বেরার অঞ্চল লাভ করেন।

দেশীয় রাজ্যগুলি চিরকাল ইংরাজ শক্তিকে সহায়তা করেছে। দু'দিন আগে যে রাজ্য ইংরাজের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছে, দু'দিন পরে সেই রাজ্য কোম্পানীর ফৌজের সহচর হিসাবে নিজের ফৌজ পাঠিয়ে প্রতিবেশী আর একটি স্বাধীন রাজ্যের সর্বনাশ করার অভিযানে সহযোগিতা করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য ইংরাজের পক্ষে ছিল। দু'একটি দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বিদ্রোহ ক'রে বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনায় যোগদান

করেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে দেশীয় রাজার কোন সম্পর্ক ছিলনা। দেশীয় রাজার ইংরাজানুগত্যকে উপেক্ষা ক'রে দু'একটি রাজ্যের ফৌজ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এর সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হ'ল গোয়ালিয়র ফৌজের বিদ্রোহ। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া নিজে ইংরাজের অনুগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফৌজ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

সে সময় গোয়ালিয়র ফৌজে অধিকাংশ সিপাহী ছিল পুরবিয়া অর্থাৎ পূর্ব ভারতের লোক, ব্রাহ্মণ আর রাজপুত। সেই কারণে গোয়ালিয়র ফৌজ বেশী রাজনীতি-সচেতন ছিল। বিদ্রোহ শান্ত হবার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে, দেশীয় রাজ্যের ফৌজে স্থানীয় লোক ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলের লোককে সৈনিক হিসাবে ভর্তি করা হবেনা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধারণা গোয়া-লিয়রের ফৌজে এত পুরবিয়া ছিল বলেই বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে এর পর থেকে প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের ফৌজ স্থানীয় লোক নিয়েই গঠিত হয়। শুধু একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়—কাশ্মীর। ইংরাজেরা নেপালের গুর্খাকে ফৌজে প্রথম ভর্তি করার অনেক আগে থেকেই কাশ্মীরের রাজা গুর্খাদের নিয়ে রাজ্যের ফৌজ গঠন করেছিলেন। কাশ্মীরের সম্পর্কে তার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় রাজাদের ইংরাজভক্তির বহর দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট খুবই খুশী হন এবং বস্তুতঃ তার পর থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিরূপে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নতুন নীতি গ্রহণ করেন।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দেশীয়

রাজ্যের কাছ থেকে কি দাম নেওয়া হবে এবং কি ভাবে নেওয়া হবে—সেই বিষয়টি বহু বিতর্কের সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে। কোনরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছতে না পৌছতে ১৮৮৫ সাল এসে পড়ে এবং এই বছরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সাম্রাজ্য প্রসারের লক্ষণ দেখে সতর্ক হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষের ওপর রুশিয়ার লক্ষ্য আছে, সে বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ হন এবং রুশ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য ব্যাপক সামরিক আয়োজন আরম্ভ হয়।

এই সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয় নিজাম বাহাদুর নিজের থেকেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলিও একে একে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা জানাতে থাকে। পরম প্রীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সময় দেশীয় রাজ্যের কাছে একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। পরিকল্পনার বক্তব্য হলো—আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্য চাই না। অর্থের বিনিময়ে বরং আপনারা আপনাদের ফৌজের একটি অংশকে 'সাম্রাজ্য সেবার ফৌজ' ('Imperial Service Troop') হিসাবে বিশেষভাবে ভিন্ন ক'রে রাখুন এবং উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে তুলুন, যাতে এই ফৌজ ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সমান সহযোগী হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যরক্ষার যুদ্ধে লড়তে পারে।

দেশীয় রাজ্যগুলি খুশী হয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় সম্মত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের ফৌজের একটি অংশ সাম্রাজ্য সেবার ফৌজ অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ আখ্যা লাভ করে। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের' অংশগুলিকে নিয়ে ভারতব্যাপী ফৌজী সংস্থা রচিত

হয়, যেটা সাধারণ ভারতীয় ফৌজ থেকে স্বতন্ত্র। ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের জন্য ভিন্নভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হয়। জনৈক ইন্সপেক্টর জেনারেল আখ্যাপ্রাপ্ত পরিচালকের দ্বারা ভিন্ন দপ্তরের সাহায্যে দেশীয় রাজ্যের এই ফৌজগুলিকে শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা হতে থাকে। দেশীয় রাজ্যগুলির ফৌজগুলিকে কয়েকটি সার্কেল হিসাবে ভাগ করা হয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলের ওপর সব সার্কেলের তদারকের ভার এবং দায়িত্ব থাকে।

প্রতি দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ নামে নির্দিষ্ট ফৌজ ছাড়া, আর একটি সাধারণ ফৌজও থাকে। এই সাধারণ ফৌজগুলিই বস্তুতঃ দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব ফৌজ, পুরাতন প্রথায় গঠিত। ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হয় যে, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ পোষণ করার খরচ যোগাতে গিয়ে দেশীয় রাজারা তাদের দীন হীন দরবারী ফৌজকেও আরও হ্রাস এবং আরও দীনহীন করতে বাধ্য হন। এইভাবে দেশীয় রাজ্যের ফৌজ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা বাকী ছিল, তা'ও সম্পূর্ণ হয়। দেশীয় রাজ্যের উচ্চাশক্ষিত ফৌজকে রূপে, গুণে ও প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর একটি শাখায় পরিণত করা হয়। আর দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব ফৌজ বস্তুতঃ একটা গার্ড বাহিনীতে পরিণত হয়। ১৮৮৯ সালের মধ্যেই বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের ফৌজের মধ্যে সওয়ার, পদাতিক, এঞ্জিনিয়ার ও ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। অত্যদ্ভুত উট-সওয়ার বাহিনীও ইউনিট হিসাবে পরিণত হয়।

দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজে বৈশিষ্ট্য থাকে—অফিসারেরা সকলেই দেশীয়। শুধু ট্রেনিং দেবার জন্য ভারতীয়

ফৌজ থেকে অফিসার ধার দেওয়া হতো। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব-ক্ষমতা দেশীয় রাজার নয়, এবিষয়ে 'ব্রিটিশ ফৌজের সেনানায়ক' (Commander of the British Forces in the Field) হলেন পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তা।

ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের নামগুলির মধ্যে কিছুটা ভারতীয়ত্ব রাখা হয়। যথা, বিকানীরের গঙ্গা রিসালা অর্থাৎ গঙ্গা ক্যাভাল্‌রি, উদয়পুরের সূর্য রেজিমেণ্ট, কাপুরতলার জগৎ জিৎ ব্যাটালিয়ন ইত্যাদি।

দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের ব্রিটিশ সেবার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে।

হুন্‌জা নাগার অভিযান (১৮৯১) এবং চিত্রল অভিযান (১৮৯৫)— কাশ্মীর রাজ্যের ফৌজ এই দু'টি অভিযানে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। কাশ্মীর-রুশ সীমান্তের অধিবাসী হুনজাদের বিদ্রোহ পরাভূত হয় এবং চিত্রল দুর্গও অধিকৃত হয়।

১৮৯৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশের দীর্ঘ সংঘর্ষ। এই অভিযানে গোয়ালিয়র, জয়পুর, ঝিন্দ, কাশ্মীর, মালেরকোটলা, নাভা, পটিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের ফৌজ ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতা করে।

১৯০১ সালে চীনের বক্সার বিদ্রোহের সময় চীনের বিরুদ্ধে প্রেরিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সহযোগিতা করার জন্য আলোয়ার, বিকানীর, যোধপুর, মালেরকোটলা ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যের ফৌজ প্রেরিত হয়। আন্তর্জাতিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন জার্মান ফিল্ড মার্শাল ফন ভাল্‌ডের্‌সি (Von Waldersee)। জার্মান সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধ করার বোধ হয় এই প্রথম

ও শেষ দৃষ্টান্ত। বিকানীরের মহারাজা এবং যোধপুরের মহারাজা উভয়েই নিজ নিজ ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের সঙ্গে রণক্ষেত্রে সৈন্যাপত্য করেন।

১৯০২ সালে আফ্রিকায় সোমালিল্যাণ্ডে ভারতীয় ফৌজ প্রেরিত হয়। এই অভিযানে বিকানীরের মহারাজা তাঁর উট-সওয়ার বাহিনীকে ভারতীয় ফৌজের সহযোগী হিসাবে প্রেরণ করেন। সোমালিল্যাণ্ডের মরু-অঞ্চলে বিকানীরের উষ্ট্রারোহী রাঠোর সওয়ার অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

এর পর ১৯১৪ সাল—প্রথম মহাযুদ্ধ। এই সময় দেশীয় রাজ্যের সমগ্র ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজের বিভিন্ন ইউনিটের সংখ্যা ছিল :—

ইঞ্জিনিয়ার ফৌজ—৪টি কোম্পানী, মাউণ্টেন ব্যাটারি—২টি, ঘোড় সওয়ার—১৫টি রেজিমেণ্ট, উট-সওয়ার—৩টি কোর, পদাতিক—১৩টি ব্যাটালিয়ন, ট্রান্সপোর্ট ফৌজ—৭টি কোর। মোট জনবল ছিল ২২ হাজার, এর মধ্যে ১৮ হাজার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারতের বাইরে প্রেরিত হয়। সমস্ত ব্যয়ভার দেশীয় রাজারাই আহ্লাদের সঙ্গে বহন করেন। পুরাপুরি যুদ্ধের চারটি বছর রণক্ষেত্রেই পার ক'রে দিয়ে দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ দেশে ফিরে আসে।

বিকানীরের মহারাজা স্যার গঙ্গা সিং ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকেই সুয়েজ খাল রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি ইম্পিরিয়াল সার্ভিস সওয়ার ব্রিগেড পরিচালনা করেন। এই ব্রিগেডে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, পাটিয়ালা ইত্যাদির ফৌজ থেকে বাছাই ঘোড় সওয়ার এবং বিকানীরের উট-সওয়ার ছিল।

যোধপুরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিং যোধপুর ও আলোয়ার ল্যান্সার দলের কম্যাণ্ড গ্রহণ ক'রে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত

থাকেন। এই বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ট্রান্সপোর্ট ফৌজ এবং স্যাপার ফৌজও কাজ করে।

আলোয়ার, গোয়ালিয়র ও পটিয়ালার ফৌজ গ্যালিপোলির যুদ্ধে উপস্থিত থাকে এবং বহু হতাহত হয়। প্যালেস্টাইনের সুরক্ষিত হাইফা সহর একমাত্র যোধপুর ল্যান্সারের দ্বারা অধিকৃত হয়। আর কোন সুরক্ষিত সহর আজ পর্যন্ত মাত্র ক্যাভালরি চার্জ দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, এরকম ঘটনা শোনা যায় না। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের স্যাপার দল এবং ট্রান্সপোর্ট ফৌজ পূর্ব আফ্রিকা এবং মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করলেও, ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ভালভাবে সংহতি রক্ষা ক'রে কাজ করতে পারেনি। যুদ্ধের পর দেশীয় রাজাদের একটি কমিটি এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এবিষয়ে আলোচনার পর একটা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ' কথাটা উঠিয়ে দিয়ে সাধারণভাবে 'ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ফৌজ' (Indian State Forces) নাম করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, দেশীয় রাজ্যের ফৌজের প্রত্যেকটি ইউনিটকে ট্রেনিং ও অস্ত্র সজ্জায় উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে সাহায্য চাইলে সাধ্যে যতটা সম্ভব হবে দেশীয় রাজ্যগুলি ফৌজের ততগুলি ইউনিট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে নিযুক্ত করবেন। পূর্বে প্রথা ছিল, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌজ নাম দিয়ে দেশীয় রাজ্যের ফৌজের একটা অংশকে সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখা। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর ব্যবস্থাটা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো, সাম্রাজ্যিক বাহিনীরূপে ফৌজের কোন অংশকে নির্দিষ্ট ক'রে

রাখা হবে না। প্রয়োজনকালে অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের সময় যতটা সম্ভব বা সাধ্য হবে, দেশীয় রাজারা ততটা ফৌজ ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য ছেড়ে দেবেন এই নীতি গৃহীত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪ সাল) দেশীয় রাজ্য ফৌজের জনবল যা ছিল ধীরে ধীরে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বি-গুণের চেয়েও বেশী হয়; অর্থাৎ ৫০ হাজার। মোট ৪৯টা দেশীয় রাজ্যের ফৌজ নতুন পরিকল্পনা অনুসারে চলতে থাকে। সব দেশীয় রাজ্যের ফৌজের জনবল সমান নয়, কারও জনবল এক ডিভিসন কারও হয়তো একটি প্লেটুন বা পল্টন মাত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশীয় রাজ্য ফৌজের ইউনিট সমূহের মোট হিসাব হলো :—

এঞ্জিনিয়ার	৩	কোম্পানী
ঘোড়-গোলন্দাজ	২	ব্যাটারি
মাউন্টেন ব্যাটারি	৩	ব্যাটারি
উট-ব্যাটারি	১	ব্যাটারি
ক্যাভালরি বা সওয়ার	১৬	রেজিমেণ্ট
পদাতিক	৪৬	ব্যাটালিয়ন
ট্রান্সপোর্ট	২২	ট্রুপ

দেশীয় রাজ্যে ফৌজগুলিকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন সামরিক পরামর্শদাতা (Military Adviser) নিয়োগ করেন। সামরিক পরামর্শদাতাদের সবার ওপরে আছেন একজন 'প্রধান সামরিক পরামর্শদাতা' (Military Adviser-in-Chief)। ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের অধীন নন। রাজনৈতিক বিভাগ বা পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট

নামক গবর্ণর-জেনারেলের বিশেষ বিভাগীয় নীতি ও নির্দেশের সঙ্গেই এই প্রধান সামরিক পরামর্শদাতার বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক। সকলেই জানেন রাজনৈতিক বিভাগটির ওপর ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদেরও কোন হাত ছিল না। সুতরাং ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন বিধান প্রবর্তিত হবার পরেও দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বিশুদ্ধভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ কূটনীতি অনুসারে গঠিত হয়ে এসেছে। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক সৈন্য রাখবার অধিকার আছে কাশ্মীরের, ১০ হাজার সৈন্য। তারপর হায়দ্রাবাদ, ৮ হাজার সৈন্য। তারপর গোয়ালিয়র, ৭ হাজার সৈন্য। এরপর অন্যান্য দেশীয় রাজ্য।

ভারতীয় আর্টিলারি বা গোলন্দাজ ফৌজ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংরাজের ভারতীয় ফৌজে গোলন্দাজ দল রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীর গোলন্দাজ দল যোগদান করার ফলে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন। ১৮৫৭ সালের পর ভারতীয় ফৌজকে নতুন ক'রে গঠন করার সময় ভারতীয়দের আর গোলন্দাজ দল হিসাবে স্থান না দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়। মাত্র বোম্বাই বাহিনীর দু'টি ভারতীয় গোলন্দাজ কোম্পানী এবং পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের চারটি ভারতীয় ব্যাটারি —এ ছাড়া আর কোন ভারতীয় গোলন্দাজ দল রাখা হলো না। উল্লিখিত ছয়টি গোলন্দাজ দল বেশ ইংরাজভক্ত ছিল। এই ছয়টি গোলন্দাজ দল নিয়েই 'ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেন আর্টিলারি'র (Indian Mountain Artillery) সূত্রপাত হয়।

(ক) ১নং কোহাট গোলন্দাজ ব্যাটারি (1st Kohat Mountain Battery) : শেষ স্বাধীন শিখ নরপতি রাজা দলীপ সিংয়ের গোলন্দাজ দল থেকে লোক নিয়ে গঠন করা হয়। শিখ রাজত্বের অবসানের পর পাঞ্জাবে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজা দলীপ সিংয়ের গোলন্দাজ বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ তাদেরই নিয়ে নতুন দল তৈরী করে। সিপাহী বিদ্রোহ দমনে, সিপাহীদের দখল থেকে মূলতান অধিকারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে এবং আফগান যুদ্ধে (১৮৭৮-৮০) এই ব্যাটারি ইংরাজ ফৌজের সঙ্গে থেকে কাজ করে।

(খ) ২নং ডেরাজাত গোলন্দাজ ব্যাটারি (2nd Derajat Mountain Battery): ভেঙ্গে দেওয়া স্বাধীন শিখ ঘোড়সওয়ার গোলন্দাজ দলের লোক নিয়ে ১৮৪৯ সালে ডেরা গাজি খাঁতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাটারি গঠন করেন। ১৮৬০ সালে সীমান্তের মাসুদ উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে এবং তার পূর্বে অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহী সিপাহী ফৌজের বিরুদ্ধে এই ব্যাটারি ইংরাজের সহায় থেকে লড়াই করে।

(গ) ৩নং পেশোয়ার গোলন্দাজ ব্যাটারি (3rd Peshawar Mountain Battery): ১৮৫৩ সালে পেশোয়ারে গঠিত হয়। সীমান্ত অঞ্চলের বহু সংঘর্ষে এই গোলন্দাজ দল যোগদান করে। ১৮৭১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে একেবারে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এসে লুসাইদের বিরুদ্ধে অভিযানে এই দল কাজ করে। চট্টগ্রামের সংলগ্ন পার্বত্য ও অরণ্যাবৃত অঞ্চলে এই দল কামান বহন করবার জন্য হাতির সাহায্য নেয়।

(ঘ) ৪নং হাজারা গোলন্দাজ দল (4th Hazar Mountain Battery): ১৮৫১ সালে হাজারাতে গঠিত হয়। ১৮৭৮ সালের পর থেকে আফগান যুদ্ধে এই দল কাজ করে।

(ঙ) ৫নং বোম্বাই গোলন্দাজ দল (5th Bombay Mountain Battery): এই দলটি হলো প্রাচীনতম ভারতীয় গোলন্দাজ দল। ১৮২৭ সালে বোম্বাইয়ে এই দল গঠিত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজের বাহিনীর সঙ্গে থেকে এই দল মুলতান আক্রমণ করে। ১৮৬৮ সালে এই দল আবিসিনিয়ায় গিয়ে যুদ্ধ করে। ভারতের বাইরে এই প্রথম ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কাজ করার প্রকৃত উদাহরণ বলে ধরা হয়, যদিও

১৮০১ সালে মিশরে ভাইসরয়ের বডি-গার্ড দল গোলন্দাজ ফৌজে কিছু কাজ করেছিল।

(চ) ৬নং জেকবের গোলন্দাজ দল (6th Jacob's Mountain Battery): ১৮৪৩ সালে বোম্বাইয়ে এই দল গঠিত হয়। জেকবের রাইফেল ফৌজ (Jacob's Rifles) নামে পরিচিত ফৌজের পদাতিক বাহিনীর সৈন্যদের একটি দল জেকোবাবাদে তোপচালনার কাজ করতো। ১৮৭৫ সালে উক্ত ষষ্ঠ গোলন্দাজ দল জেকোবাবাদে এসে এই কাজের ভার নেয়।

ভারতীয় গোলন্দাজ দলগুলি প্রথম অবস্থায় হাল্‌কা কামানধারী ফিল্ড ব্যাটারি ('Light' বা Battery) হিসাবে গঠিত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে সব দলগুলিকে 'মাউণ্টেন' প্রথায় গঠিত করা হয়। অর্থাৎ গোলন্দাজেরা আর নিজেরাই কামান বহন করতেননা। ঘোড়া খচ্চর, হাতি অথবা কুলিদের পিঠে চড়িয়ে কামান বহনের ব্যবস্থা হয়।

এর পর, ১৮৮৬ সালে ভারতীয় গোলন্দাজ ফৌজের দল বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নোক্ত দু'টি নতুন ব্যাটারির এই সময় পত্তন হয় এবং দু'টি দলই বর্মা যুদ্ধে প্রেরিত হয়।

(ছ) ৭নং বেঙ্গল গোলন্দাজ দল (7th Bengal Mountain Battery): রাওয়ালপিণ্ডিতে এই দল গঠিত হয়।

(জ) ৮নং লাহোর গোলন্দাজ দল (8th Lahore Mountain Battery): পাঞ্জাবের লাহোরে এই দল গঠিত হয়।

পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও কতগুলি ভারতীয় গোলন্দাজ দল গঠিত হয়।

(ঝ) ৯নং (মুরি) গোলন্দাজ দল [9th (Muriee) Mountain Battery]: ১৮৯৮-৯৯ সালে আবোটাবাদে গঠিত হয়।

(ঞ) ১০নং (আবোটাবাদ) গোলন্দাজ দল [10th Abbotabad Mountain Battery]: ১৯০০-০১ সালে আবোটাবাদে গঠিত হয়।

(ট) ১১নং (দেরাদুন) ব্যাটারি: দেরাদুনে ১৯০৭ সালে গঠিত।

(ঠ) ১২নং (পুঞ্চ) ব্যাটারি: দেরাদুনে ১৯০৭ সালে গঠিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেকগুলি নতুন ভারতীয় গোলন্দাজ দল তৈরী হয়। কিন্তু সবই অস্থায়ী রিজার্ভ হিসাবে। যুদ্ধ শান্তির পর ১৯২১ সালে বেশীর ভাগ রিজার্ভ দলকে ভেঙে দেওয়া হয় এবং কয়েকটি দলকে নাম ও নম্বর দিয়ে স্থায়ীভাবে রাখা হয়, যথা:—

(১৩) দারদোনি ব্যাটারি,
(১৪) রাজপুতানা ব্যাটারি,
(১৫) ঝেলম ব্যাটারি,
(১৬) ঝোব ব্যাটারি,
(১৭) রাওয়ালপিণ্ডি ব্যাটারি,
(১৮) সোহান ব্যাটারি,
(১৯) মেমিয়ো ব্যাটারি,
(২০) আম্বালা ব্যাটারি,
(২১) নওশেরা ব্যাটারি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এবং যুদ্ধ চল্‌তে থাকা পর্যন্ত সব গোলন্দাজ দলগুলিকেই 'মাউণ্টেন' ব্যাটারি রূপে গঠন করা হয়। নম্বর ছিল ২১ থেকে আরম্ভ। অর্থাৎ প্রথম কোহাট

* বর্তমানে এই ২১টি ব্যাটারির নম্বর হলো যথাক্রমে ১০১ নং থেকে আরম্ভ ক'রে ১২১ নং। কোহাট হলো ১০১ নং, এবং পর পর এসে নওশেরা হলো ১২১ নং।

ব্যাটারির নম্বর এই সময় হয় ২১ নং মাউণ্টেন ব্যাটারি। পর পর ব্যাটারিগুলির নামও ২১ ২২, ২৩, ২৪ ইত্যাদি হয়। রিজার্ভ দল নিয়ে মহাযুদ্ধের সময় মোট ২৭টি গোলন্দাজ দল ছিল। ১৯২১ সালে সব দলের নম্বর পাল্টে যায়। অর্থাৎ ১নং কোহাট ব্যাটারির নম্বর করা হয় ১০১, এবং পর পর নম্বরানুক্রম ক'রে শেষ ২১ নং নওশেরা ব্যাটারির নম্বর হয় ১২১। প্রথম মহাযুদ্ধের ভারতীয় গোলন্দাজ দলের কৃতিত্বের কারণে প্রথম কোহাট ব্যাটারিকে 'রয়্যাল ব্যাটারি' আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই কয়টি ভারতীয় গোলন্দাজ দল বাহিনীরই অংশ রূপে ছিল। কিন্তু এই সব মাউণ্টেন ব্যাটারির ব্রিটিশ অফিসারের দল রাজকীয় গোলন্দাজ (Royal Artillery) বাহিনীর লোক রূপে পরিগণিত হতো। ১৯২৭ সালে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় মাউণ্টেন ব্যাটারিগুলিকে খাস ব্রিটিশ রাজকীয় গোলন্দাজ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতীয়দের গোলন্দাজী যুদ্ধে শিক্ষিত করার ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা ও দ্বিধা যে ১৮৫৭ সালের পর থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত জাগ্রত ছিল, এই পরিবর্তন সেই গভীর কূটনীতির একটি উদাহরণ।

১৯৩৫ সালে প্রথম বাঙ্গালোরে ফিল্ড ব্রিগেড রূপে ভারতীয় গোলন্দাজ দল গঠিত হয়। এই প্রথম ভারতীয় সৈনিক কামানদাগার কাজ করবার সুযোগ লাভ করে। এর আগে ভারতীয় মাউণ্টেন ব্যাটারিতে কামানদাগা সৈনিক (gunner) রূপে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হতো না। ভারতীয়েরা মাত্র কামান ড্রাইভারের কাজ করতো। চারটি ব্যাটারি নিয়ে এই ফিল্ড ব্রিগেড তৈরী

হয়—(১) মাদ্রাজীদের নিয়ে একটি ব্যাটারি, (২) পাঞ্জাবী মুসলমানদের নিয়ে একটি, (৩) রাজপুতানার রাজপুতদের নিয়ে একটি এবং (৪) রংগহারদের নিয়ে একটি। এই নবগঠিত বাহিনী আর ইংলণ্ডীয় 'রয়্যাল আর্টিলারি'র অঙ্গীভূত হয়ে রইল না। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম যথার্থ ভারতীয় আর্টিলারি বা (Indian Artillery) গোলন্দাজ ফৌজ গঠিত হলো।

বিভিন্ন মাউন্টেন ব্যাটারি রূপে আখ্যাত ভারতীয় গোলন্দাজ দলগুলি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক অভিযানে সর্বদা সাথী হয়েছে। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে এই দলগুলির কৃতিত্বের তালিকাটি দেখলেই সহজে উপলব্ধি করা যায়, ভারতীয় গোলন্দাজের সামরিক যোগ্যতা কত উচ্চ। ১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতের অভ্যন্তরে কোন যুদ্ধের ব্যাপার আর ঘটেনি, সেই কারণে ভারতীয় গোলন্দাজ-দল যেসব যুদ্ধ করেছে তা সবই ভারতের বাইরে, ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রসারের যুদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চল, আফগানিস্থান, লুসাই পাহাড় ও বর্মা, ভারতের সংলগ্ন এই কয়টি অঞ্চলে যুদ্ধকার্য, তাছাড়া ভারত হতে বহুদূরে সোমালিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরবের এডেন এবং তিব্বতে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী কাজ করেছে। সাল হিসাবে সংক্ষেপে ভারতীয় গোলন্দাজদের রণাঙ্গনের নামগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো। এর থেকেই প্রমাণিত হবে, নতুন নতুন অঞ্চলে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ও অপরিচিত প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজ কতখানি কৃতিত্বের ইতিহাস রচনা করেছে।

ব্যাটারির নাম	সাল	রণাঙ্গন
কোহাট (১নং)	১৮৭৮-৮০	আফগানিস্থান
ডেরাজাত (২নং)	১৮৬০	মাসুদ ও ওয়াজিরি অঞ্চল

পেশোয়ার (৩নং)	১৮৭১	লুসাই পাহাড়
হাজারা (৪নং)	১৮৭৮	আফগানিস্থান, বর্মা, চীনসীমান্ত, কৃষ্ণপর্বত অঞ্চল
বোম্বাই (৫নং)	১৮৬৮	বর্মা, আবিসিনিয়া
জেকবের (৬নং)	১৮৭৮-৮০	আফগানিস্থান
	১৮৯৬	মিশর
বেঙ্গল (৭নং)	১৮৮৬	বর্মা
লাহোর (৮নং)	১৮৮৬	বর্মা
মুরি (৯নং)	১৯০০	পূর্বআফ্রিকা, আবিসিনিয়া সীমান্ত
আবোটাবাদ (১০নং)	১৯০৩	এডেন
	১৯০৪	তিব্বত

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারতীয় গোলন্দাজ দলগুলি নিম্নলিখিত রণাঙ্গণে যুদ্ধে লিপ্ত হয় :

১৯১৪ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের ব্যাটারি সুয়েজ খাল রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। ১৯১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের ফৌজের সঙ্গে এই দুই ভারতীয় ব্যাটারি আনজাকে অবতরণ করে এবং সম্মিলিত ভাবে জার্মান ফৌজের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রে মাত্র এই দু'টি ভারতীয় গোলন্দাজ দলই কাজ করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় গোলন্দাজ দল মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল। ৭নং এবং ৮নং ভারতীয় ব্যাটারি জেনারেল স্মাটসের পরিচালনায় কিলিমান-জারোতে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়। যুদ্ধ বিরতি দিবসের আগের দিন পর্যন্ত এই রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলেছিল। ব্রিটন, বুয়র রোডেসিয়ান ও আফ্রিক্যান—এই সব বিভিন্ন জাতির সৈনিকদলের

সঙ্গে ভারতীয় গোলন্দাজ দল পূর্ব আফ্রিকার রণাঙ্গনে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গনে সৈনিকদের একটা অদ্ভুত বিপদের মধ্যে কাজ করতে হত। আহত সৈনিকদের প্রায়ই জঙ্গলের হিংস্র পশুর দল টেনে নিয়ে পালিয়ে যেত।

১নং ও ৬নং ব্যাটারি দু'টি যুরোপীয় রণাঙ্গন থেকে 'গ্যালিপোলি' যুদ্ধের খ্যাতি অর্জন ক'রে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে প্রেরিত হয়। পারস্যে অবস্থান কালে (১৯১৮) 'প্যাক গোলন্দাজী' (Pack Artillery) প্রথার একটা পূর্বাভাস এই ভারতীয় গোলন্দাজ দল দু'টির অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই প্রথম পাওয়া যায়। এই প্রথা হলো মোটর-লরি বাহিত দ্রুতচলমান ব্যবস্থা। ১৯১৮ সালে পারস্যের রণক্ষেত্রেই হঠাৎ বন্দর আব্বাসে একটি ভারতীয় ব্যাটারি গঠিত হয়—১৬নং (ঝোব) ব্যাটারি। ভারতের বাহিরে গোলন্দাজ দল গঠিত হবার এই এক মাত্র উদাহরণ। রাজপুতানা (১৪নং) ব্যাটারি, মুরি (৯নং) ব্যাটারি এবং মেমিয়ো (১৯নং) ব্যাটারি প্যালেস্টাইনের রণাঙ্গনে যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হয়।

বডি-গার্ড

ভারতীয় ফৌজে বডি-গার্ড (Body Guards) নামে পরিচিত বিশিষ্ট এক ধরনের সেনাদল আছে। এই সেনাদলের একটা বিশিষ্ট ইতিহাসও আছে। কেন, কি কারণে এবং কিভাবে এই সেনাদল গঠিত হলো ?

বডিগার্ডেরা সাধারণতঃ ঘোড়সওয়ার ফৌজ। ইংলণ্ডীয় রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি অথবা রাজপ্রতিনিধিরূপে পরিচিত উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ও তাঁদের আবাসস্থল ও প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার কাজের জন্যই এই 'ঘরোয়া' সেনাদল গঠিত হয়। ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রভু বড়লাট এবং তিনটি বনিয়াদী প্রদেশ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্ণরদের জন্যই শুধু বডি-গার্ড আছে।

১৭৬২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম মাত্র ৬০ জন য়ুরোপীয় পদাতিক সৈনিক নিয়ে একটি বডি-গার্ড দল গঠন করেন। কোম্পানীর প্রধান কর্তার ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্যেই এই দল তৈরী হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ বডি-গার্ড দলের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস ক'রে মাত্র ২৫ জনের দলে পরিণত করেন। কিন্তু ১৭৭৩ সালে বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'সন্ন্যাসী' নামে পরিচিত যাযাবর দস্যুদলের উপদ্রব থেকে সীমান্ত রক্ষার জন্য হেষ্টিংস বনারসের রাজা চৈতসিংহের সহযোগিতায় একটি ভারতীয় ঘোড়সওয়ার দল তৈরী করেন। এই সওয়ার দলের ভেতর থেকে ৫০ জন সওয়ার হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই প্রথম

'গবর্ণর জেনারেলের বডি-গার্ড' দল গঠিত হলো। প্রথমে নামকরণ হয়েছিল—'গবর্ণরের মোগল সেনাদল' (Governor's Troop of Moghuls), কারণ হেষ্টিংস প্রথমে শুধু গবর্ণরই ছিলেন। হেষ্টিংসের পর ম্যাকফার্সনের গবর্ণরগিরির সময় বডি-গার্ড দলের সৈন্যসংখ্যা আবার হ্রাস ক'রে মাত্র ৫০ জন করা হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর হয়ে আবার বডি-গার্ড দলের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং তাঁরই সময় ১৭৯০ সালে বডি-গার্ড দল টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৭৯৬ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড এই নির্দেশ দেন যে গবর্ণর বা গবর্ণর জেনারেলের জন্য কোন স্বতন্ত্র ঘরোয়া রক্ষীদল থাকবে না, সাধারণ সওয়ার ফৌজের সৈনিকেরাই বডি-গার্ডের কাজ করবে। কিন্তু এই নির্দেশ কার্যতঃ পালিত হয়নি। বরং ১৮০১ সালে কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বডি-গার্ড দলের একটি শিবির স্থাপিত হয়। এক শত বৎসরেরও অধিক কাল এই বালিগঞ্জ শিবির বড়লাটের বডি-গার্ড দলের শীতকালীন আবাস হয়েছিল।

বডি-গার্ড দল নামে গঠিত রাজপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত ফৌজ কিন্তু একমাত্র ব্যক্তিগত রক্ষাকার্যেই নিযুক্ত হয়নি। ভারতে ও ভারতের বাইরে বহু বড় বড় যুদ্ধে ও অভিযানে বডি-গার্ড দল কাজ করেছে। ১৮০২ সালে গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে তাঁর বডি-গার্ড দল অন্যান্য ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে মিশরে প্রেরিত হয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮০৩ সালে বেরারাধিপতির বিরুদ্ধে কোম্পানীর সংগ্রামে বডি-গার্ড দল কটক অধিকারের কাজে অংশ গ্রহণ করে। মারাঠাবিরোধী সংগ্রামের সময়েই বডি-গার্ড দল অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল ব্যবহারের প্রথাও গ্রহণ করে। ১৮০৯ সালে বঙ্গোপসাগরের ফরাসী যুদ্ধজাহাজ দেখা দেয়। এর

বিরুদ্ধে কোম্পানী নৌযুদ্ধের আয়োজন করে এবং বডি-গার্ড দলও জাহাজে চড়ে এই নৌযুদ্ধে যোগদান করে। ঘোড়সওয়ার ফৌজের পক্ষে নৌযুদ্ধ করবার এই একমাত্র দৃষ্টান্ত।

বডি-গার্ড দলের সামরিক ক্রিয়া ও কৃতিত্বের পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃতি করা যেতে পারে। যে সকল যুদ্ধে ও রণক্ষেত্রে প্রধান ফৌজের সহযোগী হিসাবে বডি-গার্ড দল কাজ করেছে তারই তালিকা দেওয়া হলো।

(১) ১৮১১ সাল—ফরাসী ও ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জাভা অধিকার।

(২) ১৮১৭-১৮ সাল—লর্ড লেকের পরিচালনায় মারাঠাবিরোধী সংগ্রাম।

(৩) ১৮১৮-২৪ সাল—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী বিদ্রোহের সময় তীরধনু ও কুঠার সজ্জিত লরকা কোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ব্যারাকপুরে বর্মা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক বিদ্রোহী সিপাহী দলের(৪৭নং পদাতিক) বিদ্রোহ দমনের কাজ।

(৪) ১৮২৪-২৫—গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের সময় বর্মা অভিযানে যোগদান।

১৮২৬ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত কোন বড় যুদ্ধকার্যে বডি-গার্ড দলকে লিপ্ত হতে হয়নি। আমহার্ষ্ট, বেণ্টিক, অকল্যাণ্ড ও এলেনবরা প্রভৃতি গবর্ণর জেনারেলদের ভারতব্যাপী সফরে রক্ষাকার্য পালন করতেই বডি-গার্ড দলের এই কয়টি বৎসর প্রধানতঃ অতিবাহিত হয়। লর্ড অকল্যাণ্ড প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, সাধারণ ফৌজের যেসব সৈনিক বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ দেবে, কৃতিত্বের পুরস্কার হিসাবে তাদের বডি-গার্ড দলে গ্রহণ করা হবে, এইভাবে বডি-গার্ড

দলের সৈনিকপদ একটা বিশেষ সম্মানের পদ হয়ে উঠে। ফিরোজপুরে লর্ড এলেনবরাই আফগানযুদ্ধের ফেরত একজন তরুণ ইংরাজ পদাতিক অফিসারকে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বডি-গার্ড দলে গ্রহণ করেন। এই তরুণ অফিসারই হলেন পরবর্তী বিখ্যাত ফিল্ড মার্শাল স্যার নেভিল চেম্বারলেন। ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা স্বয়ং গোয়ালিয়রের মহারাণীর ফৌজের বিরুদ্ধে তাঁর বডি-গার্ড দল নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

১৮৫৪ সালে শিখ-যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। লর্ড এলেনবরার বডি-গার্ড দল প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে—মুদ্‌কি, ফিরোজশা, আলিওয়াল ও সোবরাওঁ। প্রথম শিখ-যুদ্ধে বডি-গার্ড দল দেরাদুন অধিকার করে। সেই থেকে দেরাদুন বডি-গার্ড দলের গ্রীষ্মকালীন শিবির হয়ে আছে। ১৮৫৫ সালে ক্যাপটেন র‍্যাট্রের (Captain Rattray) পরিচালনায় বডি-গার্ড দল সাঁওতাল বিদ্রোহদমনের কাজে যোগদান করে। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে বডি-গার্ড দলকে লড়তে হয়। ১৮৫৮ সালে দিল্লীর বড় দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পাঠের জন্য লর্ড ক্যানিংকে বডি-গার্ড দল আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সঙ্গে নিয়ে যায়। বডি-গার্ড দলের ইতিহাসে দু'টি সৌভাগ্যমূলক ঘটনার কাহিনী শোনা যায়। এই বডি-গার্ড দলই বর্মাযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৮২৬ সালে বাষ্পচালিত জাহাজে চড়ে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসে। এই জাহাজের নাম 'এণ্টারপ্রাইজ' (Enterprize), ভারতে এই প্রথম বাষ্পীয় জাহাজের আগমন। আর একটি ঘটনা হলো—প্রথম ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য। লর্ড ক্যানিংয়ের দরবার থেকে কলকাতায় ফেরবার সময় বডি-গার্ড দল রাণীগঞ্জে এসে প্রথম ট্রেনে চড়ে কলকাতায় আসে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বডি-গার্ড দলকে সাধারণ সওয়ার ডিভিসনের সঙ্গে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তা না ক'রে শেষ পর্যন্ত এই দলকে সওয়ার ট্রেনিং দেবার দলরূপে ভারতে রাখা হয়। কিছু সংখ্যক বডি-গার্ড স্কিনারের সওয়ার দলের সঙ্গে প্রথম প্রেরিত হয় (১৯১৪-১৬)।

পূর্বে বলা হয়েছে, বডি-গার্ড দলের সূত্রপাত হয়েছিল য়ুরোপীয় পদাতিক সৈন্য নিয়ে। কিন্তু তার পরেই ভারতীয় সৈনিক নিয়ে এই দল গঠিত হয়। অবশ্য অফিসারেরা ইংরাজ ছিল। হেষ্টিংসের সময় মুসলমানেরাই বডি-গার্ড দলে গৃহীত হ'ত। তারপর মাদ্রাজী। তারপর সব শ্রেণীর ভারতীয় অর্থাৎ তথাকথিত সামরিক জাতির ভারতীয়। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ব্রাহ্মণ বডি-গার্ড খুব বেশী সংখ্যায় ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় (১৯৩৯) ফৌজী তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় বডি-গার্ড দল একটি স্কোয়াড্রন রূপে গঠিত ছল। চারটি ট্রুপ নিয়ে এই স্কোয়াড্রন, দু'টি শিখ ট্রুপ এবং দু'টি পাঞ্জাবী মুসলমান ট্রুপ।

বডি-গার্ড দলের সাজসজ্জা এবং অস্ত্রসজ্জার বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতে য়ুরোপীয় সওয়ারের মত আঁটসাট ফ্রককোট, শ্যাকো টুপি ও আজানুপরিবৃত চামড়ার জুতা পরবার প্রথা ছিল। বর্তমানে নীল ও সোনালী রঙে মেশানো পাগড়ী, লাল লম্বা কোর্তা, সাদা ব্রিচেস ও নেপোলীয়ন বুট পরিধানের প্রথা প্রচলিত। ১৮৬৫ সালে প্রথম বডি-গার্ড দলে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে বল্লম (lance) ধারণ করার নিয়ম প্রচলিত হয়। ব্যাণ্ড বাদ্য ইত্যাদি অন্যান্য আড়ম্বরও বডি-গার্ড দলে খুব বেশী রকম আছে।

এ পর্যন্ত গবর্ণর জেনারেলের বডি-গার্ড দলের ইতিহাস বিবৃত করা হলো। তিনটি গবর্ণরী বডি-গার্ড দলের প্রসঙ্গ এইবার আলোচনা করা যাক্।

মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরী বডি-গার্ড দলের ইতিহাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল। ১৭৭৮ সালে মাদ্রাজ গবর্ণরের বডি-গার্ড দল গঠিত হয়। পারস্য অভিযানে, মহীশূর যুদ্ধে এবং মারাঠা যুদ্ধে এই দল যোগদান করে। ১৮২৭ সালে মাদ্রাজের গবর্ণর সফরকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। গবর্ণরের সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর যে সব সৈনিক ছিল তারা গবর্ণরের মৃতদেহ সমাধি স্থানে বহন ক'রে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে, কিন্তু বডি-গার্ড দলের রাজপুত ইত্যাদি উচ্চশ্রেণীর সওয়ারেরা 'খুসী হয়ে' গবর্ণরের মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে থেকেই জার্মান গোলার আঘাত বরণ করবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মাদ্রাজ গবর্ণরী বডি-গার্ড দলের হয়েছিল। অর্থাৎ, জার্মান যুদ্ধজাহাজ 'এমডেন' বঙ্গোপসাগরে ঘুরে ফিরে মাদ্রাজ উপকূলে গোলাবর্ষণ করেছিল এবং মাদ্রাজ উপকূলে পেট্রল দেবার ভার এই বডি-গার্ড দলের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। রাজপুতানার রাজপুত ও যুক্তপ্রদেশের জাঠেরাই এই দলের সৈনিক।

বোম্বাইয়ের গবর্ণরী বডি-গার্ড দল ভেঙ্গে-দেওয়া দক্ষিণ মারাঠা সওয়ারদের (Southern Marhatta Horse) ভেতর থেকে লোক নিয়ে প্রথম গঠিত হয়। বর্তমানে রংগহার ও শিখ সওয়ার নিয়েই এই দল গঠিত।

বাংলার গবর্ণরী বডি-গার্ড দল বয়সে সব চেয়ে ছোট। কারণ বাংলার গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল একই ব্যক্তি হবেন, এই নিয়ম

বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সুতরাং প্রথম দিকের গবর্ণর জেনারেলের বডি-গার্ড এবং বাংলা গবর্ণরের বডি-গার্ড একই দল ছিল। তাছাড়া কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। পরবর্তী কালে উক্ত দুই ভিন্ন পদে দুই ভিন্ন ব্যক্তি নিয়োগের নিয়ম হয় এবং ১৯১২ সালে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময়েই বাংলার গবর্ণরের বডি-গার্ড দল পাঞ্জাবী মুসলমান ও রাজপুত সওয়ার নিয়ে গঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র রক্ষীদলের নাম উল্লেখযোগ্য। নেপাল রক্ষীদল (Nepalese Escorts) নামে এই দল পরিচিত। এই দলের কাজ বডি-গার্ড দলের মতই, রাজপুরুষের ব্যক্তিগত রক্ষাকার্য। নেপাল যুদ্ধের অবসানের পর নেপালরাজের সঙ্গে ইংরাজের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তি অনুসারে নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুতে ইংরাজের দূতাবাস (Residency) স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে একটি রক্ষীদলও সেখানে রাখবার নিয়ম হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজপুতানার মাত্র হিন্দু সৈনিকদের নিয়ে দূতাবাসের এই 'নেপাল রক্ষীদল' গঠিত হয়, নেপালে মুসলমান সৈনিকের অবস্থান নেপালবাসী বা নেপাল গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করেনি।

খাকি উর্দির প্রথম উদাহরণ
(গাইডস্‌ সওয়ার, ১৮৫০)

গুর্খা রাইফেলম্যান (১৮৯৭)

গুর্খা রাইফেল (১৮৯০)

প্রথম গুর্খা রেজিমেণ্টের রংরুট
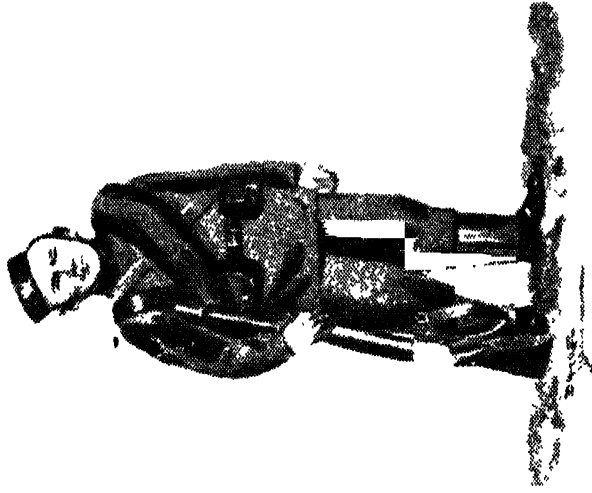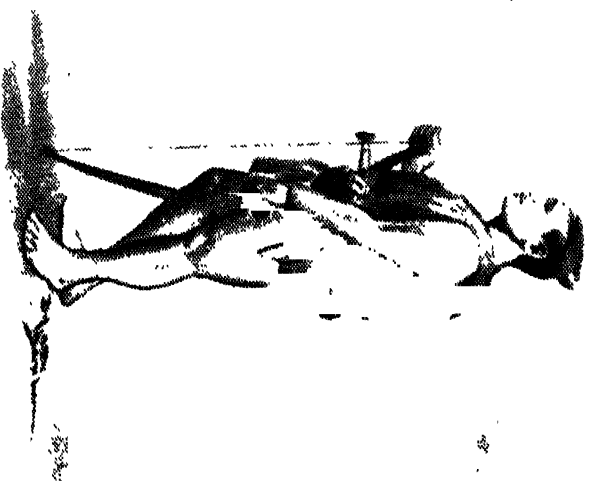
স্যাপার ও মাইনার

বর্তমানে প্রতি দেশের প্রতি বাহিনীতে 'স্যাপার ও মাইনার' (Sappers and Miners) নামে পরিচিত একটি ফৌজী বিভাগীয় দল থাকে। শিবাজীর মারাঠা বাহিনীতে 'বেলদার' নামে যে বিশেষ শ্রেণীর ফৌজী দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা বস্তুতঃ স্যাপার ও মাইনার দলের মতই একটি দল। শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে পদাতিক বাহিনীর পক্ষে একটা বাধা হলো পথের বাধা। যেখানে পথ নেই সেখানে পথ ক'রে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, নালা—এ সবই পদাতিক বাহিনীর অভিযানের পথে এক একটা বাধা। এই কারণে প্রত্যেক ফৌজের পক্ষে একদল এঞ্জিনিয়ারিং কাজে পারদর্শী লোক রাখবার প্রয়োজন হয়, যারা এই সব পথ ও সেতু ইত্যাদি রচনার কাজ নিয়ে থাকে।

অতীতে ভারতীয় ফৌজে প্রথম প্রথম মাত্র অভিযানের সময় নতুন লোক সংগ্রহ ক'রে এই সব বেলদারী কাজে নিয়োগ করা হত। অভিযান শেষ হলেই বেলদারদের বিদায় ক'রে দেওয়া হত। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে ঐ ধরনের সাময়িক বেলদার দল গঠন করার বদলে ফৌজের বিভাগ হিসাবে স্থায়ী বেলদার দল রাখাই বেশী উপযোগী বলে বোধ হয়। ১৭৮০ সালে 'মাদ্রাজ পাইওনিয়ার' (Madras Pioneers) নামে প্রথম একটি ফৌজী দল তৈরী হয়, যার কাজ ছিল শুধু পথ তৈয়ারী করা। পাইও-নিয়ার দলের পরিচালনার জন্য পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ১৮৩১ সালে এই মাদ্রাজ পাইওনিয়ার দলের পরিচালনার জন্য অফিসার পদে এঞ্জিনিয়ার অফিসার

নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয় অর্থাৎ মাদ্রাজ পাইওনিয়ার প্রকৃত 'মাদ্রাজ স্যাপার' হয়ে ওঠে।

১৭৮০ থেকে ১৮৩১ সাল, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মাদ্রাজ পাইওনিয়ার দল বহু রণক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে। হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অভিযানে অর্থাৎ মহিশুর যুদ্ধে, ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সিংহল ও মালাক্কায়, ফরাসীদের বিরুদ্ধে কুড্ডালোরে, মিশরে, জাভায় ও বর্মায়—বহু সংগ্রামে মাদ্রাজ পাইওনিয়ার দল যোগদান করে। মাদ্রাজ পাইওনিয়ার দল মাদ্রাজ স্যাপারে পরিণত হয় এবং আরও কিছুকাল পরে এর নাম হয়—'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্যাপার ও মাইনার' (Queen Victoria's Own Sappers & Miners)। এই স্যাপার দলই প্রাচীনতম বেলদার দল।

১৮০৩ সালে কানপুরে 'বেঙ্গল পাইওনিয়ার' দল গঠিত হয়। মারাঠা যুদ্ধে এই দল কাজ করে। ১৮১৯ সালে নতুন ব্যবস্থা অনুসারে এই দল স্যাপারে পরিণত হয় এবং শেষ দিকে এর নাম হয়—'রাজা পঞ্চম জর্জের বেঙ্গল স্যাপার ও মাইনার' (King George V's Own Bengal Sappers & Miners)।

বোম্বাই স্যাপার দল বয়সে সবচেয়ে ছোট, ১৮২০ সালে এই দল গঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'পাইওনিয়ার লস্কর' দল নাম নিয়ে ১৭৭৭ সাল থেকেই যে দল পাইওনিয়ারের কাজ করছিল, সেই দলটিই ১৮২০ সালে স্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং ঐতিহ্য বিচার করলে বোম্বাই স্যাপার দলই সর্বাপেক্ষা পুরাতন দল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই দলের নামের সঙ্গে 'রয়্যাল' বিশেষণটি যুক্ত হয়।

উল্লিখিত তিনটি স্যাপার দলের ইতিহাস, অর্থাৎ ১৮২০ সাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের ইতিহাস ভিন্ন ক'রে

আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ এই ইতিহাস বস্তুতঃ ভারতীয় ফৌজেরই ইতিহাস। ভারতীয় ফৌজ যখন যে যুদ্ধে যেখানে প্রেরিত হয়েছে, উক্ত তিনটি স্যাপার দলের সৈনিকও সেখানে গিয়েছে। * স্যাপার দলের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ করা যেতে পারে।

গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা ভরতপুর দুর্গ অধিকারে ইংরাজ ফৌজের প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হলো ১৮০৫ সালের ঘটনা। ১৮২৫ সালে দ্বিতীয়বার ভরতপুর দুর্গ আক্রমণের সময় বেঙ্গল স্যাপার দল যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে ঐ পরিখা পার হবার ব্যবস্থা তৈরী ক'রে ফেলে, তার ফলেই ইংরাজ ফৌজের পক্ষে দুর্গ অধিকার সম্ভব হয়। বর্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অনেকখানি এবং ভারতের আরও কতগুলি বিখ্যাত সড়ক বেঙ্গল স্যাপারদের রচনা। ভারতের বিশিষ্ট দেশীয় রাজন্যেরা এই তিনটি স্যাপার দলের অনরারি কর্ণেল (Honorary Colonel) পদ লাভ করেছেন। স্যাপার দলে প্রত্যেক সামরিক জাতির লোক গৃহীত হয়েছে। মাদ্রাজের লোকই বেশী। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির লোক স্যাপার দলে বহু সংখ্যায় কাজ গ্রহণ করেছে। ফৌজী বৃত্তি থেকে কেমন ক'রে সত্যি সত্যি 'জাত' সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতে

---

*To write the history of the three Corps of Sappers and Miners from 1820 onwards is to write the history of the Indian Army, for, wherever, and whenever, Indian troops have taken part in a campaign of consequence, whetherat home or in distant lands, a portion of one or another, some times of all three, have accompanied the troops in the field.—India's Army by Major Denovan Jackson.

সত্যি সত্যিই 'অস্পৃশ্য' হিন্দু সমাজের মধ্যে 'কুইনসাপ' নামে একটি বিশেষ সমাজ বা জাত সৃষ্টি হয়ে গেছে। মহারাণী স্যাপার দল থেকে সার্ভিস শেষ হবার পর 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীর সৈনিকেরা গ্রাম-জীবনে ফিরে গিয়েও একটা স্বতন্ত্র সমাজ হয়ে উঠেছে। এই সমাজ হলো 'কুইনসাপ' (Queen's Sappers, সংক্ষেপে Quinsap) সমাজ। স্যাপার বাহিনীতে যারা কাজ করেছে, মাত্র তাদেরই সঙ্গে কুইনসাপ সমাজের মেয়ের বিয়ে হয়ে থাকে।

স্যাপার নামে পরিচিত এঞ্জিনিয়ার-সৈনিককে রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ কার্যের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয় এবং ভারতীয় স্যাপারকে বহু রণাঙ্গনে বস্তুতঃ যুদ্ধ করতে হয়েছে। শুধু পথ ও সেতু রচনা ক'রে নিজ পক্ষের যোদ্ধা ফৌজকে অগ্রসর করিয়ে দেওয়ার কাজ নয়, সেতুপথ ধ্বংস ক'রে শত্রুর আগমন প্রতিহত করার কাজও স্যাপারকে করতে হয়।

সিগন্যাল কোর

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অভিযানে কোন ফৌজের সফলতা ও কৃতিত্ব যে প্রধান ব্যবস্থাগুলির ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে একটা হলো—সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা। রণক্ষেত্রে পরিচালক কর্তৃপক্ষ, যুদ্ধরত সৈনিক, পেছনের সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের লোকের মধ্যে সংবাদের যোগাযোগ রক্ষা ও নির্দেশ প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা চাই। শুধু তাই নয়, নিজ পক্ষের পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা রেখে তবেই অভিযান চালনা বা পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্র রক্ষা সম্ভব হয়।

বল্‌তে গেলে, ভারতীয় তিনটি স্যাপার দল থেকেই ভারতীয় সিগন্যাল কোরের (Indian Signal Corps) জন্ম হয়। প্রথম প্রথম স্যাপারদের ওপরেই সংবাদ আদান প্রদানের কাজ দেওয়া হয়েছিল। পরে এই কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯১১ সালে স্যাপার দলের লোক নিয়ে প্রথম ভারতীয় সিগন্যাল সার্ভিস (Indian Signal Service) নাম দিয়ে দল গঠিত হয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আবর নামে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে ঐ অঞ্চলে সিগন্যাল সার্ভিস দল কাজ করে। তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সিগন্যাল সার্ভিসের লোক বহু রণাঙ্গনে কাজ করে—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, রুশিয়া, পারস্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।

১৯২২ সালে এই 'সিগন্যাল সার্ভিস' প্রকৃত 'সিগন্যাল কোর' রূপে নাম ও পরিণতি লাভ করে। এই সময় থেকে ভারতীয় ফৌজের সৈনিক যে রণক্ষেত্রে লড়াই করতে গিয়েছে, সিগন্যাল কোরের একটি না একটি দলও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়েছে।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে যেমন যুদ্ধের অস্ত্রশাস্ত্রের রূপ ও রীতি বদলে যাচ্ছে তেমনি সিগন্যাল বা সঙ্কেতে সংবাদ প্রেরণের পদ্ধতিরও নতুন নতুন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হয়ে চলেছে। অতীতে পারাবত ও কুকুর রণক্ষেত্রে সংবাদ আদান প্রদানের পত্রবাহক দূতরূপে কাজ করেছে। আয়নার সাহায্যে সূর্যের প্রতিফলিত আলোককে সুদূর শিবিরে সঙ্কেতরূপে প্রেরণ করার প্রথাও ছিল। তারপর টেলিফোন, রেডিও, টেলিগ্রাফ, নিশান ইত্যাদির সাহায্যে সঙ্কেতধ্বনি, সঙ্কেতভাষা ও সঙ্কেতদৃশ্য প্রেরণের আরও কত ব্যবস্থা আছে, যা সবই সিগন্যাল সৈনিকের অধীতব্য বিষয়। ভারতীয় সিগন্যাল কোরের সৈনিকেরা অধিকাংশ মাদ্রাজী।

ভারতীয় ক্যাভাল্‌রি বা সওয়ার ফৌজ

ইংরাজী ভাষায় যদিও ঘোড়সওয়ার ফৌজকে ক্যাভাল্‌রি বলা হয়, কিন্তু ক্যাভাল্‌রি অর্থে শুধু ঘোড়সওয়ার ফৌজ বোঝায় না। ক্যাভাল্‌রি একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত সৈন্যদল। পদাতিক বা ইন্‌ফ্যান্ট্রি সৈন্যের কাজ আর ক্যাভাল্‌রি সৈন্যের কাজ ও কাজের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। বর্তমানের ক্যাভাল্‌রি আর 'ঘোড়সওয়ার' বাহিনী নয়। ঘোড়া নামে তুরঙ্গম জীবটিকে বাহন না ক'রে, তার চেয়ে দ্রুতগামী বাহন বর্তমান ক্যাভাল্‌রি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বর্তমান ক্যাভাল্‌রি অটোমোবিল মোটরযানকেই বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং অস্ত্রসজ্জাও উন্নততর করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধেরও অনেক পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় ঘোড়াসওয়ার ফৌজকে যন্ত্রোপেত (mechanised) করা হয়। ভারতীয় ভাষায় ক্যাভল্‌রির অন্তর্গত ছোট দল বা ট্রুপ্‌কে রিসালা বলা হয়।

ভারতীয় সওয়ার ফৌজ বা ক্যাভাল্‌রির ইতিহাসও এক সুদীর্ঘকালব্যাপী বিরাট সামরিক কৃতিত্বের ইতিহাস। ভারত ও ভারতের বাহিরে শত শত রণাঙ্গনে ভারতীয় সওয়ার ফৌজ দুঃসাহসিক সংগ্রামের পরিচয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে ভারতীয় সওয়ার ফৌজের ইতিহাস বিবৃত করা গেল।

সওয়ার দলের নম্বর ও নামান্তরের পঞ্জী

প্রাক্তন নাম ও নম্বর	১৯০৩ সালের নাম ও নম্বর	আধুনিক নম্বর (১৯২২—)

১নং	বেঙ্গল ল্যান্সার (স্কিনারের সওয়ার)	১নং	১নং ডিউক অব ইয়র্কের (স্কিনার) সওয়ার
৩নং	বেঙ্গল ক্যাভালরি (স্কিনারের সওয়ার)	৩নং	
২নং	বেঙ্গল ল্যান্সার (গার্ডেনারের সওয়ার)	২নং	২নং ল্যান্সার (গার্ডেনার) সওয়ার
৪নং	,, ,,	৪নং	
৫নং	বেঙ্গল ক্যাভালরি	৫নং	৩নং ক্যাভালরি
৮নং	বেঙ্গল ল্যান্সার	৮নং	
৯নং	বেঙ্গল ল্যান্সার (হডসনের সওয়ার)	৯নং	৪নং ডিউক অব কেমব্রিজের (হডসন) সওয়ার
১০নং	বেঙ্গল ল্যান্সার (হডসনের সওয়ার)	১০নং	
১১নং	বেঙ্গল ল্যান্সার	১১নং	৫নং রাজা এ্যাডোয়ার্ডের (প্রোবিনের) সওয়ার
১২নং	বেঙ্গল ক্যাভালরি	১২নং	
১৩নং	বেঙ্গল ল্যান্সার	১৩নং	৬নং ডিউক অব কনটের (ওয়াটসন) ল্যান্সার
১৬নং	,, ,,	১৬নং	
৩নং	মাদ্রাজ ল্যান্সার	২৮নং	৭নং লাইট ক্যাভালরি

পুরাতন নাম	নূতন নম্বর	নূতন নাম
১নং মাদ্রাজ ল্যান্সার	২৬নং	৮নং রাজা জর্জের লাইট ক্যাভাল্‌রি
৪নং ল্যান্সার (হায়দ্রাবাদ)	৩০নং (গর্ডন)	
১নং ল্যান্সার (হায়দ্রাবাদ)	২০নং ডেক্যান সওয়ার	৯নং ডেক্যান সওয়ার
২নং	২৯নং ” ”	
মহারাণীর গাইড্‌স্ দল	মহারাণীর গাইড্‌স্	১০নং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গাইড্‌স্ ক্যাভল্‌রি
১নং পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রি	২১নং	১১নং প্রিন্স আলবার্টের-ক্যাভাল্‌রি
৩নং ” ”	২৩নং	
২নং পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রি	২২নং	১২নং ক্যাভল্‌রি
৫নং ” ”	২৫নং	
১নং বোম্বাই ল্যান্সার	৩১নং	১৩নং ডিউক অব কনটের বোম্বাই ল্যান্সার
২নং ” ”	৩২নং	
৫নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি (সিন্ধু সওয়ার)	৩৫নং	১৪নং প্রিন্স অব ওয়েলসের সিন্ধু সওয়ার
৬নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি (জেকবের সওয়ার)	৩৬নং	

পূর্বের নাম	নম্বর	নূতন নাম
১৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার	১৭নং	১৫নং ল্যান্সার
৭নং বোম্বাই ল্যান্সার (বেলুচ সওয়ার)	৩৭নং	
২নং মাদ্রাজ ল্যান্সার	২৭নং	১৬নং লাইট ক্যাভলরি
৩নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি	৩৩নং	১৭নং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুনা সওয়ার
৪নং ” ” (পুনা সওয়ার)	৩৪নং	
৬নং বেঙ্গল ক্যাভাল্‌রি	৬নং	১৮নং রাজা এডোয়ার্ডের ক্যাভাল্‌রি
৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার	৭নং	
১৮নং বেঙ্গল ল্যান্সার (তিওয়ানা সওয়ার)	১৮নং	১৯নং রাজা জর্জের ল্যান্সার
১৯নং (ফেনের সওয়ার)	১৯নং	
১৪নং বেঙ্গল ল্যান্সার (মারে’র জাঠ সওয়ার)	১৪নং	২০নং ল্যান্সার
১৫নং বেঙ্গল ল্যান্সার (কিওরটনের মুলতানি)	১৫নং	
১নং মধ্য ভারত সওয়ার	৩৮নং	২১নং রাজা জর্জের মধ্য ভারত সওয়ার
২নং মধ্য ভারত সওয়ার	৩৯নং	

ভারতীয় সওয়ার ফৌজের কয়েকটি পুনর্গঠনের বিবরণ পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬১ সালে এক দফা পুনর্গঠন, তার পর ১৮৯৫ সালে এক দফা, তার পর ১৯০২-৩ সালের লর্ড কিচেনারের হাতে আর এক দফা পুনর্গঠন—এই ভাবে সওয়ার ফৌজের গঠন ও রীতিনীতি বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯০২-৩ সালে সওয়ার ফৌজের বিভিন্ন দলগুলির যে নাম ও নম্বর পড়ে, ১৯১৪ সালেও (প্রথম মহাযুদ্ধের সময়) সেই নাম ও নম্বর প্রায় সবই অপরিবর্তিত থাকে। বড় পরিবর্তন হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। ১৯২১ সালে দেখা যায় যে মোট ৩৯টি সওয়ার দল আছে। এর মধ্যে ২৭নং,২৮নং এবং মহারাণীর গাইড্‌স্ দল যেমনভাবে ছিল তেমনি অপরিবর্তিত রাখা হয় ["সওয়ার দলের নম্বর ও নামান্তরের পঞ্জী" দ্রষ্টব্য]। বাকী ৩৬টি দলের দু'টি ক'রে দল নিয়ে এক একটি দল গঠিত হয়। এইভাবে ১৮টি সওয়ার দল দাঁড়ায়। এই ১৮টি দল আর তিনটি অপরিবর্তিত দল—মোট ২১টি সওয়ার দল ভারতীয় ফৌজে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করে।

এইভাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে ভারতের ফৌজী তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় মোট ২১টি ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নাম উল্লেখিত রয়েছে। সওয়ার ফৌজ-গুলির নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দেওয়া নাম। কোম্পানীর আমল থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত সওয়ার ফৌজের কয়েকবার পুনর্গঠন হয়েছে, সেই সঙ্গে অনেকের নামও বদলেছে। নাম বদলে গেলেও প্রত্যেক দলীয় ফৌজী পতাকায় অতীতকালের রণকীর্তির স্মারক স্বরূপ রণাঙ্গনের নামগুলি ঠিক আজও চিহ্নিত আছে।

বিভিন্ন সওয়ার দলের ইতিহাস

১নং স্কিনারের সওয়ার (Skinner's Horse) :

জেম্‌স্ স্কিনার এই সওয়ার ফৌজের প্রথম গঠনকর্তা। স্কটল্যাণ্ড-দেশীয় জনৈক সৈনিকের ঔরসে এবং এক রাজপুতানী বন্দিনীর গর্ভে জেম্‌স্ স্কিনারের জন্ম। স্কিনার প্রথমে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার ফৌজে কাজ করতো এবং সিন্ধিয়ার বাহিনীর জন্যই স্কিনারের অধ্যক্ষতায় একটি ভারতীয় সওয়ার ফৌজ তৈরী হয়। কিন্তু মারাঠার বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে লর্ড লেকের ইঙ্গিতে স্কিনার তার সওয়ার দল নিয়ে কোম্পানীর পক্ষে চলে আসে। এর পর থেকেই স্কিনারের সওয়ার ইংরাজ চালিত ভারতীয় ফৌজেই অঙ্গীভূত হয়ে থাকে।

কয়েকটি উপভোগ্য ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আজও দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের যুক্তপ্রদেশের সেচবিভাগের কর্মচারীরা হল্‌দে রঙের উর্দি পরিধান ক'রে থাকেন। এর একটা ঐতিহাসিক রহস্য আছে। স্কিনারের সওয়ারদের উর্দি হল্‌দে রঙের ছিল। ১৮৫৪ সালে যুক্তপ্রদেশে গঙ্গার খাল শত্রুদলের সাবোতাজ বা নাশকতার আক্রমণ থেকে পাহারা দেবার জন্য স্কিনারের সওয়ার থেকে একটা দল পেট্রল ডিউটীর জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই মিলিটারী পাহারা উঠে যাবার পরে যখন বেসামরিক কর্মচারীদের হাতে খাল তদারকের ভার পড়লো, তখন সেই সব কর্মচারীদেরও হল্‌দে রঙের উর্দি দেওয়া হলো। সেই প্রথা আজও চলে আস্‌ছে।

১৯০০ সালে চীনযুদ্ধে স্কিনারের সওয়ার দল প্রেরিত হয়। তাতার

সওয়ার ফৌজের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় 'হল্‌দে উর্দি' সওয়ার দল আমেরিকান (U. S. A.) সওয়ার দলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে। আমেরিকান ও ভারতীয় সৈন্যের একসঙ্গে মিলে এক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার এই প্রথম উদাহরণ।

১৮৯৯ সালেই স্কিনারের সওয়ার দল একটি অতিরিক্ত নতুন উপাধি লাভ করে—ডিউক অব ইয়র্কের ক্যাভাল্‌রি (Duke of York's Own Cava lry)।

২নং গার্ডেনারের সওয়ার (Gardener's Horse):

গার্ডেনার নামে এক হাইল্যাণ্ডার সৈনিক মারাঠা বাহিনীতে সওয়ার দল পরিচালনার কাজ নিয়েছিল। ব্রিটিশের সঙ্গে মারাঠার সংঘর্ষ বেধে উঠতেই গার্ডেনার তার মারাঠা প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। গার্ডেনার পূর্বোল্লিখিত স্কিনারের মত মারাঠা বাহিনী থেকে তার পরিচালনাধীন সওয়ার দলকে ভাঙিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। শুধু নিজেই পালিয়ে গিয়ে লর্ড লেকের ফৌজে যোগদান করে এবং ১৮০৯ সালে একটি সওয়ার দল গঠন করে। এই সওয়ার দলই পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯০৩ সালে গার্ডেনারের সওয়ার আখ্যা লাভ করে। গার্ডেনার গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র মুসলমান নবাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

৪নং হডসনের সওয়ার (Hodson's Horse):

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সওয়ার দল গঠিত হয়। মান সিং নামক পাঞ্জাব পুলিশের জনৈক ইংরাজ ভক্ত কর্মচারী প্রথম লাহোর ও অমৃতসর জিলা থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে এই দল

গঠন করেন। পরে হডসন নামে জনৈক ইংরাজ সামরিক অফিসার এই দলের ভার গ্রহণ ক'রে একে একটা পূরা দস্তুর ক্যাভাল্‌রিতে পরিণত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই লক্ষ্ণৌয়ে গার্ডেনার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ১৮৭৭ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ডিউক অব কেমব্রিজ ব্রিটিশ ফৌজের প্রধান সেনাপতি রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়েই হডসনের সওয়ার দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ করে—'ডিউক অব কেমব্রিজের ল্যান্সার' (Duke of Cambridge's Own Lancers)।

৫নং প্রোবিনের সওয়ার (Probyn's Horse) :

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাব থেকে জরুরী প্রয়োজনে অতি অল্প সময়ে কয়েকটি অরেগুলার শিখ ক্যাভাল্‌রি গঠন করেন। ওয়েল (Wale) নামে এক ইংরাজ অফিসার এই নবগঠিত সওয়ার দলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। প্রথমে সেইজন্য ওয়েলের সওয়ার (Wale's Horse) নামে পরিচিত হয়। কিন্তু ১৮৫৮ সালে অর্থাৎ এক বছরের মধ্যেই ওয়েল জনৈক বিদ্রোহী সিপাহীর গুলিতে নিহত হন। এই সময় মেজর প্রোবিন (Major Probyn) নামে অফিসারের হাতে সওয়ার দলের পরিচালনা ন্যস্ত করা হয় এবং দলটি এই অফিসারের নামেই আখ্যাত হয়। মেজর প্রোবিন ৯২ বৎসর বয়সে মারা যান, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই সওয়ার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে এই দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ করে—'রাজা এডোওয়ার্ডের ল্যান্সার' (King Edward's Own Lancers)।

৬নং ওয়াটসনের সওয়ার (Watson's Horse) :

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে সঙ্কটগ্রস্থ ইংরাজ কর্তৃপক্ষ নতুন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রোহিলখণ্ডের কমিশনার

ও কাশিপুরের রাজার এক যুক্ত আবেদনের ফলে লোক সংগৃহীত হয় এবং একটি সওয়ার দল গঠিত হয়। প্রথমে এই দল রোহিলখণ্ড সওয়ার (Rohilkhond Horse) নামে আখ্যাত হয়। ক্যাপটেন ক্রসম্যান (Captain Crossman) এই সওয়ার দলের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। এই সওয়ার দলে উইলসন্ নামে জনৈক ইংরাজ অফিসার ছিলেন, যিনি 'রিসালদার উইলসন্' নামে পরিচিত। ইংরাজ অফিসারের পক্ষে ভারতীয় সামরিক পদবী গ্রহণ করার এই একমাত্র দৃষ্টান্ত। ১৮৬০ সালে লেফ্‌টেন্যান্ট ওয়াটসন এই দলের পরিচালনা গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নাম অনুসারে এই দলের নামকরণ হয়েছে। ১৮৮২ সালে এই দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ করে—'ডিউক অব কনটের ল্যান্সার' (Duke of Connaught's Own Lancers)।

৩নং ক্যাভাল্‌রি (3rd ক্যাভাল্‌রি) :

কোম্পানীর আমলের গঠিত পঞ্চম ও অষ্টম অরেগুলার সওয়ার দল (ক্যাভাল্‌রি) ১৯২২ সালে সম্মিলিত হয়ে তৃতীয় ক্যাভাল্‌রি নামে পরিচিত হয়।

৭নং ক্যাভাল্‌রি (7th Cavalry) :

এই সওয়ার দলের নাম পূর্বে (১৯০৩-১৮) ছিল ২৮নং লাইট ক্যাভাল্‌রি। তারও পূর্বে অর্থাৎ কোম্পানীর আমলে নাম ছিল '৩নং মাদ্রাজ লান্সার'। ৭নং ক্যাভাল্‌রির ইতিহাসে একটা বিশেষ ঘটনা হলো রুশ রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা। অন্য কোন ভারতীয় সওয়ার ফৌজের এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়নি। ১৯১৮-১৯ সালে রুশ বিপ্লবের সময় সপ্তম ক্যাভাল্‌রি নিদারুণ শীতের

হিমাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর অঞ্চলে উপস্থিত হয়। মেনশেভিক ফৌজকে সাহায্য করার জন্য সপ্তম ক্যাভাল্‌রির ভারতীয় সৈনিক বোলশেভিক ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। একটি স্থানে ১৩জন পাঞ্জাবী সওয়ারকে দেড়শত বোলশেভিক সওয়ার ঘিরে ফেলে ও আক্রমণ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র পাঞ্জাবী সওয়ার দল এই বেষ্টনী ভেদ ক'রে বের হয়ে আসে এবং এই সংঘর্ষে ২২জন রুশ বোলশেভিক নিহত হয়।

৮নং রাজা জর্জের লাইট ক্যাভাল্‌রি (King George's Own Light Cavalry) :

১৭৮৭ সালে ক্লাইভ কর্তৃক আর্কট অবরোধের সময় ক্যাপ্টেন ডার্লে (Captain Darley) কর্তৃক মাদ্রাজী মুসলমান, মারাঠা ও রাজপুত সওয়ার নিয়ে পঞ্চম মাদ্রাজ ক্যাভল্‌রি নামে এক দল গঠিত হয়। সর্ব প্রথম মহীশুর রাজশক্তি অর্থাৎ হায়দার ও টিপুর বিরুদ্ধে ইংরাজের সংগ্রামে এই সওয়ার দল নিযুক্ত হয়। টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগত সৈনিক "ঢুঁড়িয়া বাঘ" কর্ণেল ওয়েলেস্‌লির (যিনি পরে ওয়াটারলু বিজয়ী ডিউক্ অব ওয়েলিংটন নামে পরিচিত হয়েছিলেন) বিরুদ্ধে এক বিরাট সওয়ার দল নিয়ে সংগ্রাম চালাতে থাকে। ঢুঁড়িয়া বাঘের বিরুদ্ধেও উক্ত ইংরাজগঠিত সওয়ার দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বর্তমানে এই সওয়ার ফৌজে দক্ষিণ ভারতীয় সৈনিক নেই, সবই পাঞ্জাব থেকে সংগৃহীত সৈনিক। ১৯১০ সালে এই ফৌজকে 'রাজা জর্জের লাইট ক্যাভাল্‌রি' আখ্যা দেওয়া হয়।

৯নং রয়্যাল ডেকান সওয়ার (Royal Deccan Horse) :

১৮৫৪ সালে হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট (Hyderabad Contingent)

নামে নিজামের একটি সওয়ার ফৌজ তৈরী হয়। এই ফৌজ নিজামেরই ফৌজ ছিল, কিন্তু এর গঠনকর্তা ছিল ইংরাজ। ইংরাজাশ্রিত নিজাম মারাঠার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজের পরিচালনাধীনে এই সওয়ার ফৌজ গঠন করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেণ্ট ইংরাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। ১৯০৩ সালে নিজামের এই ফৌজকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এবং তারপর থেকে এই ফৌজ 'ডেকান সওয়ার' (Deccan Horse) নামে পরিচিত হয়।

১০নং গাইড্‌স্ ক্যাভালরি (Guides Cavalry) :

১৮৪৬ সালে পেশোয়ারে এই সওয়ার ফৌজের প্রথম পত্তন হয়। লেফ্‌টেন্যাণ্ট লুম্‌স্‌ডেন (Lumsden)এই ফৌজের প্রথম পরিচালক। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ব্রিটিশবিরোধী শিখ সর্দার সামন্তদের নেতৃত্বে পরিচালিত খালসা ফৌজের বিরুদ্ধে ইংরাজ ফৌজকে যে সকল সংগ্রাম করতে হয় তার মধ্যে গাইড্‌স্ সওয়ার দল অংশ গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় দমনের প্রায় প্রত্যেক অভিযানে গাইড্‌স্ দল নিযুক্ত হয়ে এসেছে। ১৮৭৬ সালে গাইড্‌স্ সওয়ার দলকে নতুন উপাধি দেওয়া হয়—'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সীমান্ত ফৌজ' (Queen Victoria's Own Frontier Force)। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্বদেশের সৈনিক 'খাকি' রঙের উর্দি ধারণের যে প্রথা গ্রহণ করেছে, সেই প্রথার প্রবর্তক গাইড্‌স্ সওয়ার দল। গাইড্‌স্ দলই প্রথম খাকি উর্দি ধারণ করে। গাইড্‌স্ দলের প্রথম পরিচালক লেঃ লুম্‌স্‌ডেন 'খাকি' পরিচ্ছদ ধারণের প্রথা প্রথম প্রয়োগ করেন।

১১নং প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের সওয়ার ফৌজ (Prince Albert Victor's Own Cavalry) :

এই সওয়ার ফৌজ 'একাদশ সীমান্ত ফৌজ' নামেও পরিচিত। ইংরাজ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের পর পাঞ্জাব থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে পাঁচটি অরেগুলার সওয়ার দল গঠিত হয়। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সওয়ার দল দু'টি হলো বর্তমান প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের সওয়ার দলের পূর্বগোষ্ঠী। লর্ড কিচেনারের আমলে অর্থাৎ ১৯০২ সালে ভারতীয় ফৌজকে যখন এক দফা নতুন ক'রে ঢেলে সেজে পুনর্গঠন করা হয়, তখন এই প্রথম পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রি ও তৃতীয় পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রির নতুন নম্বর হয় যথাক্রমে ২১নং ও ২৩নং ক্যাভাল্‌রি।

এর মধ্যে ২৩নং পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রির একটি রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, ১৯১৪ সাল। ২৩নং ক্যাভাল্‌রি লাহোরে অবস্থান করছিল। তখন শিখ সমাজের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন আড়ালে আড়ালে চলছে। এই আন্দোলন বিখ্যাত গদর আন্দোলন নামে পরিচিত। গদর দল ২৩নং পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা সমস্ত ব্যাপার ধরে ফেলতে সমর্থ হয় এবং ১৯১৫ সালে ২৩নং ক্যাভাল্‌রির কয়েকজন সৈনিককে সামরিক আদালতে বিচার করার পর ফাঁসি দেওয়া হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভাবতীয় ফৌজে এই প্রথম ব্রিটিশ-বিরোধী এবং বিদ্রোহমূলক রাজনৈতিক ঘটনার নিদর্শন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ফাঁসির ব্যাপার হয়ে যাবার কয়েকদিন পরেই ২৩নং পাঞ্জাব সওয়ার দল বিশুদ্ধ ইংরাজভক্ত ফৌজরূপে মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে মনের সুখে যুদ্ধ করতে থাকে।

১২নং স্যাম ব্রাউনের সওয়ার দল (Sam Browne's Cavalry) :

এই সওয়ার দল দ্বাদশ সীমান্ত ফৌজ (12th Frontier Force) নামেও পরিচিত। ১৮৪৯ সালে বেঙ্গল পদাতিক বাহিনীর স্যাম ব্রাউন নামে জনৈক লেফ্‌টেন্যাণ্ট লাহোরে "দ্বিতীয় পাঞ্জাব ক্যাভাল্‌রি" নামে যে সওয়ার দল গঠন করেন, সেই সওয়ার দলেরই উত্তরগোষ্ঠী হলো বর্তমান দ্বাদশ সীমান্ত ফৌজ। স্যাম ব্রাউনের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁর নাম অনুসারে এই সওয়ার দলের নামকরণ হয়। স্যাম ব্রাউনের সওয়ারদল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। ১৮৬০ সালে মাসুদ উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন এই স্যাম ব্রাউনের মাথা থেকে সৈনিকের পরিধেয় সজ্জার একটি জিনিষ আবিষ্কৃত হয়—'স্যাম ব্রাউন বেণ্ট'। এই বেণ্ট বা পেটি আজ প্রত্যেক মিলিটারী অফিসারের অঙ্গে শোভা পায়। কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্যে এবং কেমন ক'রে এই বেণ্ট প্রচলিত হলো তার একটা ইতিহাস আছে। যুদ্ধ করতে গিয়ে স্যাম ব্রাউনের একটি হাত নষ্ট হয় এবং সেই কারণে তরবারি বহন করতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হতে থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি এমন এক ধরনের বেণ্ট তৈরী করলেন যার সঙ্গে তরবারি এবং পিস্তল উভয়ই ঝুলিয়ে রাখা যায় এবং স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা বা ঘোড়ায় ওঠা নামা করতে পারা যায়।

১৩নং ডিউক অব কনটের ল্যান্সার (Duke of Connaught's Own Lancers) :

১৮০৫ সালে লর্ড লেকের পরিচালিত অভিযানে কাজ করবার

জন্য বোম্বাইয়ে এই সওয়ার দল প্রথম তৈরী হয়। ১৮১৭ সালে এই দল দু'ভাগ হয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যাভাল্‌রি রূপে পরিণত হয়। ১৮৭৮ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত ডিসরেলি রাশিয়াকে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক সঙ্গতি ও জনবলের দাপট দেখাবার নীতি গ্রহণ করেন। য়ুরোপের বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইংরাজের কতখানি সামরিক জনবল আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে উক্ত বোম্বাই সওয়ার দলকে মাল্টা ও সাইপ্রাসে প্রেরণ করা হয়।

১৯০৩ সালে ডিউক অব কনটের নামে এই ল্যান্সার দলের নামকরণ হয়।

"In to the jaws of death
Rode the six hundred"

ইংরাজী কবিতার এই দুইটি লাইনের সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে। ছয়শত অশ্বারোহীর মরণমুখী সংগ্রামের এই কাহিনী বর্তমান পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে 'ব্যালাক্লাভা চার্জ' (Balaclava Charge) নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯১৭ সালে মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে ইস্‌তাবুলাত নামক স্থানে বিরাট সংখ্যক তুর্কী ফৌজের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় লান্সারের একটি ক্ষুদ্র সওয়ার দলের চার্জ ব্যালক্লাভা চার্জের চেয়েও দুঃসাহসিক শৌর্যের ঘটনা। মরণ নিশ্চিত জেনেও ভারতীয় ল্যান্সারের ক্ষুদ্র সওয়ার দল তুর্কী ফৌজকে চার্জ করে এবং এর ফলে প্রত্যেক সওয়ার ও অফিসার হয় নিহত, না হয় আহত হয়। এই ঘটনা ভারতীয় সওয়ারের 'ব্যালাক্লাভা' রূপে সামরিক বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে। এই ল্যান্সার দলে প্রথম দিকে মারাঠা সওয়ার গ্রহণ করা হতো, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই মারাঠাদের ভর্তি করার প্রথা উঠিয়ে

দেওয়া হয় এবং উত্তর ভারতীর শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান ইত্যাদি জাতের সওয়ার ভর্তি করা হয়।

১৪নং সিন্ধু সওয়ার দল (Scinde Horse) :

১৮৩৮ সালে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ হায়দ্রাবাদে একটি সওয়ার দল গঠন করেন। তখনও সিন্ধু প্রদেশ ইংরাজের অধিকারে আসেনি। সিন্ধু জয় করার জন্যই এই নতুন সওয়ার দল গঠিত হয়। সিন্ধুর সামন্ত 'মীর'দের মরুফৌজের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার চার্লস্‌ নেপিয়ারের ফৌজের যুদ্ধ সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সংঘর্ষে নবগঠিত 'সিন্ধু সওয়ার' দল অংশ গ্রহণ করে। সিন্ধু প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯২১ সালে সিন্ধু সওয়ার দলের নতুন উপাধি লাভ হয়—'প্রিন্স অব ওয়েলসের সওয়ার' (Prince of Wales Own Cavalry)।

১৫নং ল্যান্সার (15th Lancers) :

১৮৫৭ সালে রবার্ট নামে লণ্ডনের জনৈক ব্যাংক ব্যবসায়ী ভারতে এসে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। এরই পরিচালনাধীনে "একটি ১৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার" দল গঠিত হয়। রবার্ট নবাবী আড়ম্বরে জীবন যাপন করতেন এবং এক আফগান তরুণীকে বিবাহ করেন। আফগান প্রীতির বশে রবার্ট যত দুর্দান্ত উপজাতীয় আফগানকে এনে এই সওয়ার দলে ভর্তি করতে থাকেন। রবার্ট কোন হিসাব পত্র রাখতেন না, ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষকে তার জন্য কোন কৈফিয়ৎও দিতেন না। নিজের ইচ্ছামত সওয়ার দলের নিয়ম প্রণালীও তৈরী করতেন। ১৮৮১ সালে

* ১৮৩৮ বর্তমানে সিন্ধু প্রদেশের নাম ইংরাজীতে লেখা হয়—'Sindh', পূর্বে 'Scinde' বলা হতো।

এই সওয়ার দল উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সালে রুশিয়ার সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধের আসন্নতা দেখে আবার ১৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার দলকে তৈরী করা হয়। এইবার আর আফগান সওয়ার গ্রহণ করা হয় না, শুধু পাঞ্জাবী মুসলমান ও পাঠান সওয়ার গৃহীত হয়। ১৮৮৫ সালে সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে ৭নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি গঠিত হয়—যার নাম পরবর্তীকালে হয় ৩৭নং ল্যান্সার বা 'বেলুচ সওয়ার' দল। পরবর্তীকালে উল্লিখিত ১৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার ও ৩৭নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি (বেলুচ সওয়ার) নিয়ে সম্মিলিতভাবে ১৫নং ল্যান্সার দল হয়। ১৫নং ল্যান্সার দলের সামরিক কৃতিত্বের কোন ইতিহাস নেই। বিশেষ কোন যুদ্ধকার্যে এই দলকে যোগদান করতে হয়নি।

১৬ নং লাইট ক্যাভাল্‌রি (16th Light Cavalry) :

বর্তমান ভারতীয় সওয়ার ফৌজের ইতিহাসে এই ১৬নং লাইট ক্যাভাল্‌রি দলকে প্রাচীনতম দল বলা যেতে পারে। কর্ণাট প্রদেশে আর্কটের নবাবের ফৌজে ১৭৭৬ সালে এই দলের পত্তন হয়। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮০ সালে এই সওয়ার ফৌজকে নিজের পরিচালনায় নিয়ে আসেন এবং সেই সময় এই দলের নাম হয় '২নং মাদ্রাজ ক্যাভাল্‌রি'। পূর্বে দক্ষিণ ভারতের লোক এই দলে ভর্তি করা হতো। কিন্তু অনেকদিন আগেই সেই প্রথা উঠে গেছে। জাঠ ও রাজপুতেরাই বর্তমানে এই দলের সওয়ার। ভারতবর্ষের বাইরের কোন রণক্ষেত্রে এই দলকে যেতে হয়নি, একমাত্র আফগানিস্থান ছাড়া।

১৭নং পুনা সওয়ার ফৌজ (Poona Horse) :

অপর নাম হলো 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুনা সওয়ার'। ১৮১৭

সালে পুনাতে এই সওয়ার দলের সৃষ্টি হয়। পেশোয়া বাজীরাও নিজ রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে একটি চুক্তি করে; এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজ অফিসারের পরিচালনাধীনে এবং পেশোয়ার খরচে একটি সওয়ার দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পেশোয়া বাজিরাও ব্রিটিশের এই চুক্তিবদ্ধ সহযোগিতার অদ্ভুত মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। পুনার ইংরাজ রেসিডেণ্ট মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন (Mount Stuart Elphinstone) পেশোয়ার অর্থে প্রতিপালিত 'পুনা সওয়ার' দল নিয়ে কারকিতে পেশোয়ার ফৌজকেই আক্রমণ করেন। সেই থেকে এই সওয়ার দলটি ইংরাজের ভারতীয় ফৌজেরই একটি দলরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এই দলের নাম হয় '৪নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌রি'।

১৮২৯ সালে '৩নং বোম্বাই লাইট ক্যাভাল্‌রির সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত ৩নং এবং ৪নং সওয়ার দল পরবর্তীকালে যথাক্রমে '৩৩নং মহারাণীর লাইট ক্যাভাল্‌রি' এবং '৩৪নং প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের পুনা সওয়ার' আখ্যা লাভ করে। ১৯২১ সালে উভয় দল সম্মিলিত হয়ে 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুনা সওয়ার' (Queen Victoria's Own Poona Horse) নাম গ্রহণ করে।

১৮নং রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের ক্যাভাল্‌রি (Kings Edward V11's Own Cavalry):

১৮৪২ সালে ফতেগড়ে রিজার্ভ হিসাবে এই দলের প্রথম পত্তন হয়। তখন এর নাম ছিল '৮নং বেঙ্গল (অরেগুলার) ক্যাভাল্‌রি। কিছুদিন পরে '১৭নং বেঙ্গল (অরেগুলার) ক্যাভাল্‌রি' নামে আর একটি সওয়ার দল ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃক গঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঐ ৮নং দলের নাম হয় (৬নং 'প্রিন্স অব

ওয়েল্‌স্‌’) ‘ক্যাভাল্‌রি’ এবং ১৭নং দলের নাম হয় ‘৭নং (হারিয়ানা) ল্যান্সার’ দল। ১৯২১ সালে এই দুই দল এক হয়ে ‘রাজা এডোয়ার্ডের ক্যাভাল্‌রি’ নামে পরিচিত হয়।

১৯নং রাজা জর্জের ল্যান্সার (King George's Own Lancers) :

১৮৫৮ সালে ‘২নং মারাঠা সওয়ার’ নামে একটি দল গোয়ালিয়রে ইংরাজ কর্তৃক গঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর পাঞ্জাব থেকে একদল ‘তিওয়ানা সওয়ার’ এনে এই দলে যোগ করা হয় এবং তখন নাম হয় ১৮নং বেঙ্গল ক্যাভাল্‌রি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফেন (Fane) নামক অফিসারের উদ্যোগে একটি সওয়ার দল গঠন করা হয়, যার নাম হয় ১৯নং বেঙ্গল ল্যান্সার বা (Fanes Horse)। ১৯২১ সালে উল্লিখিত ১৮নং এবং ১৯নং সওয়ার দল উভয়ে একটি দলে পরিণত হয় এবং নাম হয়— ‘রাজা জর্জের ল্যান্সার’ দল।

এই দলের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনার কাহিনী উল্লিখিত আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ক্যাম্ব্রে নামক স্থানের রণক্ষেত্রে ১৮নং সওয়ার দলকে জার্মান পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। কিন্তু সওয়ার ফৌজ হিসাবে নয়। অবস্থার প্রয়োজনে ১৮নং দলকে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পদাতিক রূপে বিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় পদাতিক রূপেই এই দল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ভারতীয় সওয়ার দলকে পদাতিক রূপে যুদ্ধ করার এই প্রথম ঘটনা।

২০নং ল্যান্সার দল (20th Lancers) :

কোম্পানীর আমলেই ১৪নং বেঙ্গল ল্যান্সার (Murray's Jat Lancer) ও ১৫নং বেঙ্গল ল্যান্সার (Cureton's Multani)

নামে যে দু'টি সওয়ার দল গঠিত হয়েছিল, তারাই ১৯২১ সালে সম্মিলিত হয়ে ২০নং ল্যান্সার দল নামে পরিচিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় আলিগড়ে জাঠ সওয়ারদের নিয়ে মারে (Murray) নামক ইংরাজ অফিসারের উদ্যোগে যে দল গঠিত হয়, সেই দল পরে ১৪নং দল রূপে কোম্পানীর ফৌজে স্থান লাভ করে।

ইংরাজের ফৌজে এই প্রথম জাঠদের ভর্তি করা হয়। ক্যাপ্টেন কিওরটন (Cureton) ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ডেরাজাত জেলার মুলতানী পাঠান এবং বেলুচদের নিয়ে যে সওয়ার দল গঠন করেন, সেই দল পরে ১৫নং দল রূপে কোম্পানীর ফৌজে স্থান লাভ করে। ১৯২০ সালে উভয় দল সম্মিলিত হয়ে যায় এবং ২০নং ল্যান্সার দল রূপে ভারতীয় ফৌজে চিহ্নিত হয়।

২১ নং মধ্যভারত সওয়ার দল (Central India Horse) :

১৮৫৮ সালে ক্যাপ্টেন মেন (Mayne) নামক ইংরাজ অফিসারের উদ্যোগে একটি সওয়ার দল গঠিত হয়। মধ্যভারতের ইংরাজবিরোধী বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যেই এই নতুন দল তৈরী হয়েছিল। ফৌজসহ তাঁতিয়া টোপেকে পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ধরবার জন্য মেনের গঠিত সওয়ার দল বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়। ১৮৬০ সালে এই দল সরকারীভাবে 'মেনের সওয়ার' আখ্যা লাভ করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন মেনের ওপর এই সময় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কোন কারণে বিরূপ হয়ে উঠেন এবং ক্যাপ্টেন মেন ফৌজ থেকে অপসারিত হন। সওয়ার দলের নামও তখন বদলে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয়—মধ্যভারত সওয়ার দল। পরে এই দল দু'টি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্টে পরিণত হয়—১নং ও ২নং মধ্যভারত সওয়ার। তার পরে এই দুই রেজিমেণ্টের নাম পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে দাঁড়ায় ৩৮নং ও ৩৯নং মধ্যভারত সওয়ার। ১৯২১ সালে এই দুই এক হয়ে ২১নং মধ্যভারত সওয়ার

দলে পরিণত হয়। নতুন উপাধি হয়—রাজা জর্জের সওয়ার (King George's Horse)।

ভারতীয় ক্যাভাল্‌রি বা সওয়ার ফৌজের যে পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হলো, তাদের রণকীর্তির ইতিহাস সংক্ষেপেও বিবৃত না ক'রে মাত্র তাদের প্রধান রণকীর্তিগুলির নাম অতঃপর উল্লেখ করা গেল। বহু রণাঙ্গনে ও রণক্ষেত্রে ভারতীয় সওয়ার কাজ করেছে, তার তালিকা আরও বৃহৎ। মাত্র যে সব রণাঙ্গনের নাম কীর্তি-প্রতীক রূপে ভারতীয় সওয়ার ফৌজের বিভিন্ন দলীয় পতাকায় চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, তারই তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো। এই রণাঙ্গনের নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই ভারতীয় সওয়ার ফৌজের যুগব্যাপী ইতিহাসের বিরাটত্ব অনুমান করা যায়।

রণকীর্তির নামগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ফৌজী দলের পতাকায় স্থান লাভ করেছে। অতীতের যে দল যখনই নতুন নাম গ্রহণ করেছে, অথবা অন্যদলের সঙ্গে মিশে এক হয়েছে, তখনই সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দলের রণকীর্তির নামগুলিও সম্পত্তির মত বদ্‌লি করে দিতে হয়েছে।

ভারতবর্ষ :

যুদ্ধ	রণকীর্তি
(ক) মারাঠাবিরোধী যুদ্ধ	—কড়িগাঁও, মহারাজপুর, পুন্নিয়ার, মাহিদপুর
(খ) হায়দার-টিপুবিরোধী যুদ্ধ	—সেরিঙ্গাপট্টম, কর্ণাটিক, মহীশুর, সোলিনগড়
(গ) জাঠবিরোধী যুদ্ধ	—ভরতপুর
(ঘ) শিখবিরোধী যুদ্ধ	—পাঞ্জাব, মুদ্‌কি, ফিরোজশা, আলিওয়াল, সোবরাঁও,

মুলতান ১৮৪৮, গুজরাট ১৮৪৮

(ঙ) সিপাহীবিরোধী যুদ্ধ —দিল্লী ১৮৫৭, লক্ষ্ণৌ, মধ্যভারত। মুলতান ১৮৫৭-৫৮,

(চ) সিন্ধু অধিকার যুদ্ধ —মিয়ানি, হায়দ্রাবাদ, কাচ্ছি

(ছ) ভারত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উপজাতীয়বিরোধী যুদ্ধ —পাঞ্জাব সীমান্ত, সীমান্ত ১৯১৫, চিত্রল, মালাকান্দ —আহমেদ খেল, টিরা

বিদেশ

যুদ্ধ	রণকীর্তি
(ক) আফগানবিরোধী যুদ্ধ	—গজনী ১৮৩৯, ও ১৮৪২, আফগানি-স্থান ১৮৭৭-৮০, আফগানিস্থান ১৯১৯, কান্দাহার ১৮৪২, ও ১৮৮০, খেলাত, কাবুল ১৮৭৯ ও ১৮৪২, বেলুচিস্তান ১৯১৮, (আমানুল্লাবিরোধী যুদ্ধ), আলিমসজিদ, পেইবার কোটাল, চারাসিয়া,
(খ) চীনবিরোধী যুদ্ধ	—পিকিন ১৮৬০, পিকিন ১৯০০, চীন ১৯০০, টাকু ফোর্ট ১৮৫৯
(গ) বর্মাবিরোধী যুদ্ধ	—আরাকান, আভা, বর্মা ১৮৮৫-৮৭
(ঘ) পারস্যবিরোধী যুদ্ধ	—পারস্য ১৮৫৭, রেশায়ার, বুশায়ার, খুশাব।

(ঙ) মিশরবিরোধী যুদ্ধ —টেল-এল-কেবির ১৮৮২, মিশর ১৮৮২।

(চ) বোলশেভিকবিরোধী যুদ্ধ—মের্ভ (রুশিয়া), পারস্য ১৯১৫-১৯।

(ছ) প্রথম মহাযুদ্ধ। জার্মান-তুর্ক সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান (য়ুরোপ)—ফ্রান্স ও ফ্ল্যাণ্ডার্স ১৯১৪-১৮, লা বাসি ১৯১৪, গিভেঞ্চি ১৯১৪, নোভ চ্যাপেল, ফেষ্টুবার্ট ১৯১৫, সোম ১৯১৬, মোরভাল, ক্যাম্ব্রে ১৯১৭, মেগিডো, আরমাঁতিয়ের্স ১৯১৪।

(জ) ঐ (মধ্যপ্রাচ্য) —টেল-এল-কেবির, মিশর ১৯১৫, দামস্কাস, প্যালেস্টাইন ১৯১৮, টাইগ্রিস ১৯১৬, মেসোপটেমিয়া ১৯১৫-১৬, মেসোপটেমিয়া ১৯১৭ ১৯১৮, খাঁ বাগদাদি, কুত-অল আমারা ১৯১৫-১৭, বাগদাদ, শাইবা, টেসিফন, এডেন ১৯১৫, শরকত ১৯১৭, শারোন, ক্রেস কুর্সেলেত, ব্যাজেণ্টিন, ডেলভিল উড।

(ঝ) ঐ (পূর্ব আফ্রিকা) —পূর্ব আফ্রিকা ১৯১৭

(ঞ) আবিসিনিয়া বিরোধী যুদ্ধ —আবিসিনিয়া ১৮৬৭

(ট) সুদানবিরোধী যুদ্ধ —সুয়াকিন ১৮৮৫

১৯৩৮ সালে ভারতীয় সওয়ার ফৌজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সওয়ার ফৌজের দু'টি দলকে 'যন্ত্রোপেত' (mechanised) করেন। দীর্ঘকালের সমরবন্ধু ঘোড়া নামক জীবকে সওয়ার ফৌজ বা ক্যাভাল্‌রি থেকে বিদায় দেবার নীতি গৃহীত হয়। তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে প্রত্যেক ভারতীয় সওয়ার দল যন্ত্রোপেত হয়। ক্যাভাল্‌রি থেকে বিদায় নিলেও ঘোড়া এখনও বনিয়াদী বডি-গার্ড দলের মধ্যে তার বনিয়াদী স্থানটুকু অধিকার করে আছে।

ভারতীয় ইন্‌ফ্যান্ট্রি বা পদাতিক ফৌজ

সিপাহী বিদ্রোহে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বাহিনীর অধিকাংশ পদাতিক দল যোগদান করেছিল। অল্প কয়েকটি দল যারা বিদ্রোহী হয়নি, বিদ্রোহ অবসানের পর, ১৮৬১ সালে, বেঙ্গল বাহিনীকে পুনর্গঠন করার সময় এই কয়টি দলকেই নতুন ক'রে এক থেকে আরম্ভ করে পর পর ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়। এবিষয় পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুনর্গঠিত বেঙ্গল বাহিনীর সঙ্গে নম্বরের অনুক্রম রেখে পাঞ্জাবী মুসলমান, পাঠান ও শিখ প্রভৃতি উত্তর ভারতের জরুরী গঠিত দলগুলিকে যোগ করা হয়। এই ভাবে পুনর্গঠিত বেঙ্গল বাহিনীতে ৪৫টি পদাতিক দল হয়। কিন্তু এছাড়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বাহিনী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনী, পুরাতন পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট—এরা নিজ নিজ স্বতন্ত্র নম্বর (এক থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর নম্বর) নিয়েই অপরিবর্তিত থাকে।

১৮৯৫ সালে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি বাহিনীর আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা শেষ ক'রে দেওয়া হয়। তারপর ১৯০২-৩ সালে লর্ড কিচেনারের আমলে সমস্ত ভারতীয় ফৌজকে এক ক'রে ফেলা হয়। বেঙ্গল, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট—সকলকে একটানা ক্রমিক নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবস্থা হয়, প্রথমে থাকবে বেঙ্গল বাহিনীর দলগুলি, তারপর পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, তারপর মাদ্রাজ, তারপর হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট এবং সব শেষে বোম্বাই বাহিনীর দলগুলি। দেখা

যাচ্ছে যে বনিয়াদী কৌলীন্য বা বয়সের প্রাচীনত্ব অনুসারে মর্যাদা দেখে আর নম্বর দেবার ব্যবস্থা রইল না। অর্বাচীন দলগুলি স্থান পেল প্রথমে, এবং প্রাচীনতম দলগুলি দাঁড়ালো পেছনে। ভারতীয় ফৌজে উত্তর ভারতীয় লোকদের প্রাধান্য দেবার নীতি এবং ব্যবস্থা এইবার চরমভাবে পাকাপাকি হয়ে গেল। ১৯০২-৩ সালে ভারতীয় ফৌজের পদাতিক দলের পূর্ণ তালিকা লর্ড কিচেনার তৈরী করেন। সেই তালিকায় ১৩০টি পদাতিক দলের নাম পর্যায় ও নম্বর ক্রমানুসারে উল্লিখিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ কাল পর্যন্ত এই তালিকার সামান্যই নড়চড় করা হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র পদাতিক বাহিনীর জাতিগত চেহারা কি ছিল, তারও একটা পরিচয় পাওয়া দরকার। সমর দপ্তরের ১৯১১ সালের বিবরণী অনুসারে যে তালিকাটি পাওয়া যায়, তাই উধৃত হলো :

৪১টি পাঞ্জাবী ব্যাটালিয়ন, জাত-কোম্পানী পদ্ধতিতে গঠিত। জাতগুলি হলো—পাঞ্জাবী মুসলমান, শিখ, পাঠান এবং ডোগ্‌রা।

৯টি শিখ ব্যাটালিয়ন-এর মধ্যে তিনটি ব্যাটালিয়ন হলো মজ্‌বি শিখ।

৩টি ডোগ্‌রা ব্যাটালিয়ন

২টি ব্রাহ্মণ জাত ব্যাটালিয়ন

৭টি রাজপুত ব্যাটালিয়ন

২টি জাঠ (হিন্দু) ব্যাটালিয়ন

২৮টি সাধারণ জাত-কোম্পানীর ব্যাটালিয়ন, অধিকাংশ পাঞ্জাবের বিভিন্ন জাত।

৬টি সম্পূর্ণ মুসলমান ব্যাটালিয়ন। তিনটি পাঞ্জাবী মুসলমান, তিনটি পাঞ্জাব ও সীমান্ত মুসলমানে মিশ্রিত।

৬টি মারাঠা ব্যাটালিয়ন, সকলেই মারাঠা, তবে প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে ২টি করে দেকানি মুসলমানের কোম্পানী।

১টি হাজারা (আফগান) ব্যাটালিয়ন

২টি গাড়োয়ালা রেজিমেণ্ট

১১টি কর্ণাটী ব্যাটালিয়ন (হিন্দু ও মুসলমান)

২০টি গুর্খা ব্যাটালিয়ন

এই তালিকার দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয়না যে লর্ড কিচেনারও কিভাবে হিন্দুবর্জন নীতি সার্থক করেছিলেন। উক্ত তালিকার ১২টি ব্যাটালিয়ন হলো পাইওনীয়ার (বোঝাবাহক মজুর ফৌজ) ব্যাটালিয়ন, যার অধিকাংশ হলো নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। এবং ২০টি গুর্খা দলের সৈনিকেরা বর্তমান ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অর্থে ঠিক ভারতীয় হিন্দু নয়। সুতরাং প্রকৃত অস্ত্রধারী লড়িয়ে ভারতীয় হিন্দু পদাতিকের সংখ্যা ভারতীয় মুসলমান অস্ত্রধারী পদাতিকের তুলনায় কত কম করা হয়, সে তথ্য তালিকাটিই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

ভারতীয় পদাতিক দল (১৯০৩—১৪)

এই তালিকা থেকে ২০টি গুর্খা ব্যাটালিয়ন বাদ দিয়ে গণন ক'রলে দেখা যায় যে, ১৯১১ সালে মোট ১১৮টি যথার্থ 'ভারতীয়' ব্যাটালিয়ন ছিল।

এই ১১৮টি ব্যাটালিয়নের নাম নম্বর ও পর্যায়ক্রম কি ছিল তা'ও এই প্রসঙ্গে জানা দরকার।

১৯০৩ সালে লর্ড কিচেনার যে ১৩০টি ভারতীয় পদাতিক দলকে এক 'লাইনে' ক্রমিক নম্বর অনুসারে তালিকাভুক্ত করেছিলেন তার মধ্যে ১০টি নম্বরগত স্থান শূন্য রাখা হয়েছিল। [যথা—

৪২, ৫০, ৬০, ৬৮, ৭০, ৮৫, ১০০, ১১১, ১১৫ ও ১১৮নং]
তা ছাড়া, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ৪টি ব্যাটালিয়নকে (৬৫নং কর্ণাটিক, ৭১নং কুর্গ, ৭৭নং মোপ্‌লা ও ৭৮নং মোপ্‌লা) উঠিয়ে দেওয়ার ফলে আরও ৪টি নম্বরগত স্থান শূন্য হয়। পূর্ণ তালিকার ১৩০টি দলের মধ্যে এই ভাবে ১৪টি স্থান শূন্য থাকায় ১৯১১ সালে নাম ও নম্বর অনুসারে দলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬টি। কিন্তু ব্যাটালিয়ন হিসাবে ধর'লে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮; কারণ তালিকাভুক্ত গাড়োয়ালী রেজিমেণ্ট ছিল ২টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত, এবং 'গাইড্‌স্‌' নামে একটি ব্যাটালিয়ন ছিল যার কোন নম্বর দেওয়া হয়নি। ১১৬টি ব্যাটালিয়ন এবং এই অতিরিক্ত ২টি ব্যাটালিয়ন, মোট ১১৮টি ব্যাটালিয়ন।

মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই তালিকাই অক্ষুন্ন থাকে।

এক কম্যাণ্ডের অধীনে এবং এক লাইনে প্রথম সজ্জীকৃত সেই ভারতীয় ফৌজের পদাতিক দলের তালিকাটি নিম্নে উধৃত হলো:

বেঙ্গল বাহিনীর পদাতিক দল

১নং ব্রাহ্মণ
২নং রাজপুত
৩নং ব্রাহ্মণ
৪নং রাজপুত
৫নং লাইট ইনফ্যান্ট্রি
৬নং জাঠ লাইট ইনফ্যান্ট্রি
৭নং রাজপুত
৮নং রাজপুত
৯নং ভোপাল

১০নং জাঠ
১১নং রাজপুত
১২নং পাইওনিয়ার (খেলাত-ই-গিলজাই)
১৩নং রাজপুত (শেখাবাটি)
১৪নং ফিরোজপুর শিখ
১৫নং লুধিয়ানা শিখ
১৬নং রাজপুত (লক্ষ্ণৌ)
১৭নং পদাতিক (বেঙ্গল বাহিনীর একটি ইংরাজভক্ত দল)
১৮নং পদাতিক
১৯নং পাঞ্জাবী
২০নং ”
২১নং ”
২২নং ”
২৩নং শিখ পাইওনিয়ার
২৪নং পাঞ্জাবী
২৫নং ”
২৬নং ”
২৭নং ”
২৮নং ”
২৯নং ”
৩০নং ”
৩১নং ”
৩২নং শিখ পাইওনিয়ার
৩৩নং পাঞ্জাবী
৩৪নং শিখ পাইওনিয়ার

৩৫নং শিখ

৩৬নং ”

৩৭নং ডোগ্‌রা

৩৮নং ”

৩৯নং গাড়োয়াল (২টি ব্যাটালিয়ন)

৪০নং পাঠান

৪১নং ডোগ্‌রা

৪২নং দেওলি রেজিমেণ্ট

৪৩নং এরিনপুরা ”

৪৪নং মারোয়াড়া

৪৫নং র‍্যাট্রের শিখ (Rattray's Sikh)

৪৬নং পাঞ্জাবী

৪৭নং শিখ

৪৮নং পাইওনিয়ার

৪৯নং (?)

৫০নং (?)

পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পদাতিক দল।

৫১নং শিখ

৫২নং ”

৫৩নং ”

৫৪নং ”

মহারাণীর গাইড্‌স্ দল (Queen's Own Corps of Guides)

৫৫ নং কুক'এর রাইফেল (Coke's Rifles)

৫৬ নং পদাতিক

৫৭ নং ওয়াইল্‌ডের রাইফেল (Wilde's Rifles)
৫৮ নং ভন-এর রাইফেল (Vaughan's Rifles)
৫৯ নং সিন্ধু রাইফেল
৬০ নং (?)

মাদ্রাজ বাহিনীর পদাতিক দল

৬১ নং (মাদ্রাজ) পাইওনিয়ার
৬২ নং পাঞ্জাবী
৬৩ নং পালমকোটা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি
৬৪ নং পাইওনিয়ার
৬৫ নং (?)
৬৬ নং পাঞ্জাবী
৬৭ নং ,,
৬৮ নং (?)
৬৯ নং পাঞ্জাবী
৭০ নং (?)
৭১ নং (?)
৭২ নং পাঞ্জাবী
৭৩ নং কর্ণাটিক
৭৪ নং পাঞ্জাবী
৭৫ নং কর্ণাটিক
৭৬ নং পাঞ্জাবী
৭৭ নং (?)
৭৮ নং (?)
৭৯ নং কর্ণাটিক

৮০ নং কর্ণাটিক
৮১ নং পাইওনিয়ার
৮২ নং পাঞ্জাবী
৮৩ নং ওয়াল্লাজবাদ পদাতিক
৮৪ নং পাঞ্জাবী
৮৫ নং (?)
৮৬ নং কর্ণাটিক
৮৭ নং পাঞ্জাবী
৮৮ নং কর্ণাটিক
৮৯ নং পাঞ্জাবী
৯০ নং ”
৯১ নং ”
৯২ নং ”
৯৩ নং বর্মা ইন্‌ফ্যান্ট্রি

হায়দরাবাদ কন্টিনজেন্টের পদাতিক দল

৯৪ নং রাসেল'এর ইন্‌ফ্যান্ট্রি (Russells' Infantry)
৯৫ নং ” ”
৯৬ নং বেরার পদাতিক
৯৭ নং ডেক্যান ”
৯৮ নং পদাতিক (হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট)
৯৯ নং ডেক্যান পদাতিক (হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট)
১০০ নং (?)

বোম্বাই বাহিনীর পদাতিক দল

১০১ নং গ্রেনেডিয়ার

১০২ নং গ্রেনেডিয়ার
১০৩ নং মারাঠা লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি
১০৪ নং ওয়েলেস্‌লির রাইফেল (Wellesley's Rifles)
১০৫ নং মারাঠা লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি
১০৬ নং হাজারা পাইওনিয়ার
১০৭ নং পাইওনিয়ার
১০৮ নং পদাতিক
১০৯ নং ”
১১০ নং মারাঠা লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি
১১১ নং (?)
১১২ নং পদাতিক
১১৩ নং ”
১১৪ নং মারাঠা
১১৫ নং (?)
১১৬ নং মারাঠা
১১৭ নং ”
১১৮ নং (?)
১১৯ নং মুলতান
১২০ নং রাজপুতানা
১২১ নং পাইওনিয়ার
১২২ নং রাজপুতানা
১২৩ নং আউটরামের রাইফেল (Outram's Rifles)
১২৪ নং বেলুচিস্তান
১২৫ নং নেপিয়ারের রাইফেল (Napier's Rifles)
১২৬ নং বেলুচিস্তান

১২৭ নং বেলুচ লাইট ইন্‌ফ্যাণ্টি
১২৮ নং পাইওনিয়ার
১২৯ নং বেলুচি
১৩০ নং ”

উক্ত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে, মাদ্রাজী সিপাহীর প্রতি অমর্যাদার ব্যাপারটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বনিয়াদী মাদ্রাজী পদাতিক দলগুলিকে পাঞ্জাবী দলে পরিণত করার ব্যাপার। বর্মা পদাতিক নামে আখ্যাত দলগুলিও প্রথমে মাদ্রাজী সৈনিকে গঠিত ছিল। বর্মা অভিযানের জন্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বাহিনীতে এই পদাতিক দলগুলি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশের ভারত ও বর্মা জয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই পদাতিক ফৌজ থেকে মাদ্রাজীদের (বিশেষ করে মাদ্রাজী হিন্দু) সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবী সিপাহী গ্রহণ করা হয়। শুধু কর্ণাটিক দলগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানদের রাখা হয়। মাদ্রাজীরা মাত্র পাইওনিয়ার দলগুলিতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন এবং মহাযুদ্ধ চলতে থাকা কালে (১৯১৪-১৮) ব্যস্ততার সঙ্গে অনেকগুলি নতুন পদাতিক দল গঠন করা হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর, আবার এই নতুন দলগুলি প্রায় সকলকেই ভেঙে দেওয়া হয়, নতুন দলের মধ্যে সামান্য সংখ্যক কয়েকটি দল স্থায়ীভাবে ভারতীয় ফৌজে থেকে যায়।

পুরাতন ‘বেঙ্গল বাহিনীর’ পদাতিক দলগুলির শেষ দলটির নম্বর এই সর্ব ভারতীয় তালিকায় ৪৮ নং বলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর প্রথম, বাঙালী সৈনিক নিয়ে একটি পদাতিক দল গঠিত হয় এবং তার নাম হয় “৪৯নং বাঙালী”। যুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পর এই দল ভেঙে দেওয়া হয়। ৪৯নং বাঙালী

দলকে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল। কুমায়ুনীদের নিয়ে ৫০নং দলটি গঠিত হয়। ৭০নং ও ৮৫নং এর শূন্য স্থান দু'টি নবগঠিত বর্মী দল (বর্মা রাইফেল্) দ্বারা পূর্ণ করা হয়। ৭১নং একটি পাঞ্জাবী দল হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর পদাতিক দলগুলি থেকে মারাঠাদেরও অনেকদিন আগে থেকে সরিয়ে দিয়ে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের ভর্তি করা হচ্ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারাঠাদের বহু সংখ্যায় ভর্তি করা হতে থাকে এবং তারা স্থায়ীভাবে ভারতীয় ফৌজে স্থান পেয়ে গেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেমন প্রথম বাঙালীদের নিয়ে একটি পদাতিক দল গঠন করা হয়, তেমনি আর একটি সমাজকে এই সময় ভারতীয় ফৌজে সেনাদল হয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। অস্পৃশ্য হিন্দু 'মহর' সমাজের লোক নিয়ে ১১১নং পদাতিক দল গঠিত হয়।

দেখা যাচ্ছে যে, তালিকায় উল্লিখিত ১৪টি নম্বরগত শূন্য স্থানের ৬টি স্থান নবগঠিত রেজিমেণ্ট দ্বারা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পূর্ণ করা হয়। বাকী ৮টি নম্বরগত শূন্য স্থান (৬০, ৬৫, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ১০০, ১১৫ ও ১১৮নং) শূন্যই প'ড়ে থাকে।

কিন্তু তালিকার ভেতরের দিকে ঐ আটটি নম্বরগত স্থান শূন্য প'ড়ে থাকলেও তালিকার শেষ নম্বরের (১৩০নং) পর নতুন নম্বর দিয়ে অনেকগুলি দল গঠিত হয়। দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত ব্যাটালিয়ন এবং নবগঠিত ব্যাটালিয়ন নিয়ে বহু নতুন পদাতিক রেজিমেণ্ট গঠিত হয় এবং তাদের নম্বর হয় ১৩১ থেকে আরম্ভ ক'রে যথাক্রমে ১৫৬ পর্যন্ত। অস্থায়ীভাবে তালিকাভুক্ত ও নম্বর প্রাপ্ত এই দলগুলি যুদ্ধান্তে ভেঙে দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের

পূর্বে ভারতীয় পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির সবই এক-ব্যাটালিয়ন রেজিমেণ্ট ছিল, শুধু গাড়োয়ালী রেজিমেণ্ট ছাড়া। গাড়োয়ালী রেজিমেণ্ট দুই-ব্যাটালিয়নে গঠিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় বহু স্থায়ী এবং অস্থায়ী রেজিমেণ্টের একাধিক ব্যাটালিয়ন তৈরী করা হয়। তবে কোন রেজিমেণ্টের জন্যই তিনটি ব্যাটালিয়নের অধিক ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়নি।

বহুকাল থেকে নিষিদ্ধ 'পুরবিয়া' সিপাহীকে নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একটি পদাতিক দল গঠিত হয়—১৩১নং যুক্তপ্রদেশ রেজিমেণ্ট। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে যুক্তপ্রদেশের হিন্দুকে ফৌজে গ্রহণ না করার নীতিই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। যাই হউক, এই মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন উদারতা দেখালেও, সেটা স্থায়ী হয়নি। যুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পরেই বাঙালী দল ও যুক্তপ্রদেশ দল ভেঙে দেওয়া হয়। তথাকথিত 'সামরিক জাতিদের' দ্বারাই ভারতের স্থায়ী পদাতিক দলগুলি ভর্তি হয়ে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ১৯২১ সালে ভারতীয় পদাতিক দলগুলিকে আর একবার নতুন ক'রে গঠন করা হয়। এবং পদাতিক দলের পূর্বনম্বরগুলি বদলে যায়। প্রকৃত রেজিমেণ্টীয় পদ্ধতিতে এইবার ভারতীয় পদাতিক দলগুলিকে সংবদ্ধ করা হয়। ৬টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে এক একটি রেজিমেণ্ট গঠিত হয়, এর মধ্যে একটি ব্যাটালিয়নকে ট্রেনিং দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। ট্রেনিং ব্যাটালিয়নগুলিকে '১০নং' চিহ্ন দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৬টি ব্যাটলিয়নের নম্বর পড়লো ১ থেকে ৫, এবং একটির নম্বর পড়লো ১০। সুতরাং ৬, ৭, ৮, ৯,—এই চারটি নম্বর শূন্য পড়ে রইল। ব্যবস্থা হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন জরুরীগঠিত এবং যুদ্ধকার্যের জন্য

অস্থায়ীভাবে গঠিত ব্যাটালিয়নগুলিকে এই চারটি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে।

১৯২৩ সালে এবং ১৯৩২ সালে পদাতিক দলের মধ্যে আরও কতগুলি রদবদল করা হয়। ১৯৩২ সালে পাইওনিয়ার দলগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। এইভাবে পুনর্গঠিত হয়ে এসে ১৯৩৯ সালে, ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে আমরা ১৯টি পদাতিক রেজিমেণ্ট (প্রত্যেকের ৬টি ব্যাটালিয়ন) রূপে গঠিত ভারতীয় পদাতিক ফৌজকে দেখতে পাই, আর দেখতে পাই ১০টি গুর্খা রেজিমেণ্ট

গুর্খা রেজিমেণ্টের নম্বর স্বতন্ত্র, ১ থেকে আরম্ভ ক'রে ১০ পর্যন্ত। প্রত্যেক গুর্খা রেজিমেণ্টের ব্যাটালিয়ন ২টি করে; ১৯০৩ সালে, ১৯১৪ সালে, এবং ১৯২১ সালে এবং ১৯৩৯ সালে গুর্খা রেজিমেণ্টের নাম ও নম্বর বরাবরই অপরিবর্তিত থাকে। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মাত্র একটি অতিরিক্ত গুর্খা রেজিমেণ্ট (১১নং) অস্থায়ীভাবে তৈরী করা হয়েছিল।

ভারতীয় পদাতিক ফৌজ বার বার পুনর্গঠিত হয়ে, আধুনিক-কালে সুসংবদ্ধ কয়েকটি রেজিমেণ্টে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির পেছনে বহু দিনের ভাঙা-গড়া, সংমিশ্রণ ও সম্মেলনের ঘটনা রয়েছে। এই ইতিহাস এক যুগ ধরে নতুন নতুন সেনাদল গঠন, সৈনিক সংগ্রহ, সৈনিক ট্রেনিং ও সংগঠনের ইতিহাস।

আধুনিককালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত নিম্নোক্ত ১৮টি ভারতীয় পদাতিক ফৌজ আমরা দেখতে পাই। ফৌজী কৌলীন্যের ক্রম অনুসারে সমরবিভাগের তালিকায় পদাতিক ফৌজের নাম পর পর যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, সেই ক্রম অনুসারে সুপরিণত ভারতীয় পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির নাম দেওয়া গেল :

রেজিমেণ্টের তালিকা ১৯২২-৩৯ :

ভারতীয় রেজিমেণ্ট

১ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট
২ নং " "
৩ নং (?)
৪ নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার
৫ নং মারহাট্টা লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি
৬ নং রাজপুতানা রাইফেল
৭ নং রাজপুত রেজিমেণ্ট
৮ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট
৯ নং জাঠ রেজিমেণ্ট
১০ নং বেলুচ রেজিমেণ্ট
১১ নং শিখ রেজিমেণ্ট
১২ নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট
১৩ নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেল
১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট
১৫ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট
১৬ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট
১৭ নং ডোগ্‌রা রেজিমেণ্ট
১৮ নং গাড়োয়াল রাইফেল
১৯ নং হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট

গুর্খা রেজিমেণ্ট

১ নং গুর্খা রাইফেল (রাজা জর্জের রাইফেল)

২ নং গুর্খা রাইফেল (রাজা এডোয়ার্ডের রাইফেল)
৩ নং গুর্খা রাইফেল (রাণী আলেকজান্দ্রার রাইফেল)
৪ নং গুর্খা রাইফেল (প্রিন্স অব ওয়েলসের রাইফেল)
৫ নং গুর্খা রাইফেল
৬ নং গুর্খা রাইফেল
৭ নং গুর্খা রাইফেল
৮ নং গুর্খা রাইফেল
৯ নং গুর্খা রাইফেল
১০ নং গুর্খা রাইফেল

ভারতীয় পদাতিক দলের প্রথম তালিকা (১৯০৩-১৪) এবং ভারতীয় রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় তালিকা (১৯২২-৩৯), এই দু'টি তালিকা পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, কিভাবে এবং কোন্ প্রথায় আধুনিক পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি পরিণত হয়েছে। *

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম তালিকার পদাতিক দলগুলিকে এক একটি 'ব্যাটালিয়ন' রূপে গণ্য ক'রে নিয়ে ১৯২২ সালে ৫টি ব্যাটালিয়নের এক একটি সম্মিলিত দল গঠিত হয়। পাঁচ ব্যাটালিয়নে গঠিত এই এক একটি সম্মিলিত পদাতিক দল হলো এক একটি পদাতিক রেজিমেণ্ট (১৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে রেজিমেণ্টভুক্ত হবার সময় প্রথম তালিকার পদাতিক দলগুলি নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন নম্বর গ্রহণ করে।

একটু ব্যাখ্যা ক'রে বিষয়টা বিবৃত করা যাক্। দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্রথম তালিকার ২নং, ৪নং, ৭নং, ৮নং, ১১নং ও ১৬নং রাজপুত পদাতিক

* পদাতিক রেজিমেণ্টের নম্বরগুলি হ'লো ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত ; কিন্তু মধ্যে ৩নং রেজিমেণ্ট ব'লে কিছু ছিল না; এই স্থান শূন্য পড়ে থাকে।

গুলির পরিণাম বিচার করা যাক্। ১৯০৩-১৪ সালের এই দলগুলি ১৯২২ সালে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন রূপে একটি সম্মিলিত দলে গঠিত হয়। এই সম্মিলিত দলের নাম হয় ৭নং রাজপুত রেজিমেণ্ট (১৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এইভাবে রেজিমেণ্টে পরিণত হবার সময় পদাতিক দলগুলির পুরাতন নম্বর বদলে গেল। ২নং রাজপুত হয় ১নং ব্যাটালিয়ন, ৪নং রাজপুত হয় ২নং ব্যাটালিয়ন এবং ৭নং, ৮নং, ১১নং ও ১৩নং রাজপুত পদাতিক দল যথাক্রমে ৩নং, ৪নং, ৫ং ও ১০নং ব্যাটালিয়ন।

উক্ত দু'টি তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে আরও বোঝা যায় কি প্রকারে আধুনিক জাঠ রেজিমেণ্ট, শিখ রেজিমেণ্ট, ডোগ্‌রা রেজিমেণ্ট ইত্যাদি রেজিমেণ্টগুলি গঠিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রথম তালিকার পাঞ্জাবী পদাতিক দলগুলি নিয়ে পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, জাঠ পদাতিক দলগুলি নিয়ে জাঠ রেজিমেণ্ট, ডোগ্‌রা পদাতিক দলগুলি নিয়ে ডোগ্‌রা রেজিমেণ্ট গঠিত হয়।

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেণ্টের নাম দেখে তাকে সম্পূর্ণ ঐ জাতের ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেণ্ট বলে ধারণা করলে ভুল হবে। রাজপুত ব্যাটালিয়নে বা রেজিমেণ্ট সব সৈনিক রাজপুত নয়। বর্তমানে জাত হিসাবে গঠিত বিশুদ্ধ ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেণ্ট খুব অল্প আছে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাজপুত রেজিমেণ্টের অধিকাংশই রাজপুত (হিন্দু), শিখ রেজিমেণ্টের অধিকাংশই শিখ, পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অধিকাংশই পাঞ্জাবী মুসলমান। প্রায় সব রেজিমেণ্ট সম্পর্কে এই মন্তব্য করা যেতে পারে। প্রধান রেজিমেণ্টগুলির কোন্‌টিতে কোন্ পদাতিক দলকে স্থান দেওয়া হয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়া হলো :

(ক) ১নং, ২নং, ৮নং, ১৪নং, ১৫নং ও ১৬নং—ভারতীয় ফৌজের এই কয়টি রেজিমেন্ট পাঞ্জাব রেজিমেন্ট নামে পরিচিত। তালিকায় উল্লিখিত 'পাঞ্জাবী' পদাতিক দলগুলিকে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন রূপে নিয়ে এই ছয়টি পাঞ্জাব রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছে। তাছাড়া তালিকায় উল্লিখিত, 'পাঠান', ১নং 'ব্রাহ্মণ,' 'বর্মা পদাতিক' 'ভোপাল পদাতিক', নামে পরিচিত দলগুলি পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়

(খ) ১১নং শিখ রেজিমেন্ট—তালিকায় উল্লিখিত শিখ পদাতিক দলগুলি নিয়ে বর্তমান ১১নং শিখ রেজিমেন্ট গঠিত।

(গ) ১২নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট—তালিকায় উল্লিখি পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের শিখ পদাতিক দলগুলিকে নিয়ে ১২ন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছে। এছাড়া 'মহারাণীর গাইড্ দল'ও এর মধ্যে স্থান লাভ করে।

(ঘ) ১৩নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল—উক্ত তালিকা উল্লিখিত পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের বিভিন্ন রাইফেল দল ও অন্যা দলগুলিকে নিয়ে ১৩নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল গঠিত হয়।

(ঙ) ১৭নং ডোগরা রেজিমেণ্ট—তালিকায় উল্লিখিত বিভি ডোগ্রা পদাতিক দলগুলিকে নিয়ে ১৭নং ডোগ্রা রেজিমে গঠিত হয়।

(চ) ৬নং রাজপুতানা রাইফেল—তালিকায় উল্লিখি বিভিন্ন 'রাজপুতানা' পদাতিক এবং ১৩নং রাজপুত (শেখাবাটি দলকে নিয়ে ৬ নং রাজপুতানা রাইফেল গঠিত হয়। এছা প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর ১০৪নং, ১২৫ ১২৩নং দল।

(ছ) ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল—তালিকায় উল্লিখি গাড়োয়াল রাইফেল দল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নবগঠি

কয়েকটি গাড়োয়ালী পদাতিক দল নিয়ে ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল গঠিত।

(জ) ৭নং রাজপুত রেজিমেণ্ট— তালিকায় উল্লিখিত 'রাজপুত' পদাতিক দলগুলি নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত।

(ঝ) ৯নং জাঠ রেজিমেণ্ট—তালিকায় উল্লিখিত 'জাঠ' পদাতিক দলগুলি নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত। প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সী দলের ১১৯নং (মূলতানি) দল এই রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঞ) ৪নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার—তালিকায় উল্লিখিত প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর ১০১নং গ্রেনেডিয়ার এবং ১০৮নং, ১০৯নং, ১১২নং ও ১১৩নং পদাতিক নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত।

(ট) ৫নং মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি—তালিকায় উল্লিখিত প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর 'মারাঠা' পদাতিক দলগুলি নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত।

(ঠ) ১০নং বেলুচ রেজিমেণ্ট—তালিকায় উল্লিখিত ১২৪নং, ১২৬নং, ১২৭নং, ১৩০নং ইত্যাদি বেলুচিস্তান ও বেলুচি দল এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে নবগঠিত একটি বেলুচিস্তান পদাতিক দল নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত।

(ড) ১৯নং হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট—তালিকায় উল্লিখিত প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্টের দলগুলি (৯৪নং ও ৯৫নং রাসেলের দল, ৯৬নং বেরার, ৯৭নং ডেক্যান এবং ৯৮নং পদাতিক) নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত।

উল্লিখিত প্রধান ১৯টি ভারতীয় রেজিমেণ্ট হলো 'যোদ্ধা' রেজিমেণ্ট। তালিকায় বহু 'পাইওনিয়ার' দলের নাম উল্লেখ দেখা

যায়। পাইওনিয়ার দলগুলি স্বতন্ত্রভাবে 'অযোদ্ধা' পদাতিক দল রূপে থাকে।

এ ছাড়া তালিকায় আরও বহু পদাতিক দলের নাম পাওয়া যাচ্ছে যারা পরবর্তীকালে রেজিমেণ্টভুক্ত হয়নি। এই সব দলকে ভেঙে দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো কর্ণাটি পদাতিক দল। বহু কৃতিত্বের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এই বনিয়াদী দলকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত ভেঙে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটি পদাতিক দল ছিল, তারপর ১৯২১ সালে এর নাম পরিবর্তন ক'রে '৩নং মাদ্রাজ' রেজিমেণ্ট করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ৩নং মাদ্রাজ রেজিমেণ্টেকে, একটি সুদীর্ঘকালের বনিয়াদী পদাতিক ফৌজকে, ভেঙে দেওয়া হয়।

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের এই ইতিহাসের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের একটি নীতির প্রক্রিয়া স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে যায়। 'মাদ্রাজ' ও 'বেঙ্গল'—এই দু'টি নামকে ফৌজ থেকে নির্বাসিত করা। অথচ 'মাদ্রাজ' ও 'বেঙ্গল' প্রেসিডেন্সী বাহিনীই হলো দু'টি বনেদী বাহিনী। যে বাহিনীর সহায়তায় ব্রিটিশ প্রথম সামাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে, পরে সে দু'টি বাহিনীকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। 'বেঙ্গল' ও 'মাদ্রাজ' বাহিনীর বহু রণকীর্তির প্রতীক চিহ্ন আজ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের পতাকায় শোভা পাচ্ছে। বনিয়াদী বাহিনীর মধ্যে একমাত্র 'বোম্বাই'য়ের নামটা আজও নাম হিসাবে বেঁচে আছে একটি রেজিমেণ্টের মধ্যে—৪নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার।

টেরিটোরিয়াল দল

১৯২১ সালে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ভারতের 'জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের' উদ্দেশ্যে কতগুলি টেরিটোরিয়াল দল

গঠন করেন। প্রধান রেজিমেণ্টগুলির ১০নং ব্যাটালিয়নগুলিকে ট্রেনিং দেবার ব্যাটালিয়ন রূপে রাখা হয়, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। তেমনি প্রধান রেজিমেণ্টগুলির কয়েকটির মধ্যে নতুন ক'রে এক একটা ১১নং ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। এই ১১নং ব্যাটালিয়নগুলি 'টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়ন' রূপে পৃথক শিবির গ্রহণ করে।

১৯২১-২২ সালে যে যে রেজিমেণ্টের ১১নং ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি ক'রে টেরিটোরিয়াল দল হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়, তার তালিকা নিম্নে উধৃত হলো :

রেজিমেণ্ট	ব্যাটালিয়ন	শিবির
(১) ১নং পাঞ্জাব	১১নং	ঝেলাম
(২) ৪নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার	১১নং	আজমীর
(৩) ৫নং মারাঠা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি	১১নং	বেলগাঁও
(৪) ৭নং রাজপুত	১১নং	ফয়জাবাদ
(৫) ৯নং জাঠ	১১নং	বেরেলি
(৬) ১২নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স	১১নং	নওশেরা
(৭) ১৩নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স	১১নং	ক্যাম্বেলপুর
(৮) ১৪নং পাঞ্জাব	১১নং	গুরগাঁও
(৯) ১৫নং পাঞ্জাব	১১নং	আম্বালা
(১০) ১৭নং ডোগরা	১১নং	ধরমশালা
(১১) ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল	১১নং	ল্যান্সডাউন

ভারতীয় সওয়ার ফৌজের রণকীর্তির যে তালিকা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেটা সমগ্রভাবে ভারতীয় পদাতিকের রণকীর্তি রূপে প্রযোজ্য। ঐ তালিকায় উল্লিখিত রণকীর্তির প্রত্যেকটি নাম

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের পতাকায় চিহ্নিত আছে, কারণ ঐ প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে ভারতীয় পদাতিকও যোগ দিয়েছিল এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। তাছাড়া, ভারতীয় পদাতিকের আরও কতগুলি রণকীর্তি আছে, যা ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নেই। ভারতীয় পদাতিকের সেই অতিরিক্ত রণকীর্তির নামগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো।

যুদ্ধ	রণকীর্তি
ত্রিবাঙ্কুর যুদ্ধ :	কোচিন ১৮০৯
হায়দ্রাবাদ অন্তর্বিদ্রোহ	নোওয়া ১৮১৯
মহীশুর যুদ্ধ :	মাঙ্গালোর ১৭৮৬, সিদাসীর ১৭৯১
আরব উপজাতীয় বিদ্রোহ	বেনি-বু-আলি ১৮২১
মারাঠা যুদ্ধ :	কারকি ১৮১৭, ডিগ
উপজাতীয়বিরোধী যুদ্ধ :	সামানা ১৮৯৭
সিপাহী যুদ্ধ :	আরা, বেহার
শিখ যুদ্ধ:	চিলিঁয়াওয়ালা
বর্মাযুদ্ধ :	পেগু ১৮২৪
সোমালি বিদ্রোহ :	সোমালিল্যাণ্ড ১৯০১-৪
ফরাসীবিরোধী যুদ্ধ :	বুরবঁ ১৭৭৫
আফগান যুদ্ধ :	কাহুন (বেলুচিস্তান), খেলাত ১৮৪২, তোক্রেক

প্রথম (জার্মান) মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)

(ক) ফ্রান্স রণাঙ্গন —লুস, হেলেস, মেসিনেস, ইপ্রেস, ঘেলুভেল্ট, সেণ্ট জুলিয়েন, ওবার্স

(খ) প্যালেস্টাইন রণাঙ্গন —নেবলাজ, গাজা, নেবি সামউইল, জেরুসালেম, টেল-আস্থর, এল-মুঘার

(গ) চীন রণাঙ্গন —সিংটাও

(ঘ) মিশর রণাঙ্গন —সুয়েজখাল

(ঙ) গ্রীক রণাঙ্গন —মাসিডোনিয়া

(চ) পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গন —নারুগোম্বে, নিয়ানগাও, কিলিমানজারো, বেহোবেহো

(ছ) তুর্কী রণাঙ্গন —গ্যালিপোলি, সুভ্‌লা, সার-ই-বেয়ার, কিরথিয়া

(জ) মেসোপটোমিয়া রণাঙ্গন—বসরা

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় পদাতিক ফৌজকে কয়েকটি যুদ্ধকার্যে যোগদান করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান ঘটনা হলো, ১৯৩৫ সালে ইতালী-আবিসিনীয় যুদ্ধের সময় ভারতীয় পদাতিক দলের আদিস আবাবাতে শিবির স্থাপন। সে সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আবিসিনীয়ায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করেছিলেন। ১৯২১-২৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় পদাতিক সৈনিক ইরাক ও এসিয়া মাইনরে অবস্থান ক'রে স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে। কুর্দিস্তানে বিদ্রোহ দমনে যে ভারতীয় ফৌজ প্রেরিত হয়, তার মধ্যে বাঙালী সৈনিক নিয়ে গঠিত একটি কোম্পানী ছিল। ১৯২৭ সালে স্লাংহাই বন্দরকে বিপ্লবী চীন ফৌজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় পদাতিক তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের' সহযোগিতা করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরাজের বিরোধিতার

সূত্রপাত হয়, এবং সীমান্ত অঞ্চলে আফগান ফৌজের বিরুদ্ধে কয়েকটি সংঘর্ষে ভারতীয় পদাতিক নিযুক্ত হয়। কামালপাশার নেতৃত্বে পরিচালিত তুর্কী জাতীয় ফৌজের বিরুদ্ধেও ১৯২০ সালে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে ও সালোনিকায় ভারতীয় পদাতিক কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এছাড়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ লেগেই থাকে এবং ভারতীয় পদাতিক প্রত্যেক সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলন রূপে দেখা দেয়। এই গণ-আন্দোলন দমন করার কাজে এবং দমনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের নানাস্থানে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করা হয়। এই আন্দোলনে ভারতের স্বদেশী ভলাণ্টিয়ারকে বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় পদাতিকের নিক্ষিপ্ত গুলি বরণ ক'রে প্রাণ দিতে হয়েছে।

ভারতের প্রধান পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির তালিকা (১৯৫ পৃষ্ঠা) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ৩নং চিহ্নিত কোন রেজিমেণ্ট নেই। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইংরাজের ভারত জয় সম্পূর্ণ হবার পর মাদ্রাজ পদাতিক দল থেকে মাদ্রাজী সৈনিক অপসারিত করা হয় এবং সেই স্থানে পাঞ্জাবী সৈন্য ভর্তি করা হয়। শুধু কর্ণাটী পদাতিক নামে কয়েকটি দল থাকে যারা পুরাতন মাদ্রাজ বাহিনীরই উত্তরগোষ্ঠী, এবং এই দলে দক্ষিণভারতীয় মুসলমান সৈনিক থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধে কর্ণাটী পদাতিক কাজ করে, তারপরে ১৯২১ সালে কর্ণাটী পদাতিক-দলগুলি নিয়ে '৩নং মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট' নামে রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। কিন্তু ১৯২৩ সালে ৩নং মাদ্রাজকে ভেঙে দেওয়া হয়। সেই থেকে ভারতীয় ফৌজে ৩নং-এর স্থান শূন্য পড়ে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'বর্মা রাইফেল' (ব্যাটালিয়ন) দল নামে

কয়েকটি পদাতিক দল তৈরী হয়েছিল। এই দলগুলির মধ্যে চিন, কাচিন, প্রভৃতি উত্তর বর্মার কয়েকটি পার্বত্য সমাজের লোক সৈনিক রূপে ভর্তি হয়েছিল। মহাযুদ্ধের পর বর্মা রাইফেল (ব্যাটালিয়ন) দল-গুলিকে নিয়ে একটি ২০নং রেজিমেণ্ট তৈরী হয়েছিল। এই রেজিমেণ্টের নাম ছিল '২০নং বর্মা রাইফেল'। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই এই রেজিমেণ্টকেও ভেঙে দেওয়া হয়। তাছাড়া, আর একটা কারণ ছিল। বর্মা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই জন্য ভারতীয় ফৌজে কোন 'বর্মা রেজিমেণ্ট' রাখবার সঙ্গত কারণ ছিল না।

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের এবং ভারতীয় সওয়ার ফৌজের রণকীর্তির যে তালিকা পূর্ব-প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌বার আছে। কেউ যেন না মনে করেন, পতাকায় চিহ্নিত গৌরব-প্রতীক রূপে এই কয়েকটি রণকীর্তিই ভারতীয় ফৌজের সমগ্র রণকীর্তি। ভারতীয় ফৌজ তার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও অভিযান করেছে, তার নাম উল্লেখ করলে সংখ্যা হাজারের ওপরে গিয়ে উঠ্‌বে। পতাকায় চিহ্নিত রণকীর্তির নামগুলি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ এবং বিবেচনার দান। আরও এমন শত শত যুদ্ধের নাম সামরিক বিবরণীতে আছে, যে যুদ্ধগুলিতে একমাত্র ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্বের জোরে ইংরাজের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় ফৌজের এই রকম অনেকগুলি সাফল্যময় যুদ্ধকীর্তির নাম পতাকায় চিহ্নিত করা হয়নি। যে সব যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক খুব কষ্ট সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, খুব বেশী ক'রে ইংরাজভক্তির প্রমাণ দেখিয়েছে, সেই যুদ্ধের ঘটনাগুলিকেই বিশেষ ভাবে রণকীর্তি রূপে পতাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রভৃতি পদক দেবার ব্যাপারেও ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এই নীতি অনুসরণ করেছেন। সাহসিকতা

শৌর্য ও আত্মদানের প্রমাণ ভারতীয় সৈনিক অজস্র ক্ষেত্রে দিয়েছে, কিন্তু তার জন্য অজস্র পদক দেওয়া হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ অফিসারকে বাঁচাবার জন্য সাহসিকতা ও আত্মদানের প্রমাণ, অথবা এই রকমেরই কিছু একটা ইংরাজপ্রীতির কীর্তি যেসব ভারতীয় সৈনিক দেখিয়েছে, অধিকাংশ পদকগুলি তারই ধন্যবাদমূলক উপহার।

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের দীর্ঘ ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা আজও অনেকের কাছে বহু রহস্য বিস্ময় ও চমকের সৃষ্টি করবে এবং যা নিতান্ত ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে।

পুরাতন সামরিক বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায়, কোম্পানীর আমলে মাদ্রাজ পদাতিকদের মাইনে ছিল মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা। এই সাড়ে পাঁচ টাকা মাইনের জন্য মাদ্রাজী সিপাহী তার প্রাণ কোম্পানী বাহাদুরের কাছে গচ্ছিত ক'রে দিত। না বলে ফৌজ থেকে চলে গেলে সিপাহীকে প্রাণদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হতো। *

পুরাতন বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীরা কালাপানি বা সমুদ্র পার হয়ে অন্যদেশে যুদ্ধ করতে যেতে আপত্তি করতো। এর কারণ কি? ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, সমুদ্র পার হলে 'হিন্দুত্ব' বা 'জাত' নষ্ট হবে, সিপাহীদের মনে এই রকম একটা কুসংস্কার ছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, পুরাতন বেঙ্গল বাহিনীর ৪নং ব্যাটালিয়নের দু'টি কোম্পানী ১৭৭০ সালের মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় সমুদ্রপথে ফিরবার সময় সমুদ্রে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

---

* "Their gross monthly pay, from which there were many deductions, was the equivalent of five and a half rupees, acceptance of which entailed a penalty of death for subsequent desertion."—India's Army by Jackson.

একটা খারাপ জলযানে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বেঙ্গল সিপাহিদের একটি দলকে সমুদ্রপথে প্রেরণ ক'রে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ হৃদয়হীনতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীরা সমুদ্র পার হতে স্বভাবতঃই আপত্তি করতো। (১)

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের ক্রিয়াকলাপের একটি ঘটনার সম্পর্ক আছে। পুরাতন বোম্বাই বাহিনীর একটি সিপাহী নৌ-ব্যাটালিয়ন একটি আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজকে ভারত মহাসাগরে আক্রমণ করেছিল। আমেরিকান সৈনিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকের সংঘর্ষের এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত।

১৮৬৪ সালে সাংহাইয়ে জাপানী ফৌজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীকে একবার সংঘর্ষ করতে হয়। জাপসৈনিকের সঙ্গে ভারতীয় সৈনিকের সংঘর্ষের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

বিমানবাহিত (air-borne) ফৌজ আধুনিক কালে একটা সাধারণ ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক ফৌজকে দ্রুত পৌঁছে-দেবার কাজে আজকাল বিমান ব্যবহৃত হয়। ১৯২৩ সালে কুর্দিস্থানে বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যাপৃত ভারতীয় পদাতিক প্রথম বিমানবাহিত হয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শিবির থেকে হেঁটে হেঁটে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে অনেকদিন বিলম্ব হবার আশঙ্কা ছিল, সেইজন্য ভারতীয় পদাতিক দলকে বিমানে বহন ক'রে রণক্ষেত্রে কয়েকঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত করা হয়। পদাতিক ফৌজকে বিমানবাহিত করা, পৃথিবীর ফৌজী ইতিহাসে এই প্রথম।

---

(1) "Some authorities hold that it was the complete loss at sea of two companies of the old 4th Bengal Battalion whilst on return from Madras in 1770 that made a fatal impression on Sepoy mind" —Centrl India's Army by Jackson.

ফৌজী ইতিহাসের একটি কৌতুককর উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৬ সালে, ভারতীয় পদাতিক দলকে এক অদ্ভুত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ১৬নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১নং ব্যাটালিয়নটি পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান বিতাড়ণের উদ্যোগে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই রণাঙ্গনে শুধু জার্মান শত্রুর বিরুদ্ধেই ভারতীয় পদাতিককে যুদ্ধ করতে হয়নি। আর একটি শত্রুদল অভাবিত রূপে ভারতীয় পদাতিক দলের পথ অবরোধ করে। পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গনের নদীগুলি থেকে জলহস্তীর দল উঠে এসে দলবদ্ধ ভাবে ভারতীয় পদাতিকের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। উক্ত ব্যাটালিয়নকে বার বার জলহস্তীর বিরুদ্ধে বেয়নেট বা সঙ্গীনের চার্জ করতে হয়। বেয়নেট চার্জের ফলে জলহস্তীর দল যতটুকু পিছিয়ে যেত, সৈন্যদল ততটুকু অগ্রসর হতে পারতো।

কৌতুককর কাহিনী এবং ফৌজী ঘটনার কথা ছেড়ে দিয়ে, তথ্যগত কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবৃত করা যেতে পারে। পদাতিক ফৌজের মধ্যে, 'রাইফেল' এবং 'গ্রেনেডিয়ার' নামে আখ্যাত কয়েকটি রেজিমেণ্ট রয়েছে দেখা যায়। এই আখ্যাগুলির তাৎপর্য কি?

'রাইফেল' নামে পদাতিক দলের উদ্ভব হয়, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে। ব্রিটিশ পক্ষের সৈনিকেরা বিপক্ষ দলের গুপ্ত সৈনিকের চোরাগুলিতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিপক্ষের একদল সৈনিক আড়াল থেকে কাজ করতো। এই অন্তরালবর্তী সেনাদলকে সায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশপক্ষ ঠিক পাল্টা একটি বিশেষ শ্রেণীর পদাতিক দল গঠন করেন, যারা শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঘন সবুজ বা কালো রঙের পোষাক পরে ঘুরে বেড়াতো। এর পরেও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত

হয় যে, গোপনে অবস্থান ক'রে বা ঘুরে ফিরে শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য বিশেষভাবে গঠিত একদল পদাতিকের প্রয়োজন আছে। এই গোপনচারী পদাতিক দলই রাইফেল (Rifles) দল ব'লে অভিহিত। গোপনে অবস্থান বা যাতায়াত করে বলেই রাইফেল দলের আক্রমণ বড় মারাত্মক। রাইফেল দলের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক্ বর্তমানে রাইফেল দল সাধারণ পদাতিকের মতই কাজ করে। তবে এদের ড্রিল প্যারেড ইত্যাদি কতগুলি শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপার অন্য পদাতিকের তুলনায় কিছু পৃথক্।

গ্রেনেডিয়ার কথাটিরও এই ধরনের একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে। অতীতে গ্রেনেডিয়ার সৈনিকের কাজ ছিল গ্রেনেড অথবা বোমা নিক্ষেপ করা। পরে প্রত্যেক পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে এইরকম বোমা নিক্ষেপক দল রাখবার প্রয়োজন হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও এই ধরনের দলের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় ফৌজী সংগঠনতন্ত্রে গ্রেনেডিয়ার দল বিশেষ প্রাধান্যপূর্ণ স্থান লাভ করে। সৈন্যদলের ভেতর থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে বেশী সাহসী ও ও শক্তিমান সৈনিকদের নিয়ে গ্রেনেডিয়ার দল এক একটা কোম্পানী রূপে গঠিত হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে যখনই কোন বিশেষ ধরনের বা নূতন ধরনের কাজ করবার প্রয়োজন দেখা দিত, তখনই সেই কাজের জন্য সবচেয়ে আগে গ্রেনেডিয়ার কোম্পানীগুলিকে নিয়ে ব্যাটালিয়ন গঠন করা হতো। নেপোলিয়ন গ্রেনেডিয়ারদের নিয়ে ব্রিগেড পর্যন্ত গঠন করতেন।

খাকির ইতিহাস

বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সৈনিক খাকি রঙের পরিচ্ছদ

ধারণ করে। কিন্তু অতীতে এ নিয়ম ছিল না। সৈনিকের পোষাকে রঙ ও বৈচিত্র্যের বাহুল্য ছিল। ইংরাজগঠিত ভারতবর্ষের সৈনিকও অতীতে রঙীন পোষাক পরিধান করতো।

একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হলো যে, খাকি পরিচ্ছদের প্রথা ভারতবর্ষ থেকেই উদ্ভূত।

'খাকি' প্রথার প্রবর্তক হলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল স্যার হ্যারি লুম্‌স্‌ডেন (Lt. G. Sir Harry Lumsden)। ১৮৪৬ সালে লুম্‌স্‌ডেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে 'গাইড্‌স্‌' (Guides) নামে যে সৈন্যদল গঠন করেন, সেই সৈন্যদলেই প্রথম খাকি পরিচ্ছদ ধারণের প্রথা প্রচলিত হয়।

এই সময় ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজেও য়ুরোপীয় স্টাইলের নানা রঙে রঙীন পরিচ্ছদ বা উর্দি প্রচলিত ছিল। সীমান্তের পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে বহু সংঘর্ষের অভিজ্ঞতায় লুম্‌স্‌ডেনের ধারণা হয় যে, উপজাতীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে হলে ইংরাজের ফৌজের পরিচ্ছদকেও উপজাতীয় স্টাইলে তৈরী করা উচিত। লুম্‌সডেন সম্পূর্ণ রূপে একটা মনস্তত্ত্বগত কারণেই কৌশল হিসাবে উপজাতীয় পাঠানের পরিচ্ছদ অনুকরণ করবার ব্যবস্থা করেন। শত্রুপক্ষকে (অর্থাৎ ইংরাজের ফৌজকে) নিজেদের মত পোষাকে ভূষিত দেখলে উপজাতীয় পাঠানের মনোবল কমে যাবে, লুম্‌স্‌ডেনের মনে কেন এই ধারণা দেখা দিয়েছিল বোঝা যায় না। একটা কারণ বোঝা যায়, সীমান্ত অঞ্চলের ধূসর-পাহাড় সমাকীর্ণ অঞ্চলে ইংরাজের রঙীন পরিচ্ছদে ভূষিত ফৌজের অবস্থান বা চলাচল অতি সহজেই উপজাতীয় পাঠানের সতর্ক চক্ষে ধরা পড়ে যেত। সামরিক অভিযানের ব্যাপারে কোন ফৌজের পক্ষে শত্রুর কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়া খুবই নির্বুদ্ধিতার

পরিচায়ক। এই জন্যই বর্তমান যুগে প্রত্যেক ফৌজে 'কামুফ্লাজ' (camouflage) বা বর্ণগুপ্তি একটা সামরিক কৌশল হিসাবেই গৃহীত হয়ে থাকে। যাই হোক্, বস্তুতঃ একরকম কামুফ্লাজের প্রয়োজনেই লুম্‌স্‌ডেন তাঁর গাইড্‌স্ বাহিনীর পরিচ্ছদকে প্রথম স্থানীয় (উপজাতীয়) অধিবাসীর পরিচ্ছদের মত করেন। পরিচ্ছদ এবং পরিচ্ছদের রঙ, উভয়ই স্থানীয় পাঠান উপজাতীয়ের পরিচ্ছদের অনুরূপ হয়। ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজে এই প্রথম দেশী পোষাক প্রবর্তনের দৃষ্টান্ত। উপজাতীয় পাঠানের পরিচ্ছদ সাধারণতঃ খাকি রঙের হতো—ময়লা হল্‌দে-ধূসর রঙের। লুম্‌স্‌ডেন তাঁর গাইড্‌স্ দলের উর্দিতে এই ধরনের খাকি রঙ চালু করেন।

গাইড্‌স্ দলের পোষাক ছিল সুতির ঢিলে পায়জামা, সুতির কাপড়ের পাগড়ী, সুতির জাব্‌বা, তার ওপর সুতিকাপড়ের অথবা ভেড়ার চাম্‌ড়ার ছোট জ্যাকেট। মাজারি নামক এক রকম ছোট জাতের খেজুর গাছ থেকে অথবা কুল গাছের কষ থেকে তৈরী একরকম রঙ দিয়ে এই সুতির পরিচ্ছদ ছোপিয়ে নিলেই রঙটা 'খাকি' হয়ে যেত।

'খাকি'র পূর্বে সবুজই ছিল বস্তুতঃ সৈনিকের উর্দির 'কামুফ্লাজ' রঙ। তরু সমাচ্ছন্ন অঞ্চলে গাছের রঙের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য সৈনিকের পক্ষে সবুজ রঙের পোষাক পরার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 'রাইফেল' নামে চোরাগুলি চালনায় ওস্তাদ এক একটি দল প্রত্যেক ফৌজে থাকে, এদের পোষাক সবুজ রঙের হতো এবং আজও রাইফেলদের উর্দিতে ঐতিহ্যগত সংস্কারের স্মরণচিহ্ন হিসাবে সবুজ রঙের প্রচলন দেখা যায়।

ঠিক এই নীতি অনুসারে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের ধূসর

মাটির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে খাকি রঙের পরিচ্ছদ প্রথম চালু করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য অতি দ্রুত পাঞ্জাবে নতুন নতুন যেসব ফৌজ গঠন করা হয়, তাদের পরিচ্ছদও খাকি করা হয়।

এর পর, ১৮৫৭ সালে মে মাসে গোরা ফৌজের মধ্যে শিয়ালকোটে অবস্থিত ৫২নং পদাতিক বাহিনী (বর্তমানে 2nd Oxfordshire & Buckinghamshire Light Infantry) সর্বপ্রথম খাকি পরিচ্ছদ ধারণ করে। তারপর, বিদ্রোহী সিপাহী ফৌজের অধিকার থেকে দিল্লী দখলের যুদ্ধে ৩১নং গোরা পদাতিক (বর্তমানে 1st Duke of Cornwall's Light Infantry) কামুফ্লাজের প্রয়োজনে 'মাটি' রঙের পরিচ্ছদ ধারণ করে। ভারতের বাইরে গোরা ফৌজ দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার কাফ্রি যুদ্ধের সময় (১৮৫১-৫৩) ধূলো রঙের পরিচ্ছদ ধারণ করেছিল।

যাই হোক্ সিপাহী বিদ্রোহের সময় রণক্ষেত্রে কৌশল হিসাবে বা যুদ্ধের সুবিধার জন্য কয়েকটি দলে খাকি পরিচ্ছদের যে প্রথা প্রচলিত হয়, বিদ্রোহ ক্ষান্ত হবার পর সেই প্রথা আবার বর্জন করা হয়।

১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজে খাকি পরিচ্ছদ সরকারী ভাবে প্রচলিত করা হয়। কিন্তু আধুনিক কালের মত খাকি ড্রিল কাপড়ের উদ্ভব তখন হয়নি। প্রত্যেক রেজিমেন্ট তাদের সাদা কাপড়ের উর্দিকে খাকি রঙে চোপিয়ে নিত। রঙের দুর্গন্ধ সিপাহীদের মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল।

গোরা, পরিচ্ছদের রঙ হয় 'ধূসর' (grey), সৈনিকের ঠিক খাকি রঙ নয়। ধূসর উর্দিভূষিত গোরা ফৌজ এবং খাকি উর্দি ভূষিত ভারতীয় ফৌজ ১৮৯৭-৯৮ সালে সুদান যুদ্ধে প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মরুভূমির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কামুফ্লাজ করার জন্য

গোরা ফৌজকে বাধ্য হয়ে খাকি পরিচ্ছদ ধারণ করতে হয়।

এই ঘটনার পর থেকে গোরা ফৌজেও সরকারী ভাবে খাকি রঙের উর্দি প্রচলন করা হয়।

'খাকি' কথাটি হলো মূলতঃ ফার্সি ভাষা। উপজাতীয় পাঠানের পুশ্‌তু ভাষাতেও কথাটি প্রচলিত। অর্থ হলো—ধূলো রঙ।

আমেরিকান ফৌজ ১৯০০ সাল থেকে খাকি রঙের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। জাপানী ফৌজ ১৯০৫ সালে, ফরাসী ফৌজ ১৯১০ সালে এবং স্পেনীয় ও বেলজিয়ান ফৌজ ১৯১৯ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়।

ভারতীয় ফৌজে পদোপাধি (Rank)

ভারতীয় ফৌজের ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ যে পদোপাধির (Rank) তালিকা রচনা করেছিলেন আজ পর্যন্ত সেগুলিই প্রচলিত রয়েছে। ব্রিটিশ রেজিমেণ্টে প্রচলিত পদোপাধির নাম ভারতীয় বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়না। ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারেরা অবশ্য ব্রিটিশ রেজিমেণ্টে প্রচলিত পদোপাধি গ্রহণ করে থাকেন। ভারতীয় বাহিনীতে উচ্চ অফিসারের পদে যেসব ভারতীয় নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁরাও ব্রিটিশ রেজিমেণ্টে প্রচলিত পদোপাধি লাভ করেন, কিন্তু সেটা তাঁরা রাজকীয় কমিশন (King's Commission) হিসাবেই লাভ করেন, ভারতীয় কমিশন নয়।

ভারতীয় ফৌজে পদোপাধির তালিকাটি হলো এই :

	অফিসার শ্রেণী (Officer Rank)	অন্যান্য শ্রেণী (Other Rank)
(১) সওয়ার ফৌজ—	রিসালদার মেজর	দফাদার মেজর

	রিসালদার	দফাদার
	জমাদার	ল্যান্স দফাদার
(২) পদাতিক ফৌজ—	সুবেদার মেজর	হাবিলদার মেজর
	সুবেদার	হাবিলদার
	জমাদার	নায়েক
		ল্যান্স-নায়েক

ভারতীয় ফৌজের উক্ত অফিসার শ্রেণীর পদগুলি 'ভাইসরয়ের কমিশন' (Viceroy's Commission) অনুসারে নিযুক্ত পদের আখ্যা রূপে পরিচিত।

পরবর্তী ভিন্ন প্রসঙ্গে ভারতীয় ফৌজের পদোপাধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

ব্রাহ্মণ রেজিমেন্টের জনৈক সুবাদার
(১৯০৩)

জাঠ লান্সার (১৯১০)

উট-সওয়ার—বিকানীর রাজ্যের
"গঙ্গা রিসালা"

ডোগ্‌রা হাবিলদার
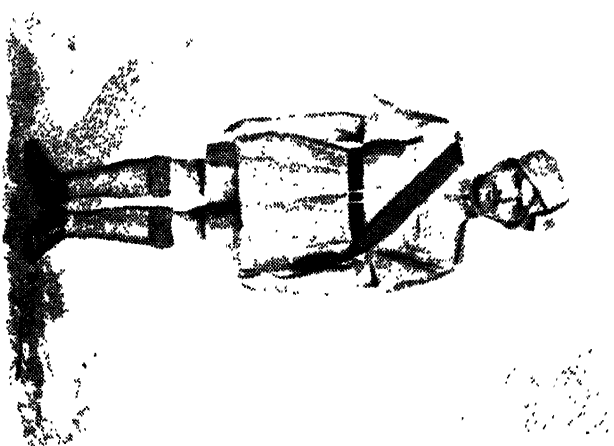
গুর্খা লাইন

পূর্ব অধ্যায়ে ১০টি গুর্খা পদাতিক রেজিমেণ্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—১নং থেকে ১০নং পর্যন্ত। গুর্খা পদাতিক রেজিমেণ্টের ইতিহাসও দীর্ঘকালের, তবে অন্যান্য ভারতীয় রেজিমেণ্টের মত এত প্রাচীন নয়। নেপাল যুদ্ধ অবসান হবার পর অর্থাৎ ১৮১৫ সালে নেপাল ও ইংরাজ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) কর্তৃপক্ষের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। বল্‌তে গেলে, ইংরাজ-নেপাল যুদ্ধের সময়েই নেপালী সমাজ দলে দলে ইংরাজের ফৌজে এসে চাক্‌রী করার জন্য ভর্তি হতে থাকে। সেই হলো ভারতীয় ফৌজে 'গুর্খা' সৈন্যের প্রথম আবির্ভাব। তারপর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ নিজের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় গুর্খা সৈন্য গ্রহণ করতে থাকেন। প্রথম দিকে গুর্খা পদাতিক দল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক দলের নম্বরের ক্রম অনুসারে নম্বর লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে গুর্খা পদাতিক দলকে একটি স্বতন্ত্র লাইন হিসাবে গণ্য ক'রে ভিন্ন ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়। গুর্খা সৈনিকের পরিচ্ছদেও একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হয়। গুর্খা পদাতিক দলের নম্বর পরিবর্তনের ঘটনা ভারতীয় পদাতিক দলের নম্বর পরিবর্তনের মত এত বেশী করে হয়নি।

গুর্খা সৈনিক মাত্র পদাতিক সৈনিক হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং পদাতিক হিসাবে গুর্খা সৈনিকের কৃতিত্ব অতুলনীয়। প্রত্যেক গুর্খা রেজিমেণ্টের ২টি করে ব্যাটালিয়ন। বর্তমান গুর্খা রেজিমেণ্টের উদ্ভবের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত হলো :

১নং গুর্খা রাইফেল্‌স :

জেনারেল অক্টারলোনী কর্তৃক নেপাল সামন্তরাজ অমরসিং

১৮১৫ সালে পরাজিত হন এবং অমরসিংয়ের মলায়ন দুর্গ অক্টারলোনীর অধিকারভুক্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ঐ সময়েই ঐ মলায়ন দুর্গের মধ্যেই ইংরাজের অনুগত প্রথম গুর্খা সৈন্যদল গঠিত হয়ে যায়। এই প্রথম গুর্খা দলই কিছুকাল পরে ১৮২৬ সালে দু'টি ব্যাটালিয়ন রূপে গঠিত হয়। নাম হয় নাসিরি ব্যাটালিয়ন। নাসিরি অর্থ 'বন্ধুত্বপূর্ণ'। নাসিরি দল মলায়ন রেজিমেণ্ট নামেও পরিচিত ছিল। অতীতের এই নাসিরি দলই বর্তমানের সুপরিচিত ১নং গুর্খা রাইফেল।

২নং গুর্খা রাইফেল: ১৮১৫ সালে 'সিরমুর' নামক স্থানে 'সিরমুর রাইফেল দল' রূপে প্রথম গঠিত হয়।

৩নং গুর্খা রাইফেল: ১৮১৫ সালে 'কুমায়ুন ব্যাটালিয়ন' নাম নিয়ে প্রথম যে পদাতিক দল গঠিত হয়, তাদেরই উত্তরগোষ্ঠী হলো বর্তমান ৩নং গুর্খা।

৪নং গুর্খা রাইফেল: অতিরিক্ত (Extra) গুর্খা পদাতিক দল নামে ১৮৫০ সালে এক পদাতিক দল পিঠোরাগড় নামক স্থানে গঠিত হয়। প্রথম প্রথম এই দলকে 'নতুন নাসিরি' দলও বলা হতো। এই দলটিই বর্তমান ৪নং গুর্খার পূর্বগোষ্ঠী।

৫নং গুর্খা রাইফেল: ১৮৫৮ সালে 'হাজারা ব্যাটালিয়ন, নাম নিয়ে আবোটাবাদে একটি গুর্খা দল গঠিত হয়। এই দলই ৫নং গুর্খা রাইফেল রূপে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে।

৬নং গুর্খা রাইফেল: ১৮১৭ সালে 'কটক লেজন' (Cuttack Legion) নাম নিয়ে উড়িষ্যায় একটি গুর্খা দল গঠিত হয়। উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের বিদ্রোহ দমনের জন্যই এই দল গঠিত হয়েছিল। ১৮২৩ সালে এই দল

উত্তর বঙ্গে স্থানান্তরিত হয় এবং তখন নাম হয় 'রঙ্গপুর লাইট ইনফ্যানট্রি'। ১৮২৮ সালে আবার নাম পরিবর্তন হয়—'আসাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি'। এই দলই বর্তমান ৬নং গুর্খা রেজিমেণ্টের পূর্বগোষ্ঠী।

৭নং গুর্খা রাইফেল : মাত্র ১৯০২ সালে বর্মার থায়েটামো সহরে একটি গুর্খা দল গঠিত হয়। প্রথমে এই গুর্খা দলই '৮নং গুর্খা রাইফেল' আখ্যা ধারণ করে। কিন্তু ১৯০৭ সালে দলটি দু'ভাগ হয়ে একটি ৭নং রূপে অপরটি ৮নং গুর্খা রেজিমেণ্ট বদলি হয়।

৮নং গুর্খা রাইফেল : ১৮২৪ সালে গৌহাটীতে গুর্খাদের নিয়ে একটি ব্যাটালিয়ন এবং ১৮৩৫ সালে শ্রীহট্টে একটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। এই দুই ব্যাটালিয়ন বর্তমান ৮নং গুর্খা রেজিমেণ্টের পূর্বগোষ্ঠী।

৯নং গুর্খা রাইফেল : গুর্খাদের নিয়ে অতীতে যেসব পদাতিক দল গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই একটি দল হলো বর্তমান ৯নং গুর্খা রেজিমেণ্টের পূর্বগোষ্ঠী। পুরাতন দলের একটি উত্তরগোষ্ঠী কেন ৯নং স্থান লাভ করলো, এটা বিস্ময়ের বিষয়। অতীতে 'মনিপুরী লেভি' নামে ঐ পুরাতন গুর্খা দলটি আখ্যালাভ করে, তারপর ১৮২৪ সালে বেঙ্গল পদাতিক ফৌজের লাইনসম্মত একটি নম্বর লাভ করে। এই দলটিই ৯নং গুর্খা রেজিমেণ্ট রূপে পরিণতি লাভ করেছে।

১০নং গুর্খা রাইফেল : ১৮৮৭ সালে বর্মার পশ্চিম প্রান্তে কুবো উপত্যকার সীমান্ত রক্ষার জন্য 'কুবো মিলিটারী পুলিশ' নামে একটি গুর্খা ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে এই দল ১০নং গুর্খা রাইফেল নামক রেজিমেণ্টে পরিণত হয়।

দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি গুর্খা রেজিমেন্টই রাইফেল্স দল রূপে গঠিত। ভারতীয় ফৌজের গুর্খা লাইনের এই একটি বৈশিষ্ট্য। ইংরাজ গঠিত গুর্খা পদাতিক ফৌজের সামরিক ইতিহাসও বহু কীর্তি এবং ঘটনায় সমাকীর্ণ। গুর্খা ফৌজের প্রাক্তন ইতিহাসের দিকে তাকালে, একটা বিশেষ ব্যাপার চোখে পড়ে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষভাবে গুর্খা সৈনিকের ওপর নির্ভর করতেন। গুর্খা পদাতিক দল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বহু অভিযানে প্রধান সাহায্য করেছে। ভুটান জয়, সিকিম জয়, মনিপুর জয়, তিব্বত অভিযান—তাছাড়া সমগ্র আসামের উপজাতীয় (নাগা, আবর, লুসাই, মিশমি ইত্যাদি গোষ্ঠী) দমনে গুর্খা পদাতিককেই বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে গুর্খা সৈনিক একটি যথোপযুক্ত প্রতিষেধক রূপে প্রমাণিত হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতের মোপলা বিদ্রোহ গুর্খা সৈনিকের দ্বারাই দমিত হয়েছে।

পুরাতন গুর্খা পদাতিক দলগুলির ইতিহাসে পুরাতন রণকীর্তি-রও যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। জাঠবিরোধী যুদ্ধে আফগান যুদ্ধে, শিখ যুদ্ধে এবং সিপাহীবিরোধী যুদ্ধে, ইংরাজের অনুগত সৈনিকরূপে গুর্খা পদাতিক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। ইংরাজের মহীশুর যুদ্ধ এবং মারাঠা যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন সামরিক অভিযানের কোন রণক্ষেত্রে গুর্খা ছিল না, কেননা তখন ইংরাজের অধীনে কোন গুর্খা দল গঠিত হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স, গ্যালিপলি, মেসোপটেমিয়া, আফ্রিকা, মিশর এবং পারস্য প্রভৃতি রণক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় পদাতিকের মত গুর্খা পদাতিক কাজ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে গুর্খা সৈনিকের প্রাণহানি হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। ২ লক্ষ গুর্খা সৈনিকের মধ্যে ২০ হাজার সৈনিক আর রণক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরেনি।

সুতরাং গুর্খা রেজিমেণ্টগুলির পতাকায় চিহ্নিত রণকীর্তির যেসব নাম আছে, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রথম মহাযুদ্ধকালের রণকীর্তি। প্রাচীন রণকীর্তির মধ্যে কয়েকটি শিখযুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, সিপাহীযুদ্ধ, ভরতপুরযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ এবং সীমান্ত অভিযান প্রভৃতি ঘটনার কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে নাম উল্লিখিত আছে।

গুর্খা পদাতিকের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসাবে একটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—তিব্বত অভিযানের কথা। ১৮৮৯ সালে গুর্খা পদাতিক দল হিমালয়ের ১৮ হাজার ফুট উচ্চ গিরিপৃষ্ঠ অতিক্রম ক'রে তিব্বতের রাজধানী লাসাতে উপস্থিত হয়। কোন বৃহৎ পদাতিক দল সমর সম্ভার নিয়ে এত উচ্চ পর্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করেছে, পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

গুর্খা সৈনিকেরা প্রথমে পাগ্ড়ি পরিধান করতো। কিন্তু কিছুকাল পরেই লম্বা 'কিলম্যার্নক' টুপি ধারণের রীতি প্রচলিত হয়। পরে ১৯০১ সালে ওয়াজিরিস্তান অভিযানের সময় বাঙলাদেশের 'টোকো'র মত কাশ্মীরী টুপি (Slouch Hat) প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া আর এক রকমের টুপিও পূর্বে প্রচলিত ছিল—ছোট গোল টুপি (Pill-box Cap), গালপাট্টা ফিতে দিয়ে মাথার ওপর বসানো। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যে 'বয় স্কাউট' প্রথা দেখা যায়, কথিত আছে যে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (Lord Baden Powell) প্রথম আফ্রিকায় রোডেসিয়াতে এই স্কাউটিং প্রথা প্রবর্তন করেন, এবং তিনিই এই প্রথার আবিষ্কারক। কিন্তু স্কাউটিং প্রথা গুর্খা পদাতিক দলের মধ্যে বহু পূর্বেই প্রয়োজনের দাবীতে দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে টিরা অঞ্চলের অভিযানে এই স্কাউটিং প্রথাটি গুর্খাদের দ্বারা প্রথম অবলম্বিত

হয়। বলা যায়, স্কাউটিং প্রথাটি সেইখানে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এমন কি, সেই সময়ের 'গুর্খা সীমান্ত স্কাউট' দল যে বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ ধারণ করতো, বর্তমান স্কাউটদের মধ্যে সর্বত্র সেই ধরনের কতগুলি পরিচ্ছদগত বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১১নং নামে একটি গুর্খা রেজিমেণ্ট গঠিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এই রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়।

গুর্খা রেজিমেণ্টের পতাকায় চিহ্নিত গৌরব প্রতীক রূপে যেসব রণকীর্তির নাম উল্লিখিত আছে, তার তালিকা উধৃত হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগের রণকীর্তি:

ভরতপুর, আলিওয়াল, সোবরাওঁ, আফগানিস্তান, টিরা, পাঞ্জাব সীমান্ত, দিল্লী ১৮৫৭, কাবুল, কান্দাহার, আহমেদখেল, বর্মা ১৮৮৫-৮৭, চিত্রল, আলি মসজিদ, ওয়াজিরিস্তান, চীন ১৯০০, পেইওয়ার কোটাল, চারাসিয়া।

প্রথম মহাযুদ্ধ কালের রণকীর্তি:

গিভেঞ্চি, নোভ চ্যাপেল, ইপ্রেস, সেণ্ট জুলিয়েন, ফেস্টুবার্ট, লুস, ফ্র্যান্স ও ফ্লাণ্ডার্স, মেগিড্ডো, শারোন, প্যালেস্টাইন, টাইগ্রিস, কুট-অল-আমারা, বাগদাদ, মেসোপটেমিয়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারত ১৯১৫-১৭, ওবার্স, মিশর, পারস্য ১৯১৮, বেলুচিস্তান ১৯১৮, আফগানিস্তান ১৯১৯; লাবাসে, আরমাঁতিয়েরে, গাজা, এল মুঘার, নেবি সামউইল, জেরুসালেম, টেল আস্থর, শরকত, গ্যালিপোলি, হেলেস, ক্রিমিয়া, সুভ্লা, সারই-বেরার, সুয়েজখাল, খাঁ বাগদাদি, শাইবা, টেসিফন।

ভারতীয় নৌবাহিনী

ভারতীয় নৌবাহিনী বলতে বর্তমানের 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি' (Royal Indian Navy) আমাদের মনশ্চক্ষে দেখা দেয় এবং এই ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাসই এই প্রসঙ্গের বিষয়। তা না হলে, দূর অতীতের ইতিহাসের কথা ভাবতে গেলে আমাদের স্মৃতি পথে হয়তো এমন অনেক দৃশ্য ফুটে উঠবে, যা বর্তমানে আমাদের কাছে প্রায় রূপকথার চিত্রের মত হয়ে উঠেছে। যে নৌবাহিনী নিয়ে সিংহবাহু লঙ্কা জয় করেছিল, যে নৌ-বলের প্রসাদে ভারতের শৈলেন্দ্র রাজন্যের দল যাভা, সুমাত্রা ও বলিদ্বীপে রাজত্ব বিস্তার করেছিল, তার স্বরূপ আজ আমাদের কাছে কল্পনার আলেখ্য মাত্র হয়ে উঠেছে। এত দূর অতীতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংসী মারাঠা শক্তিও সেদিন নৌবল গঠন করেছিল। ভারতেই যুদ্ধপোত তৈরী হতো, এমন কি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্তৃপক্ষও ভারতে নির্মিত যুদ্ধপোত নিয়ে রাজ্যজয়ের অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছে। বোম্বাইয়ের পার্শী ব্যবসায়ী ওয়াদিয়া পরিবার প্রায় এক শত বছর ধরে ইংরাজের জন্য যুদ্ধপোত নির্মাণ করেছে। লাবজি নসেরবানজি ওয়াদিয়া যুদ্ধপোত নির্মাণে সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীতেও সেসময়ে (১৭৫৪) বোম্বাইয়ে নির্মিত যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করা হতো।

১৬১২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুরাটে তাদের প্রথম জলসেনার জাহাজ ঘাঁটি স্থাপন করে। মাত্র চারটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এই জলসেনার বহর ছিল। ১৬১৫ সালে এই ইংরাজ জলসেনা

ভারতে রাজ্যপ্রয়াসী পর্তুগীজ শক্তির জলসৈন্যকে একটি সংঘর্ষে ভালোভাবে পরাভূত করে। এই যুদ্ধ সোয়ালি যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত সুরাটে এই নৌবহর ইস্ট, 'ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জলসেনা' (East India Company's Marine) অবস্থিত ছিল।

১৬৬৫ সালে বোম্বাই কোম্পানীর দখলে আসে এবং কোম্পানীর জলসেনার ঘাঁটিও ১৬৮৬ সালে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত হয়। এর পর থেকে প্রায় একশত বছর কোম্পানীর জলসেনা পশ্চিম ভারতের উপকূলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ জলসেনার বিরুদ্ধে বহু সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ১৬৯৬ সালে ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর এই জলসেনার নাম হয়—বোম্বাই জলসেনা (Bombay Marine)। ১৮৩০ সালে নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়—রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন (Royal Indian Marine) বা রাজকীয় ভারতীয় জলসেনা। ১৯৩৪ সালে নাম হয়—রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি (Royal Indian Navy) বা রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী।

ভারতের ব্রিটিশ গঠিত জলসেনার নাম পরিবর্তনের এই ইতিহাস বস্তুতঃ ভারতীয় জলসেনার গঠনতন্ত্রের ক্রমপরিণতির ইতিহাস। ভারতীয় জলসেনা বহুবার পুনর্গঠিত হয়েছে, রীতিনীতি ও নিয়মতন্ত্র বদলেছে, এবং বহু সাম্রাজ্যিক প্রসারের উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করার জন্য শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি করেছে। ক্ষুদ্র বোম্বাই জলসেনা কিভাবে কত অভিজ্ঞতার পর দীর্ঘকাল পরে নৌবাহিনী বা নেভিতে পরিণত হয়েছে, নিম্নোক্ত সমুদ্রাভিযানের একটি তালিকা থেকেই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে।

সাল	অভিযান
(১) ১৭৪৪	বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে কুমারিকা

		অন্তরীপ পার হয়ে এসে হুগলী নদীতে প্রবেশ এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকারের উদ্যোগ।
(২)	১৮০১	মিশর অধিকারের জন্য অভিযান
(৩)	১৮১০	মরিসাস অভিযান
(৪)	১৮১১,	জাভা অভিযান
(৫)	১৮২৪	বর্মা অভিযান
(৬)	১৮২৭	আফ্রিকার সোমালি উপকূল অভিযান
(৭)	১৮৩৪	এডেন অভিযান
(৮)	১৮৪০	চীন অভিযান
(৯)	১৮৪৫	নিউজীল্যাণ্ড অভিযান
(১০)	১৮৫২	বর্মা অভিযান
(১১)	১৮৫৫	পারস্য অভিয়ান
(১২)	১৮৬০	চীন অভিযান
(১৩)	১৮৭১, ১৮৮২, ও ১৮৮৫	লোহিত সাগর অঞ্চল অভিযান
(১৪)	১৮৯৯	দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযান
(১৫)	১৯০০	চীন অভিযান
(১৬)	১৯১৪-১৮	প্রথম জার্মান মহাযুদ্ধ

প্রথমটি ব্যতীত উল্লিখিত সবই ভারতের বাইরে প্রেরিত অভিযান। সবগুলিই বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা। কিন্তু ভারতীয় জলসেনা অন্যান্য ভারতীয় ফৌজের (সওয়ার ফৌজ, পদাতিক ফৌজ ইত্যাদি) মত

স্বদেশের বহু রাজশক্তিকে দমনের কাজে ইংরাজের বাহু হিসাবে কাজ করেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই ভারতীয় জলসেনা শুধু জলযুদ্ধ করেনি, ইংরাজের নির্দেশে ও পরিচালনায় স্থলসৈন্যের মত বহু যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছে। মারাঠাবিরোধী সংগ্রামে, সিন্ধু অধিকারের সংগ্রামে, আফগানবিরোধী সংগ্রামে, শিখবিরোধী সংগ্রামে (মুলতানযুদ্ধ) এবং সিপাহী বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয় জলসেনার দলও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। '*'

ভারতীয় জলসেনার ক্রমপরিণতির বিভিন্ন কালে শক্তি, সজ্জা ও উপকরণ কি ছিল, তাই একবার লক্ষ্য করা যাক্।

বিভিন্নকাল	জলসেনার বহর
(ক) ১৮৩০ সাল	১১৫টি দেশী যুদ্ধজাহাজ এবং ১৪৪টি দেশী সদাগরী জাহাজ।
(খ) ১৮৬৩ সাল	১৩টি বাষ্পীয় স্টীমার, ৭টি পাল-তোলা জাহাজ, ১১টি মালবাহী নৌকা, ১৭টি গান-বোট।
(গ) ১৯১৪ সাল (প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল)	সব সুদ্ধ ১২টি জাহাজ। অর্থাৎ ৫টি সাধারণ ছোট জাহাজ যেগুলি এডেন, বর্মা উপকূল, পারস্য উপসাগর ও আন্দামানে সাধারণ কাজের জন্য যাওয়া আসা করতো। তা ছাড়া ২টি সার্ভে করার জন্য, ৫টি মাল বহনের জন্য জাহাজ।

* ইংরাজ নৌসেনাপতি নেলসন কোপেনহেগেন যুদ্ধে বোম্বাই নির্মিত কয়েকটি জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন।

(ঘ) ১৯৩৯ সাল (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল) সবসুদ্ধ ৮টি জাহাজ অর্থাৎ ১টি ডিপো জাহাজ, ৫টি স্লুপ, ১টি পেট্রল বা পাহারা-দারী জাহাজ, ১টি সার্ভে জাহাজ।

বিভিন্নকালে ভারতীয় নৌবহরের আয়তনের যে পরিচয় উক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেন হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলেন—না, ভারতীয় জলসেনাকে আর বাড়্‌তে দেওয়া উচিত নয়। দেখা যাচ্ছে যে অতীত কালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে তবু ভারতীয় জলসেনাকে শক্তিশালী ক'রে রাখবার উদ্যোগ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক জয়ের অধ্যায় যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তখুনি দেখা গেল যে ভারতীয় জলসেনাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করার নীতিই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করলেন। তা না হ'লে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৪ সালে, ভারতীয় জলসেনা এত দীনদশায় থাকে কেন? 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন' নামে পরিচিত ভারতীয় জলসেনার ১৯১৪ সালের নৌবহরের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে একটিও যুদ্ধ জাহাজ নেই। 'মেরিন' নামে এই তথাকথিত জলসেনা এই সময়ে বলতে গেলে একটি সাধারণ কর্মচারীর দল ছিল, নৌযুদ্ধে ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক তারা ছিল না। অথচ এই জলসেনারই পূর্ব-গোষ্ঠীর দল মিশর থেকে আরম্ভ ক'রে নিউজীল্যাণ্ড পর্যন্ত সাগরে উপসাগরে ও মহাসাগরে জলযুদ্ধ ক'রে ফিরেছে। ১৯১৪ সালের জার্মান যুদ্ধ চলতে থাকার সময়েও ভারতীয় জলসেনাকে যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য সেনা রূপে গঠন করা হয়নি। ভারতীয় জলসেনার জাহাজগুলি ইংলণ্ডীয় রাজকীয় নৌবাহিনীর অক্সিলিয়ারী ভৃত্য হিসাবে বেশীর ভাগ সাধারণ কাজ করেছে, নৌযুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেনি।

১৯২৫ সালে রলিনসন কমিটি (Rawlinson Committee) ভারতীয় ফৌজের নতুন সংগঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং এই কমিটি সুপারিশ করেন যে ভারতীয় মেরিন বা জলসেনাকে যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য ফৌজে পরিণত করা উচিত। কিন্তু এই সুপারিশ দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হয়েই থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে এই জলসেনাকে ভারতীয় নৌবাহিনী (Royal Indian Navy) আখ্যা দেওয়া হয়।

নেভি বা নৌবাহিনী রূপে আখ্যালাভ হয়, কিন্তু সত্যিই কি ভারতীয় জলসেনা যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল? তা যে হয়নি, উপরের তালিকায় উল্লিখিত ১৯৩৯ সালের ভারতীয় নৌবাহিনীর আয়তন ও শক্তির হিসাব দেখেই বুঝা যায়। নাম হলো নৌবাহিনী, অথচ জাহাজগুলি সবই অসামরিক শ্রেণীর সাধারণ জাহাজ। এর রহস্য কি? ভারতীয় নৌবাহিনী নামটিকে রঙীন খেলনার মতই যেন ভারতীয়দের ভুলিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয়েছিল, অথচ নৌযুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ এই নৌবাহিনীতে স্থান পেল না। কোন্ নীতি এই সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনে কাজ করছিল, ব্রিটিশনীতির পূর্বতন ঐতিহাসিক নজীরের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে সেই নীতির তাৎপর্য অবশ্যই সহজে বুঝা যায়। সেটা হলো—ভারতবাসীকে আধুনিক রণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অপরিচিত এবং অজ্ঞ ক'রে রাখা। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কূটনীতিকে প্রকাশ্যে উচ্চারণ না ক'রে আর্থিক অভাবের কারণটাকেই বড় ক'রে প্রচার করেছিলেন। একটি ৭ হাজার টনের ক্রুজার তৈরী করতে খরচ পড়ে ২ কোটী টাকা, একটি আধুনিক ধরনের ব্যাটলশিপের জন্য খরচ পড়ে ৫ কোটী টাকা—এত টাকা কোথা থেকে আসবে? এই আর্থিক সঙ্গতিহীনতার

কারণ দেখিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীকে যুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণত করার কর্তব্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সত্যই সামগ্রিক (total) যুদ্ধ রূপে এবং গোলোকীয় (global) যুদ্ধ রূপে অভূতপূর্ব ব্যাপকতা নিয়ে দেখা দিল, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবস্থার চাপে পড়েই ভারতীয় নৌবাহিনীকে নৌযুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণত করার প্রথম প্রয়াস করলেন। নতুন ক'রে নৌসেনাদল গঠিত হয়, ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করা হয়, নৌযুদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারতীয় নৌবাহিনীর ওপরেই ন্যস্ত করা হয়। সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদাগরী জাহাজগুলিকে নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত ক'রে নৌযুদ্ধের পক্ষে চলনসই একটা আয়োজন করা হয়। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকে কতগুলি নতুন স্লুপ আমদানি করা হয়। ভিজাগাপট্টমে কতগুলি নতুন ট্রলার তৈরী হয়। নৌসেনার সংখ্যা ১৯৩৯ সালের তুলনায় প্রায় বিশগুণ হয়। সমগ্র নৌবাহিনীর জনবল ৩০হাজার দাঁড়ায়। তবু অধিকাংশ অফিসারের পদে অভারতীয় য়ুরোপীয়েরাই প্রতিষ্ঠিত থাকে, শতকরা ৬২ জন য়ুরোপীয় এবং ৩৮জন ভারতীয় অফিসার।

ভারতীয় বিমানবাহিনী

প্রথম জার্মান মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের জনসাধারণ জনৈক বাঙালী বিমানসৈনিকের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই বৈজ্ঞানিকের নাম ইন্দ্রলাল রায়, প্রথম মহাযুদ্ধে ইনি নিহত হন। বিমানসৈনিক মুখার্জীও প্রথম মহাযুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিমানসৈনিক ইন্দ্রলাল ও মুখার্জী ভারতীয় (বাঙালী) ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে কোন ভারতীয় বিমানবাহিনী ছিল না। তাঁরা ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (Royal Air Force) সৈনিক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত কোন ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনের উদ্যোগ দেখা দেয়নি। এর কারণ সুস্পষ্ট। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের বিমানযুদ্ধে শিক্ষিত করার নীতি সৎসাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি।

মাত্র ১৯২৭ সালে এসে এবিষয়ে একটা আলাপ আলোচনার সাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মুখে শোনা যেতে থাকে। স্কীন কমিটি (Skeen Committee) একটি ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু তবু ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠিত হয়নি। তিন বছর পরে ১৯৩০ সালে ছয়জন ভারতীয় যুবককে বৈমানিক রূপে শিক্ষালাভের জন্য ক্র্যানওয়েলে (Cranwell) প্রেরণ করা হয় এবং তাঁরা ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকেন। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষের জন্য 'ভারতীয় বিমানবাহিনী'র (Royal Indian Air Force) আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। ক্র্যানওয়েলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐ প্রথম ছয়জন

ভারতীয় বৈমানিককে ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনী থেকে নবগঠিত ভারতীয় বিমাবাহিনীতে বদ্‌লি করা হয়। ভারতীয় আইন সভায় প্রস্তাবিত এবং গৃহীত একটি আইন অনুসারে এই ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় বিমানবাহিনী নাম নিয়ে সে'দিন একটি মাত্র ছোট ফ্লাইট (flight) বা বৈমানিক দল করাচীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করে।

১৯৩৩ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিমান-বাহিনীকে কতগুলি সামরিক কাজ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান হলো—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলের ওপর অভিযান।

১৯৩৮ সালে আর একটি ফ্লাইট ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যুক্ত হয় এবং ১৯৩৯ সালে আরও একটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের পর এই ভারতীয় বিমান স্কোয়াড্রান থেকে ব্রিটিশ অফিসারেরা ইংলণ্ডীয় বিমানবাহিনীতে কাজের জন্য চলে যান। শ্রীসুব্রত মুখার্জী 'স্কোয়াড্রান' নায়ক (Squadron Leader) রূপে এই ভারতীয় বিমানবাহিনীতে প্রথম কম্যাণ্ডিং অফিসার হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯৩৯ সালে) ভারতীয় বিমান-বাহিনীর যুদ্ধযোগ্য সঙ্গতি ছিল মাত্র ১টি স্কোয়াড্রান—অফিসার বৈমানিক, বৈমানিক ও সাধারণ কর্মচারী নিয়ে সবশুদ্ধ ২ শত জন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জনবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালের ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তি দাঁড়ায় ৫ স্কোয়াড্রান—করাচী, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ ও কলিকাতা। ভারতের তিন হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রোপকূলের বৈমানিক রক্ষার দায়িত্ব এর আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (R. A. F.) ওপর ন্যস্ত

ছিল। ১৯৪০ সালে এই দায়িত্ব ভারতীয় বিমানবাহিনীর ওপর অর্পিত হয়।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্মাতে আসন্ন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত ব্রিটিশ ও চীন ফৌজকে সাহায্য করার জন্য ১নং ভারতীয় বিমান স্কোয়াড্রান নিযুক্ত হয়। তৎকালীন স্কোয়াড্রান লীডার মিঃ মজুমদার এই বৈমানিক অভিযানে নায়কতা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালে, ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গতি দাঁড়ায় ৯টি স্কোয়াড্রান এবং জনবল দাঁড়ায় ৩০ হাজার। ১৯৪১ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে লাইস্যাণ্ডার (Lysander) প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর বিমানই ছিল বেশী। কিন্তু কিয়ৎকালের মধ্যে 'ভেনজেন্স' (Vengence) প্রভৃতি বোমারু এবং হারিকেন (Hurricane) প্রভৃতি গোলাবর্ষী বিমান ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীতে ৪০ জন ভারতীয় বৈমানিক ছিলেন এবং এঁরা যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন সেটা 'ভারতীয় বিমানবাহিনী'র কৃতিত্ব যদিও নয়, তবু ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব তো বলতেই হবে। ব্রিটেনের যুদ্ধ (Battle of Britain) নামে যে সংগ্রাম ইংলণ্ডের জীবনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, সেই সংগ্রামে ভারতীয় বৈমানিকেরা ইংলণ্ডের ব্যোমপথে বিচরণ ক'রে জার্মান বিমানের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাছাড়া জার্মানীর ওপর মিত্রশক্তির শেষ মারাত্মক আক্রমণে উক্ত ভারতীয় বৈমানিকেরা এসেন, বার্লিন, হামবুর্গ, কলোন, মিউনিক, ন্যুরেনবুর্গ, ব্রেমেন, তুরিন, জেনোয়া ও স্পিজিয়া প্রভৃতি সহরের ওপর বোমাবর্ষণের

কাজ করেছেন। এই ভারতীয় বৈমানিকদের অন্যতম শ্রীকালীপদ চৌধুরীর সংগ্রামকালে নিহত হবার ঘটনা ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (R. A. F.) এই সব অভিজ্ঞ ভারতীয় বৈমানিকের অধিকাংশ যুদ্ধান্তে ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে বদ্‌লি হয়ে আসেন।

ভারতীয় ফৌজের গঠনতান্ত্রিক ইতিহাস

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় জার্মান মহাযুদ্ধ কাল পর্যন্ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ভারতীয় ফৌজ কিভাবে বার বার পুনর্গঠিত হয়েছে, কোন্ প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়েছে এবং কি পরিণাম লাভ করেছে, তার সকল দিক্ পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বার বার বিভিন্ন কালে ভারতীয় ফৌজের গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য কোন্ নীতিতে এবং কিভাবে প্রয়াস করেছেন তারই তথ্যগত বিষয়গুলি বর্তমান প্রসঙ্গে কালানুক্রমিক ভাবে বর্ণিত হলো।

পীল কমিশন (১৮৫৯)

পীল কমিশনের রিপোর্টে ব্রিটিশ কূটনীতির মূলসূত্রগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় এবং ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ সেই মূলসূত্র অনুযায়ীই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত কাজ ক'রে এসেছেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ভারতীয় ফৌজকে পুনর্গঠিত করার ও পরিবর্তন করার প্রয়োজন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্য পীল কমিশন নিযুক্ত হয়। পীল কমিশনের বক্তব্য, বিচার, যুক্তি, নীতি ও সুপারিশের ভেতর ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের ফৌজী নীতির মর্মকথা ও তত্ত্ব যেভাবে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের মুখে ধ্বনিত হয়েছে, তারই কয়েকটি পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

ডিউক অব কেমব্রিজ :

"গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়েছে যে তিনটি প্রেসিডেন্সির তিনটি বাহিনীকে যতদূর সম্ভব ভিন্ন ক'রে এবং স্বতন্ত্র ক'রে রাখতে হবে। যে ভয়ঙ্কর সিপাহীবিদ্রোহের আঘাত থেকে আমরা এখন সুস্থ হয়ে উঠতে পারছি, সেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ উক্ত তিনটি প্রেসিডেন্সি বাহিনীর এক একটি বাহিনীর দেশী সিপাহীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্র অন্য একটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর সিপাহীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। (১)

জেনারেল স্যার এস কটন :

"ভবিষ্যতে কখনো আর নেটিভদের (ভারতীয়দের) ব্রিটিশ গোলন্দাজ ফৌজে ভর্তি করা উচিত হবে না। ভারতের কোন নেটিভকে আর ভবিষ্যতে এই ধরনের সাংঘাতিক অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত করা হবে না।" (২)

ব্রিগেডিয়ার জে জ্যাকব :

"একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোন অবস্থায় ভারতীয় নেটিভ সৈনিক ও য়ুরোপীয় সৈনিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করা

(1) "The experience of the last few years convinces me that the native armies of the three presidencies should be kept as separate and distinct as possible and there can not be a doubt that the suppression of the fearful mutiny from which we are now recovering may, in a great measure, be attributed to the totally distinct character and feeling of the native armies of each presidency—Duke of Cambridge.

বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সৈনিক হয়ে থাকে, সুতরাং ভারতীয় সৈনিকেরা যতই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবে, ততই সম্মান করার অভ্যাসটাও কম হয়ে আসবে।" (৩)

লর্ড এলেনবরা :

য়ুরোপীয় ফৌজে যা কিছু উন্নত ধরনের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সমূহ প্রবর্তন করা হয়ে থাকে, ভারতীয় ফৌজের মধ্যেও সেই সব পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও চর্চা প্রবর্তন করা বুদ্ধিসঙ্গত কাজ হবে না বলে মনে হয়।" (৪)

ব্রিগেডিয়ার কুক :

"কোন একটা ভারতীয় সেনাদলে বিভিন্ন জাতের সৈন্য মিশিয়ে

(2) "In no way in future should the natives of the country be entrusted with British Artillery nor should any native of India be instructed in the use of such dangerous weapons" —General Sir S. Cotton.

(3) "I think a close and intimate association of natives with the European soldiers, except in the field, should be avoided as much as possible; the closer the association with the lower class of our countymen, the less respect is inspired by the latter"—Brigadier J. Jacob.

(4) "It does not appear to be judicious to introduce to the knowledge and practice of our Native Indian soldiers, all the scientific and professional improvements of European armies'—Lord Ellenborough.

দিলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একসঙ্গে মিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সুযোগ পায়। জাত হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল যদি করা হয় তবে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য বোধ রয়েছে, সেগুলিকে পুরো দমে টিকিয়ে রাখাই আমাদের চেষ্টা হবে, কখনই তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে এক হতে দেবার সুযোগ দিতে পারা যায় না।" (৫)

জেনারেল ম্যান্সফিল্ড :

"বিভিন্ন দেশীয় সেনাদলের গঠনতন্ত্র যত বেশী সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের করা হবে, ততই ভাল। যদি ভবিষ্যতে এই সব সেনাদলকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ করার কোন চেষ্টা হয়, তবে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের বিভিন্ন রকমের গঠনতন্ত্রের পার্থক্যের জন্যই সেই উদ্দেশ্য বাধা প্রাপ্ত হবে।" (৬)

(5) "The result of mixing them in one corps has been to make them all join against Government......... which they never would have done. had the races been kept in distant corps. Our endeavours should be to uphold in full force the separation which exists between the different religions and races."—Brigadier Coke

(6) "The more diversity that can be introduced into the constitution of the different corps the better, so that in any case of any future attempt at combination, the heterogeneous character of the various regiments may present an effective bar to it—General Mansfield.

জেনারেল ম্যান্‌স্‌ফিল্ড :

"ভবিষ্যতে প্রত্যেক রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার এবং প্রধান সেনাপতির পক্ষে অবশ্যই একটি মাত্র মূলবাণী অনুসরণ করতে হবে। সেই মূলবাণী হলো—"বিচ্ছিন্ন কর আর শাসন কর" (৭)।

কর্ণেল ডুরাণ্ড :

"বিচ্ছিন্ন কর এবং শাসন কর, ভারত গবর্ণমেণ্টের, পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করাই উচিত।" (৮)

লর্ড এলফিনস্টোন :

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতে যদি আমাদের পক্ষে একটা নিরাপদ সামরিক পলিসি গ্রহণ করতে হয় তবে দেশীয় ফৌজে সমসামাজিকতা সৃষ্টির ঠিক বিরুদ্ধ নীতিটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 'ডিভাইড এট এম্‌পারা' ('বিচ্ছিন্ন কর আর শাসন কর'। ছিল প্রাচীন রোম্যানদের নীতিবাক্য, আমাদেরও এই নীতি গ্রহণ করতে হবে।" (৯)

পাঞ্জাব কমিটি :

"ভারতবর্ষে একটা বিরাট দেশীয় ফৌজ ছাড়া আমাদের কাজ চলতে পারে না। সেই জন্যেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, এই দেশীয় ফৌজ যাতে আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় তার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে, ভারতে একটা য়ুরোপীয় ফৌজকে দেশীয় ফৌজের

(7) The motto of the regimental commander and, therefore, of the Commander-in-Chief must be for the future 'Divide et Imperal—General Mansfield.

প্রতিষেধক ব্যবস্থা রূপে রাখতে হবে। এই চমৎকার প্রতিষেধক ব্যবস্থার পর আর একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা থাকবে, অর্থাৎ দেশীয় ফৌজের একটা দলকে আর একটা দলের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা রূপে রাখতে হবে।" (১০)

পীল কমিশন ভারতীয় দেশী সিপাহী ফৌজের কৃতিত্ব অস্বীকার করেননি। রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, শুধু দেশীয় ফৌজগুলির দ্বারাই বড় বড় কাজের সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে ("Great actions were achieved by Native troops alone")। কিন্তু এই সঙ্গে ভারতীয় সিপাহীর চরিত্রকে পীল কমিশন কিভাবে বুঝেছিলেন, তাও স্বীকার করে গেছেন।

"জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তা করা ভারতীয় ফৌজের লোকের মধ্যে আদৌ নেই। এই ফৌজ সম্পূর্ণ একটি ভাড়াটিয়া ও পেশাদার ফৌজ। এদের কাজের একমাত্র প্রেরণা হলো মাইনে আর একটা ফৌজী অহঙ্কার যেটা কৃত্রিম ভাবে তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (১১)

(8) "Divide et Impera should be the principle of the Indian Government.—Colonel Durand.

(9) " ... I am convinced that the exact converse of this policy of assimilation is our only safe military policy in India. 'Divide et Impera' was the old Roman motto, and it should be ours"—Lord Elphinstone.

(10) "As we can not do without a large native army in India, our main object is to make that army safe, and next to the grand counterpoise of a sufficient European force, comes the counterpoise of natives against natives"—Punjab Committee.

ইডেন কমিশন (১৮৭৯):

ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে ফৌজী পলিসি গ্রহণ ক'রে চলেছিলেন, তার প্রামাণ্য সূত্রগুলি ইডেন (Eden) কমিটিতে বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিকের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়।

স্যার নেভিল চেম্বারলেন (Sir Naville Chamberlain) বলেছিলেন : "ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন য়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্টের মত নয়। ভারতে গবর্ণমেণ্ট হলো বিদেশী। এই গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ অফিসার দ্বারা গঠিত, যার কর্তৃত্ব ভাড়াটিয়া দেশী ফৌজের সাহায্যপুষ্ট ব্রিটিশ সৈন্যদল দ্বারাই সুরক্ষিত।……আমাদের পূর্ব সাম্রাজ্যকে আমরা তরবারির জোরে লাভ করেছি এবং তরবারির জোরেই তাকে রাখতে হবে।"

জেনারেল জ্যাকব (General Jacob) তাঁর সাক্ষ্যে বলেন :

"ভারতের জনসাধারণ বিদ্রোহ না ক'রে উঠলে, এবং বাইরে থেকে কোন শত্রু ভারতের ওপর আক্রমণ না করলে, ভারতে যে পরিমাণ য়ুরোপীয় সৈন্য ও য়ুরোপীয় লোক আছে তারা এত দুর্বল নয় যে আমাদের পক্ষে উদ্বিগ্ন হতে হবে।"

পাঞ্জাবের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যার টি লরেন্স (Sir T. Lawrence) বলেন :

"বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে বোঝা যায় যে, ভারতে যদি শক্তিশালী গোলন্দাজ দল নিয়ে ক্ষুদ্রসংখ্যক য়ুরোপীয় সেনাদলও থাকে, তবে ভারতের

(11) This national determination is wholly absent in the Indian Army. It is a mere mercenary and professional army whose only incentive to action is pay and artificially fostered military arrogance.

কামানহীন দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেও এই য়ুরোপীয় সেনাদলকে পর্যুদস্ত করতে পারবে না।"

লর্ড এলেনবরা: "রিজার্ভ অর্থাৎ সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত জনবল সৃষ্টির রীতি হলো, বেসামরিক জনসাধারণের ভেতর থেকে কিছু লোক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে অল্পকালীন সার্ভিসের মেয়াদে অথবা নির্দিষ্ট কালীন সার্ভিসের মেয়াদে বিভিন্ন সামরিক পদের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। অনেক সভ্য দেশে এবং ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থাটি রিজার্ভ সৃষ্টির পক্ষে সত্যিই একটা সহায়ক ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতে অবস্থাটা হলো বিপরীত। এখানে একটি বিদেশী জাতি 'সদিচ্ছাসম্পন্ন প্রতাপের' ওপরে ভিন্ন একটা জাতিকে শাসন করছে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের জনসাধারণের আগের কালের মত সামরিক মনোভাব ক্রমে ক্রমে কমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং এটাই ভারতে ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার পক্ষে অন্যতম রক্ষাকবচ।" (১২)

জেনারেল ক্রক: "সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য আমার কাছে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কতগুলি ভেদবাদের কারণে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় একটি সমসমাজ জাতিতে (race) পরিণত হতে পারেনি। হলে এই দেশের

(12) The effect of forming 'Reserves' for either short service or limited service is to pass a number of the civil population through the military ranks;....In many civilised countries, especially in a country like England, this is a justly considered collateral advantage of the reserve system. But in India the case is quite opposite, that an alien race governs subject races under a benevolent despotism. In India under British Rule the former martial tendencies become lessened till they almost disappear and this circumstance is considered to be one of the safeguards of our rule—Lord Ellenborough.

(ভারতবর্ষের) বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ('national feeling') স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হতো। যে সকল ভেদবুদ্ধি ও আচরণের জন্য এই জাতীয় ঐক্য সম্ভব হয়নি, সেই সব বৈষম্যমূলক মনোভাবকে টিকিয়ে রাখতে এবং বাড়িয়ে তুলতে হবে।" (১৩)

কিচেনার পরিকল্পনা (১৯০৩)

১৯০৩ সালে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার ভারতের বড় লাটের কাছে তাঁর পরিকল্পনা দাখিল করেন—'ভারতীয় ফৌজ পুনর্গঠন পরিকল্পনা'। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল :

(১) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ ফৌজ না হলেই নয়, সেই পরিমাণ ফৌজ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত রেখে, ফৌজের বাকী অধিকাংশকে ফীল্ড সার্ভিসের জন্য ছেড়ে দেওয়া।

(২) শান্তির সময়েও এমন একটা যুদ্ধ ব্যবস্থা ('war organisation') চালু ক'রে রাখা, যার মধ্যে প্রত্যেকটি ইউনিটের স্থান নির্দিষ্ট থাকবে, যাতে যুদ্ধের আহ্বান আসা মাত্র যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারা যায়। (১৪)

স্যার জর্জ আর্থার ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন : অভ্যন্তরীণ দেশরক্ষা ও বহিরাক্রমণ হতে দেশরক্ষা—এই দুই উদ্দেশ্যের দু'টি পরিকল্পনাকে

(13) "It appears to me of vital importance to the safety of the Empire that we should maintain and encourage the distinction of race feeling and habits which heretofore kept the various great sections of the people of this country from coalescing and becoming a homogeneous race to whom national feeling and national cohesion would be natural and possible"—General Brooke.

পরস্পর নির্ভরশীল করা হলো। নামে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগঠনের প্রণালী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যবস্থা ও শান্তিকালীন সামরিক ব্যবস্থা একই পরিকল্পনার মধ্যে প্রচলিত ক'রে রাখা হলো। রেগুলার ফৌজ থেকে আরম্ভ ক'রে সশস্ত্র পুলিশ পর্যন্ত প্রত্যেককে সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে নিয়োজিত করবার একটা গঠনমূলক ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার ভেতর পাওয়া গেল। (১৫)

মেসোপটেমিয়া কমিশন (১৯১৭)

প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়াতে প্রেরিত ভারতীয় ফৌজ ইংরাজ জেনারেল মহাশয়দের পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের বিবরণ নানা শোচনীয় দুর্ঘটনার একটি তালিকা। ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রে এমন কতগুলি ত্রুটী বহুদিন থেকে ছিল যা ঐ যুদ্ধে বহু ভ্রান্তি, অবিবেচনা ও অনৈপুণ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মেসোপটেমিয়ার ব্যাপার তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং ঐ কমিটি ফৌজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে কতগুলি সুপারিশ করেছিলেন।

"(14) To reduce the garrison troops to the minimum essential for the country's internal Security, so as to set free the maximum force for service in the field ; to introduce a war organisation in which every unit should have its alloted place and be ready for an immediate start on the signal for war"—Sir George Arthur ('Life of Lord Kitchener')

(15) "Its main advantages seem to me that it gives us a war organisation and a peace organisation in the same scheme. It provides for the co-ordination, in the task of Imperial 'defence, of all the various armed forces which we possess in India, from the Regular Army to the armed civil police"—Sir George Arthur ('Life of Lord Kitchener')

গলদের মূল কোথায়, মেসোপটেমিয়া কমিটির বিবরণীতে তার ইঙ্গিত আছে। গলদ হলো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের। তা না হলে, ভারতীয় ফৌজ মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে সমূহ কৃতিত্ব দেখাতে পারতো, তাতে সন্দেহ নেই।

কম্যাণ্ডার ওয়েজউড্ মেসোপটেমিয়া কমিশন রিপোর্টে তাঁর অভিমত পেশ করার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন :

"ভারতীয় ফৌজের রেজিমেণ্ট অফিসারদের ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর অফিসার ও সাধারণ সৈনিককে যেমন ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে তেমনি অস্ত্রসজ্জায় অনগ্রসর ক'রে শুধু কাগজে কলমে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে। তবুও ভারতীয় ফৌজ যেভাবে যুদ্ধ করেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাল ক'রে গঠিত শিক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত হলে ভারতীয় ফৌজের তুলনায় উৎকৃষ্টতর কোন সেনাদল আদৌ হতে পারে না, হলেও খুব কমই হতে পারে। (১৬)

টেরিটোরিয়াল ও অক্সিলিয়ারি ফোর্সেস আইন (১৯২০)

ভারতীয় বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতীয় ফৌজকে 'ভারতীয়' (Indianise) করা, এই দু'টি দাবী ভারতীয় জনমত রূপে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কতদূর কি করতে পারেন সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য এক এক সময়ে এক একটা কমিটি নিয়োগ করা হতে থাকে।

(16) "Inspite of being ill-equipped, ill-trained and resting on paper reserves the Regimental officers and the rank and file of the Indian Army have fought in a manner to show that if properly drafted, trained and equipped they would have few or no superiors"—Commander J. C. Wedgeood.

এই সব কমিটির তদন্তলব্ধ বিবরণী ও সুপারিশগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেননি। কোন কোন কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ আংশিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই বা কি আসে যায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের নিজ উদ্যোগে নিযুক্ত ব্রিটিশ সদস্য দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশগুলিও কার্যে পরিণত করেননি। মাঝে মাঝে সুপারিশগুলির এবং ভারতীয় জনসাধারণের দাবী-গুলির পিত্তিরক্ষার মত এক একটি ব্যবস্থা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, টেরিটোরিয়াল বাহিনী গঠন।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত জনবল বা রিজার্ভ সৃষ্টি করা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আদৌ পছন্দ করেন না, পূর্বগত কমিশনগুলির সুপারিশ এবং সাক্ষ্যের মধ্যে সেটা ভালভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯২১ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের দাবী সম্বন্ধে একটা সাড়া দেবার ভঙ্গী দেখালেন।

১৯২১ সালে টেরিটোরিয়াল ফোর্স আইনটিও পাশ হয়। * ভারতীয় রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যাটালিয়ন 'অসামরিক' জনসাধারণের শিক্ষারজন্য নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ৪০ কোটী অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে এই কয়টি টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়ন নিতান্তই লোক দেখানো একটা ব্যবস্থা। কমিটির সুপারিশ ছিল পদাতিক, নৌ এবং, বিমান এই প্রত্যেকটি বিষয়ে টেরিটোরিয়াল দলগুলিকে শিক্ষিত করা হবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মাত্র বন্দুকধারী পদাতিকতার বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

অপরদিকে অক্সিলিয়ারী দলগুলির কথা ধরা যাক্। অক্সিলিয়ারী দলগুলি কিন্তু গোলন্দাজী প্রভৃতি উন্নত অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হতে

* Territorial and Auxiliary Forces Act.

থাকে। এর কারণ অক্সিলিয়ারী দলগুলি ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয় এবং অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজের লোক দ্বারা গঠিত করা হয়।

শী কমিটি (১৯২১)

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টরই উদ্যোগে নিযুক্ত যে সব তদন্ত কমিটি নানারকম পরিকল্পনা পেশ ও সুপারিশ করেছিলেন, তার মধ্যে শী (Shea) কমিটি বিশেষ ক'রে ভারতীয় যুব সমাজে সামরিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে 'রাইফেল ক্লাব', 'ক্যাডেট কোর' এবং 'অফিসার ট্রেনিং কোর' প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

ভারতীয় ফৌজকে যথার্থ ভারতীয়করণ (Indianisation), য়ুয়োপীয় অফিসার দল সরিয়ে দিয়ে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করার নীতি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে শী কমিটি আলোচনা করেন। শী কমিটির সুপারিশ হলো—ভারতীয়েরা ধীরে ধীরে যোগ্যতা অর্জন ক'রে অফিসার পদে নিযুক্ত হতে থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয়করণ সম্ভব নয়। যাতে '৩০ বৎসরের মধ্যে' ভারতীয় ফৌজের সব অফিসার পদে ভারতীয়েরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তারই জন্য পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

স্কীন কমিটি (১৯২১)

স্কীন (Skeen) কমিটি সুপারিশ করেন—(ক) ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে একটি মিলিটারী কলেজ স্থাপন করতে হবে। (খ) ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র অফিসারের অর্ধেক পদে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে। (গ) প্রতি বৎসরে ২০ জন ক'রে ভারতীয় ছাত্র স্যাণ্ডহার্স্টে (Sandhurst) যুদ্ধবিদ্যা শিখবার

জন্য প্রেরিত হবে। (ঘ) অফিসার পদের জন্য 'অসামরিক জাতির' ভেতর থেকেও লোক সংগৃহীত হবে।

স্কীন কমিটিতেই ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করবার মত উদারতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মিঃ জিন্না এই কমিটির সদস্য ছিলেন, অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ব্রিটিশ।

সাইমন কমিশন (১৯২৮)

সাইমন কমিশন এই মন্তব্য করেছিলেন: "আগামী বহু কাল পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ উপাদান খুব বেশী পরিমাণে বর্জন করা সম্ভব হবে না। ব্রিটিশ উপাদান অর্থ, ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত জল-স্থল-নৌ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের উপযোগী শস্ত্রশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদলগুলি, ভারতীয় ফৌজের রেজিমেণ্ট অফিসারদের একটা বড় অংশ, যারা হলো ব্রিটিশ এবং ভারতীয় ফৌজে উচ্চতর কম্যাণ্ডে নিযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রেণীর ব্রিটিশ অফিসারগণ।" (১৭)

সাইমন কমিশনের আর একটি মন্তব্য: "ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন একটি স্থলসীমান্ত যার ওপর কোন বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা আক্রমণের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষাব্যবস্থার ভার এমন কোন ভারতীয় ফৌজের হাতে ছেড়ে দিতে পারা যায় না, যে ফৌজ ভারতের

(17) "It will be impossible, for a long time to come, to dispense with a very considerable British elements, including in that term, British troops of all arms, a considerable proportion of the regimental officers of the Indian Army and the British personnel in the Higher Command"—Simon Commission, Report.

জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কোন গভর্ণমেণ্টের দ্বারা চালিত এবং নিয়োজিত।" (১৮)

সাইমন কমিশনের পরবর্তী যুক্তি হলো: "ভারতীয় ফৌজের ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা যদি যথেষ্টও হয়, তাহলেই হবে না। ভারতীয় ফৌজকে সুদক্ষ ফৌজ হতে হবে।" (১৯)

চেটউড কমিটি (১৯৩১)

১৯৩১ সালের রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের দেশরক্ষা সাবকমিটির (Defence Sub-Commitee) নির্দেশ অনুযায়ী স্যার ফিলিপ চেটউডের (Sir Philip Chetwode) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ভারতীয় ফৌজের ভারতীয়করণ সম্পর্কে কোন আলোচনা বা সুপারিশ করেনি। শুধু ভারতের জন্য একটি মিলিটারী কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এই কমিটি রচনা করে। ১৯৩২ সালে দেরাদুনে ভারতীয় মিলিটারী একাডেমি (Indian Military Academy) প্রতিষ্ঠিত হয়।

চেটফিল্ড কমিটি (১৯৩৮)

চেটফিল্ড (Chatfield) কমিটি সুপারিশ করেন:—

(১) ভারতীয় ফৌজ পাঁচটি কর্তব্যক্ষেত্রে পাঁচটি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবে—সীমান্ত রক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, উপকূলরক্ষা, সাধারণ রিজার্ভ ও বহির্দেশিক রক্ষাব্যবস্থা (External Defence)।

(18) "The N.W.F. of India is the one land frontier of India in the Empire which is open to attack by a great power. Its defence, therefore, cannot be left to an Indian Army, administered and directed by a popularly elected government"—Simon Commission, Report.

(19) "Even if the Indian Army is sufficient it must be efficient'—Simon Commission, Report.

(২) আধুনিক প্রথায় উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত বিশিষ্ট যোদ্ধাদলও ভারতীয় ফৌজে থাকবে। যথা, ভারতীয় ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট, যন্ত্রোপেত এবং সাঁজোয়া যান (armoured car) সমন্বিত ক্যাভাল্‌রি, মোটরযান সমন্বিত যাতায়াত ও বহন ব্যবস্থা (transport), ফিল্ড আর্টিলারী, যন্ত্রসজ্জিত ও আধুনিক উপকরণ সমন্বিত স্যাপার ও মাইনার দল এবং মর্টার ব্রেনগান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ফৌজ

ভারতীয় ফৌজের সম্পর্কে বিভিন্ন কালের এই গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের নীতি ও পরিকল্পনার ভেতর ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক নীতির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ কোন কালে স্বাধীন হবে, ভারতে কোন দিন ব্রিটিশ ফৌজ ও ব্রিটিশ সামরিক অফিসার থাকবে না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেটা কখনো মনে করেই উঠতে পারেননি। চিরব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষই তাঁদের কাছে একটা অবিচল তত্ত্বের মত, প্রাকৃতিক সত্যের মত, বোধ হয়েছিল। ভারতবর্ষকে চিরকাল অধীন ক'রে রাখতে হবে, এই একটি মূলনীতি অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ফৌজকে গঠন করেছিলেন। এমনই ব্রিটিশ কুটনীতির মহিমা যে, ভারতের ভারতীয় ফৌজকেই বহির্দেশিক রক্ষা ফৌজ (External Defence Troops) আখ্যা দেওয়া হয় এবং সেইভাবেই তাকে গঠন ক'রে সেই কর্তব্যই ন্যস্ত করা হয়। আর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ (Internal Security Troops) হলো ভারতে অবস্থিত গোরা সৈন্যের দল।

বিভিন্ন কালে ভারতে ভারতীয় ফৌজ এবং গোরা ফৌজের সংখ্যা কত ছিল, নিম্নোল্লিখিত তালিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

কাল	গোরা ফৌজ	ভারতীয় ফৌজ
মারাঠাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল (১৮০৫)	২৪,৫০০	১৩০,০০০
প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৫)	৩০,৮২২	১৫২,৯৩৮
সিন্ধু অভিযান (১৮৪১)	৩৮,৪০৬	২১২,৬১৬
মধ্যভারত ও গোয়ালিয়র অভিযান (১৮৪৩)	৪৬,৭২৬	২২০,৯৪৭
সিপাহীযুদ্ধ (১৮৫৭)	৪৫,১০৪	২৫৯,৯১৩
সিপাহীযুদ্ধের অব্যবহিত পরে		
(১৮৬২)	৭৮,১২৪	১২৫,৯১৫
(১৮৭৬)	৬০,৬১৩	১২৩,৪৭০
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৮০)	৬৪,৫০৯	১২৬,০৮৮
রুশ জাপান যুদ্ধ (১৯০৪)	৭৪,৩১১	১৫৫,২৪০
প্রথম জার্মান মহাযুদ্ধ		
(১৯১৪)	৭৪,৩১১	১৫৫,২৪০
(১৯১৮)	?	৫৭৩,০০০
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে (১৯৩১-৩২)	৬১,৮৮১	১৪৯,৭৬২
দ্বিতীয় জার্মান মহাদ্ধযু		
(১৯৩৯)	৪৩,০	১৮৯,০০০
(১৯৪৫)	?	২,৫০০,০০০

ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রের ইতিহাসে নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার দপ্তরের পরিবর্তনও হয়ে এসেছে। ভারতীয় সমরবিভাগের দপ্তরের গঠনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যে রূপ গ্রহণ করেছে, তারই পরিচয় দেওয়া গেল।*

ফৌজী সদর দপ্তর (Army Head Quarter)

ভারতীয় ফৌজের প্রধান কার্য দপ্তরের নাম হলো ফৌজী সদর দপ্তর (বা সংক্ষেপে A. H. Q.)। ৬টি শাখা দপ্তর নিয়ে এই সদর দপ্তর গঠিত।

(১) জেনারেল স্টাফ্ (General Staff) শাখা দপ্তর—যুদ্ধঘটিত সাধারণ ও সর্ব বিষয়ে, যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্যোগ অবলম্বন এই দপ্তরের দায়িত্ব। সামরিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন, সামরিক অভিযান এবং সৈন্য পরিচালনার পরিকল্পনা, ফৌজ সংগঠন এবং ফৌজকে শিক্ষা দান এই শাখারই অন্যতম কর্তব্য।

(২) অ্যাডজুটেন্ট-জেনারেলের (Adjutant-General's) শাখা দপ্তর—শান্তিকালের ফৌজের জন্য রিক্রুটিং বা সৈন্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা, ফৌজের মেডিক্যাল সার্ভিস, পদক ও পুরস্কার ইত্যাদি নির্ধারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা, ফৌজের জন্য সাধারণ

* ১৯৪৫ সালে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী প্রসারিত করা হয়। ১৯৩৯ সাল ও ১৯৪৫ সালের অন্য সমরবিভাগীয় জনবলের সংখ্যা ছিল :

	১৯৩৯	১৯৪৫
ভারতীয় নৌবাহিনী	২,৩০০	৩০,০০০
ভারতীয় বিমানবাহিনী	১,৬০০	৩০,০০০
রানীবাহিনী (অক্সিলিয়ারী)	?	১০,০০০

শিক্ষার ব্যবস্থা ও ফৌজী প্রস্তুতি (mobilisation) প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্যস্ত।

(৩) কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের (Quarter Master General's) শাখা দপ্তর—ফৌজের থাকবার ব্যবস্থা (accomodation), সরবরাহ, যাতায়াত ও সম্ভার বহনের ব্যবস্থা (transport), মবেশী ব্যবস্থা (veterinary), ফৌজের খাদ্যের জন্য কৃষিক্ষেত্র দুগ্ধ-ডেয়ারী ইত্যাদি ব্যবস্থা, শিবির ও ফৌজের জন্য ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং পরিচালনা করবার দায়িত্ব এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্যস্ত।

(৪) মাস্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স (Master General of Ordnance) শাখাদপ্তর—অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পরিচ্ছদ উৎপাদনের কারখানা, অস্ত্রাগার, তোপখানা ও ডিপো, এই সব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ও তার জন্য নির্দেশ বিধান করার দায়িত্ব এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া মিলিটারী উপকরণ (stores) উৎপাদন এবং বণ্টন করার কাজের ভার এই দপ্তরের ওপরেই থাকে।

(৫) প্রধান এঞ্জিনিয়ারের (Engineer-in-Chief's) শাখা-দপ্তর—শান্তিকালে এবং যুদ্ধকালে সকল এঞ্জিনিয়ার সার্ভিস বা বাস্তুনির্ম্মাণ কার্যের ব্যবস্থা পরিচালনা এবং সম্পন্ন করা এই শাখা দপ্তরের কাজ।

(৬) মিলিটারী সেক্রেটারীর (Military Secretary's) শাখা দপ্তর—ফৌজের সৈনিক অফিসারের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পেন্সন, ছুটী ইত্যাদি বিষয় পরিচালনার ভার এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্যস্ত।

আঞ্চলিক 'কম্যাণ্ড' বা ফৌজী প্রদেশ

ভারতের সাধারণ শাসন ব্যবস্থার অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা

(provinces) রূপে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই রকম ভারতের ফৌজী সন্নিবেশও কয়েকটি ফৌজী অঞ্চলে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই ফৌজী অঞ্চল বা প্রদেশগুলিকেই সামরিক পরিভাষা অনুযায়ী 'কম্যাণ্ড' (Command) বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা ভারতবর্ষ এই রকম চারটি কম্যাণ্ড বা ফৌজী প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। এক একটি ফৌজী প্রদেশের পরিচালনা ভার এক একজন প্রধান পরিচালকের (General Officer Commanding) ওপর ন্যস্ত ছিল।

(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল কম্যাণ্ড

(২) দক্ষিণ অঞ্চল কম্যাণ্ড

(৩) পূর্ব অঞ্চল কম্যাণ্ড

(৪) মধ্য অঞ্চল (দিল্লী) কম্যাণ্ড

অফিসার সমাজ

ভারতীয় ফৌজের ভারতীয় অফিসার সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত (King's Commission) অফিসার—প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় অফিসারকে রাজকীয় কমিশন দেবার নীতি গৃহীত হয়। স্যাণ্ডহার্স্ট ও উলউইচের মিলিটারী বিদ্যালয় থেকে যেসব ভারতীয় যুবক শিক্ষালাভ করে, তারাই রাজকীয় কমিশন লাভ ক'রে ফৌজের উচ্চশ্রেণীর অফিসারের পদ লাভ করে। তাছাড়া, ভারতীয় ফৌজ থেকে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন সাধারণ অফিসারকে নির্বাচিত ক'রে উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রেরিত করা হয়ে থাকে এবং এঁরা রাজকীয় কমিশন লাভ ক'রে থাকেন। রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারেরা ব্রিটিশ বাহিনীতে প্রচলিত পদোপাধি গ্রহণ ক'রে থাকে। আর একটা

প্রথা আছে, ভারতীয় ফৌজের কোন সাধারণ অফিসার বিশেষ 'কৃতিত্ব' দেখালে তাকে সম্মান স্বরূপ (Honorary) রাজকীয় কমিশন দেওয়া হয়। লেঃ কর্ণেল পদের চেয়ে উচ্চতর কোন পদে ভারতীয় অফিসারকে উন্নীত করা হয় না।

(২) ভারতীয় কমিশন (Indian Commission) প্রাপ্ত অফিসার—ভারতের একমাত্র মিলিটারী বিদ্যালয়, দেরাদুনের মিলিটারী অ্যাকাডেমি থেকে শিক্ষালাভ ক'রে যাঁরা অফিসার পদ লাভ করেন, তাঁরা হলেন ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত অফিসার।

(৩) ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত (Viceroy's Commission) অফিসার—হয় সোজাসুজি নিয়োগ ক'রে অথবা সাধারণ পদ (Other Ranks) থেকে নির্বাচিত ক'রে এই শ্রেণীর অফিসার গৃহীত হয়। সুবেদার, মেজর প্রভৃতি ভারতীয় পদোপাধিধারী অফিসারেরাই ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত অফিসার। মাত্র ভারতীয়েরাই এই শ্রেণীর অফিসার হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রগত সকল বিষয়ের আলোচনা এইখানে সমাপ্ত করা গেল। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় ফৌজের পরিবর্তন ও পরিণামের ইতিহাস বর্ণিত হলো।

রাইফেলম্যান
গাড়োয়াল রাইফেলস (১৯৩৯)
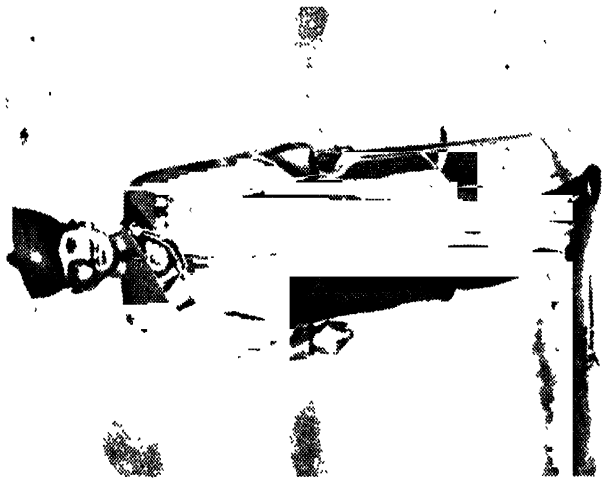
জাঠ অফিসার (১৯৩৭)

কাশ্মীর রক্ষায় ভারতীয় সৈন্য

(নির্দেশ আসিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিমানবাহিত ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরে অবতরণ করিয়া শত্রুবাহিনী বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে)

সামরিক ইতিহাস

আমাদের সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ, দীর্ঘযুগব্যাপী রাজনৈতিক ইতিহাসের ভারতবর্ষ। এই ভারতের সামরিক ইতিহাস (military history) কি ?

অবশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের ঘটনায় যে রাজ্য ও রাজার ভাঙা-গড়ার খেলা চলে আস্‌ছে, তাই তো রাজনৈতিক ইতিহাস। তবু সামরিক ইতিহাস ও রাজনৈতিক ইতিহাস এক বিষয় নয়। রণক্ষেত্রের ইতিহাস, রণোদ্যোগের ইতিহাস, অভিযানের ইতিহাস, বহিঃশত্রুর আক্রমণে অস্ত্রধারী দেশসৈনিকের সংগ্রামের ইতিহাস—সব মিলিয়ে দেশের সামরিক ইতিহাস। দেশের সামরিক ইতিহাসে অবশ্য দেশের রাজনৈতিক স্বরূপই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আবার একথাও সত্য যে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয় জাতির রাজনৈতিক পরিণাম নির্ণয় করে থাকে, তেমনি রাজনৈতিক অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের জয়-পরাজয় নির্ণয় ক'রে থাকে।

যুদ্ধের কৌশল, অস্ত্র আবিষ্কার, অস্ত্র-চালনার কৌশল, যুদ্ধ করার পদ্ধতি—সূক্ষ্ম অর্থে এসব বিষয় ঠিক সামরিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা যায়, যুদ্ধবিদ্যা বা যুদ্ধবিজ্ঞান। কিন্তু আবার যুদ্ধবিদ্যার ক্রমোন্নতি বা পরিবর্তনের ইতিহাস যদি ধরা যায়, তবে সেটা সামরিক ইতিহাসের অঙ্গীভূত একটি বিষয় বা অধ্যায় বলেই মনে হবে।

বহু যুগে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে। কেমন ছিল সেই যুদ্ধ, কিভাবে যুদ্ধ চালিত হলো, কোন্ কৃতিত্বের কারণে জয় এবং কোন্ ভ্রান্তির ফলে পরাজয় হলো—

ভারতের সেই সামরিক ইতিহাসের লিখিত কোন সম্যক্ বিবরণ নেই। অতিদূর অতীতের ভারতে যেদিন বহিরাগত অভিযাত্রীর দল রণোল্লাসে প্রমত্ত হয়ে সিন্ধু উপত্যকায় পাষাণ প্রাচীরে পরিবৃত্ত মহেঞ্জোদাড়ো নগরীর ওপর হানা দিয়েছিল, সেদিনের ঘটনার বিবরণ কিম্বদন্তী বা রূপকথার রূপেও আজ পাওয়া যায় না। মহেঞ্জোদাড়োর নাগরিক সেদিন কিভাবে দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছিল তা কেউ জানে না। সেদিনের ভারতীয় সৈনিকের হাতে কোন্ অস্ত্র ছিল? বল্লম, কুঠার, তীর-ধনুক অথবা তরবারি? কোন্ অস্ত্রের আবির্ভাব প্রথম, কোন্ অস্ত্র পরে? কে ছিল বেশী শক্তিধর ও সংগ্রাম নিপুণ—বল্লমী, কুঠারী, তীরন্দাজ বা অসিচালক? শুধু কল্পনা আর অনুমান নিয়ে গবেষণা ক'রে আজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আর্যেরা যাদের দস্যু বলতো, তারা কে? আর্য বনাম দস্যুর সংগ্রাম, ভারতের কত উপত্যকায় নদীকূলে ও প্রান্তরে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নির্ণয় ক'রে গেছে। সে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় কালস্রোতে মুছে গেছে। অতীতের সেই যোদ্ধাদলের আত্মদানের সাক্ষ্য রূপে আজ আর কোন সমাধিভূমি নেই, একটুকরো অস্থির নিদর্শনও পাওয়া যায় না।

আজ রামায়ণের কাব্যময় কাহিনীর মধ্যে আর্য অভিযানের ঘটনাবলীকে কাব্যিক রূপেই কিছু কিছু চিন্‌তে পারা যায়। আর্য নরপতি ভারতময় অভিযান ক'রে অনার্যের রাজনৈতিক আধিপত্য লোপ ক'রে দিলেন। রামচন্দ্রের অভিযাত্রী বাহিনী, তাঁর যুদ্ধ মিত্র (ally) বানরকটক, তাঁর স্ট্র্যাটেজি ও লঙ্কা আক্রমণের পদ্ধতি—রামায়ণের কাব্যিক বিবরণের মাঝে মাঝে সুদূরাতীত ভারতের সামরিক ইতিহাসের টুক্‌রো টুকরো পরিচয় পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রের বানর স্যাপারদল অভিযাত্রী ফৌজের জন্য সেতু বেঁধে ছিল, এবং মহাবীর হনুমান রণক্ষেত্রে কম্যাণ্ড পরিচালন করেছিলেন, বিভীষণের মারফৎ পঞ্চমবাহিনী প্রথায় কূটনীতি সার্থক্ করা হয়েছিল —রামায়ণের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন আর্য ভারতের সামরিকতার একটা আভাসিক পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের সামরিক ইতিহাসের অভিধান রূপে পাই মহাভারত। মহাভারত ভারতের এক বিরাট ঐতিহাসিক অন্তর্যুদ্ধের (civil war) বিবরণ। কুরুক্ষেত্র ভারতের সামরিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্র। মহাভারতের বিবরণে ভারতের সামরিকতার নিছক কাব্যিক পরিচয় নয়, বিশেষ তথ্যবহুল পরিচয় আছে। সৈন্য সংগঠনের পদ্ধতি, ব্যূহ-রচনার (battle formations) পদ্ধতি, অভিযান ও আক্রমণের টেকনিকগত উদ্যোগ, সামরিক কূটকৌশল (strategy & tactcis), সৈনাপত্য ও কম্যাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি বহু সামরিক বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। অক্ষৌহিণী রূপে পরিচিত কৌরবের ফৌজী ডিভিসনগুলির বিরুদ্ধে পাণ্ডবের ছোট ছোট ব্যাটালিয়নগুলি কিভাবে রণদক্ষ সেনানায়কের পরিচালনায় বিগ্রেড রূপে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রাম করেছে, তার বিবরণ স্পষ্ট করেই মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধে সর্বদা স্থির (steady)। অপরদিকে দুর্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি দুঃসাহসেই প্রমত্ত। কিন্তু সামরিকতার ক্ষেত্রে দেখা গেল, স্থিরতার শক্তিই শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃসাহসের শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছে। মহাভারতে সৈনিকের অস্ত্রসজ্জারও প্রভূত উল্লেখ আছে। পদাতিক (foot soldier) ছাড়া, অশ্ব, গজ ও রথে আরূঢ় বিভিন্ন শ্রেণীর রেজিমেণ্ট ছিল জানা যায়। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব প্রাচীন ভারতের সামরিক

ইতিহাসের একমাত্র লিখিত বিবরণ। আশ্চর্যের বিষয়, মহা-ভারতের মত সামরিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার প্রথা ভারতীয়দের মধ্যে পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়ে যায়। এর পরের যুগে আরও অনেক ঐতিহাসিক কাব্য ভারতে রচিত হয়েছে, কিন্তু দেখা যায় যে তার মধ্যে সামরিক ইতিহাসের বিবরণ খুব অল্পই প্রকাশ পেয়েছে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে সামরিক বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর গ্রন্থ কই? যুদ্ধক্ষেত্র এবং রণোদ্যোগের বিবরণ ভারতীয় লিখিত আর কোন গ্রন্থে মহাভারতের মত বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। এর পর কয়েক যুগ পার হয়ে, একেবারে পৃথ্বিরাজের যুগে আসা যাক্। চাঁদ বরদই "পৃথ্বিরাজ রাসো" নামক ঐতিহাসিক কাব্য হিন্দীভাষায় রচনা ক'রে গেছেন। এই কাব্যে তৎকালীন হিন্দু ভারতের এবং বহিরাগত তুরুক্ আক্রমণকারীর সামরিক পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়।

কিন্তু মহাভারতের পর হতে পৃথ্বিরাজের আগে পর্যন্ত, ভারতের যে বিরাট রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তার সামরিক উত্থান, পতন ও অভ্যুদয়ের বিবরণী কই? সেভাবে বিবরণ রূপে আর কোন গ্রন্থ বিশেষ নেই। আলেকজাণ্ডারের মাসিডোনীয় বাহিনীর অগ্রগতিকে সিন্ধুরাজ পুরু যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন, তার বিবরণ কিম্বদন্তী রূপে প্রচলিত। সেদিনের ভারতীয় ফৌজের রূপ কিরকম ছিল, তা কে বল্‌বে? সেদিনের ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রঘাত মাসিডোনীয়ার বর্মধারী সৈনিক কিভাবে সহ্য করেছিল, কিভাবে জয়পরাজয় নির্ণীত হলো, ভারতীয় ফৌজের মুখে কোন রণনাদ নির্ঘোষিত হয়েছিল, তার বিশদ পরিচয় বিস্মৃতির মধ্যেই মিশে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষ, সমুদ্রগুপ্ত ও পাল রাজচক্রবর্তী—যাঁরা শত যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের সামরিক শৌর্যের চরম নিদর্শন

দেখিয়েছিলেন, যাঁদের সামরিক প্রতিভার কাছে গ্রীক স্তব্ধ হয়েছে, শক অবনত হয়েছে, হুন ধ্বংস হয়েছে, সেই রণজয়ের বিবরণ কই? সেই ভারতীয় ফৌজের অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধবিদ্যা, সংগঠন ও রণকীর্তির ইতিহাস পাটলিপুত্রের পাষাণ স্তম্ভের মত মাটীর আড়ালে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। দু'একটি তাম্রলেখ ও শিলালেখে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া সেই সুদীর্ঘ কালের সামরিক ইতিহাসের আর কোন তথ্য পাই না।

তবে সামরিক ইতিহাসের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের সৈন্যের গঠনতন্ত্রের পরিচয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রীয় সংহিতায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গঠনতন্ত্র বিধান ও কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের সমর বিভাগের বিভিন্ন উপবিভাগ, সৈনাপত্য, দৌত্য, ভাণ্ডার, গজ-অশ্ব প্রভৃতি পশুবিভাগ, রণরথ নির্ম্মাণ, শিবির সন্নিবেশ ইত্যাদি বহু বিষয়ের পরিচয় উল্লিখিত আছে। সেনাপতি (Commander), মহাসেনাপতি (Commander-in-Chief), ব্যূহপতি (Brigadier) ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধপরিচালক মণ্ডলীর গঠনতন্ত্রও এই সব গ্রন্থে বিবৃত আছে। পরিখা-যুদ্ধের (trench warfare) উল্লেখও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

পাঠান ও মোগল আগমনের পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের আরম্ভ। বহু যুদ্ধবিগ্রহে সমাকীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি অধ্যায়। এই যুগে বাদ্‌শাহ এবং সুলতানদের বৃত্তিপুষ্ট মুসলমান লেখক বহু তওরারিখ রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে সামরিক ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইতিহাস নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের রচনা নয়, বাদ্‌শাহ এবং সুলতানের রণজয়ের কাহিনীগুলিই মাত্রাহীন প্রশংসার আবেগ দিয়ে লেখা। বাদ্‌শাহ ও সুলতানের ফৌজ কিভাবে

বিপক্ষের ফৌজকে অক্লেশে কচুকাটা করলেন, অধিকাংশ যুদ্ধের বিবরণে এই একই ধরনের বক্তব্য দেখা যায়।

ইতিহাসে লিখিত বহু যুদ্ধের ঘটনা আছে, যেক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারটা আদৌ সামরিক শৌর্যের দ্বারা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর উপায়ে, নেহাৎ অসামরিক পদ্ধতিতে, উৎকোচ বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি হীন কৌশলের সাহায্যে যুদ্ধজয় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধজয়ীর এই হীনতার কাহিনী চাপা পড়ে গেছে এবং পেশাদার বৃত্তিপুষ্ট ঐতিহাসিকের দ্বারা মিথ্যা কাহিনী রচিত হয়ে এই ধরনের যুদ্ধজয়ীকে গৌরবান্বিত ক'রে রেখেছে। যেমন বাদশাহ ও সুলতানদের অনেক সামরিক কীর্তিকাহিনীর পেছনে এই ব্যাপার আছে, তেমনি ইংরাজের ভারতজয় সংগ্রামের পেছনেও আছে। যুদ্ধ না ক'রে নিছক হীন চক্রান্তের জোরে যুদ্ধজয়ী হবার দৃষ্টান্ত অনেক। এর মধ্যে পলাশীযুদ্ধ একটা প্রধান দৃষ্টান্ত। পলাশীযুদ্ধ নামে ইংরাজের লিখিত ইতিহাসে সগর্বে কীর্তিত যুদ্ধটা প্রকৃত যুদ্ধের ব্যাপারই ছিলনা। সব শুদ্ধ ১৯ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ক্লাইভ আদৌ সামরিক প্রতিভার বলে এই জয়লাভ করেননি। কি কারণে তিনি জয়লাভ করেছিলেন, সেটা সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের লেখায় বর্ণিত আছে।

মুসলমান যুগের প্রসঙ্গে আসা যাক্। পাঠানেরা যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন পাঠানের সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর মোগলেরা যখন ভারতে আসলেন, তখন মোগলের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠানের যুদ্ধ এবং হিন্দুর যুদ্ধ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাঠান ও হিন্দু সম্মিলিতভাবে মোগলকে বাধা দেয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জাতিগত রূপ আবার বদলে গেল। একপক্ষে মোগল সৈনিক ও হিন্দু সৈনিক আর পক্ষে পাঠান সৈনিক ও হিন্দু সৈনিক—এই ভাবেই হিন্দুমিশ্রিত দুই পক্ষ গঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে এই

ধরনের সংগ্রামগুলি মোগল-পাঠানেরই সংগ্রাম ছিল। এক পক্ষে মোগল রাজশক্তি ও অপর পক্ষে পাঠান রাজশক্তি। ভারতের হিন্দু সামন্তবর্গ অবস্থা বুঝে দুই পক্ষের কোন একটি পক্ষে যোগদান করেছে।

হিন্দু-সামন্তের পক্ষপাতিত্বের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্। আর একটি সাধারণ প্রথাও এই সময় ছিল। মোগল ফৌজে যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু যেমন পেশাদার সৈনিকরূপে চাকৃরী গ্রহণ করতো, তেমনি পাঠান ফৌজেও করতো। মোগল-পাঠান যুগেই হিন্দুর সামরিক ইতিহাস প্রথম প্রথম নিতান্ত সিপাহী-গিরিতে পরিণত হয়।

একটি মাত্র ব্যতিক্রম, রাজপুতের সামরিক ইতিহাস। পাঠান ও মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল রাজস্থানের রাজপুত। এবং তাঁদেরই সামরিক শৌর্যের স্পর্শে চিতোরগড়, বুঁদি ও হল্‌দিঘাটের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজপুতের এই সামরিক ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় আকবরের সময়ে এসেই স্তব্ধ হয়। এর পর থেকে রাজপুত হিন্দুর ঐতিহ্যপুষ্ট যোদ্ধাগুণ মোগলের সাম্রাজ্যিক অভিযানের কাজেই উৎসর্গ হয়। রাজপুত আর নিজের সামরিক ইতিহাসে নতুন কীর্তি রচনা না ক'রে মোগলের সামরিক ইতিহাসকেই কীর্তিত করার কাজে নিযুক্ত হয়।

কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর সামরিক প্রতিভা ঠিক এই সময়েই ভারতের দু'টি অঞ্চলে নতুন অভ্যুদয় লাভ করে—মারাঠা ও শিখ। মারাঠা ও শিখ সমাজে হিন্দু সামরিক ঐতিহ্য প্রবল শক্তিরূপে পুনর্জীবিত হয়। এবং ভারতে শেষ বহিরাগত রাজশক্তি ব্রিটিশকে এই মারাঠা এবং শিখ শক্তিই বহু রণক্ষেত্রে আহ্বান করেছে এবং ভারতের সামরিক ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় তারাই রচনা করেছে। তারপর হলো ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থান।

ইংরাজ আগমনের পর ভারতে ইংরাজ বনাম ভারতীয়ের সংগ্রামের

ইতিহাস ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইংরাজের লেখা এই ভারতীয় সামরিক ইতিহাস জিনিষটা কি? এটা বস্তুতঃ ইংরাজের যুদ্ধজয়ের একটা সপ্রশংস সগর্ব এবং একদেশদর্শী বিবরণ। শ্রীরঙ্গপত্তন, মাহিদপুর, আসাই, আসিরগড়, সোবরাওঁ, চিলিয়াঁ-ওয়ালা, ঝানসি, মিরাট প্রভৃতি শত রণক্ষেত্রের যে সামরিক বিবরণ ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, তার মধ্যে শুধু ইংরাজের কৃতিত্ব ও শৌর্যের কথাটাই বড় ক'রে লেখা আছে। ইংরাজের বিপক্ষ ভারতীয়ের শৌর্য ও সংগ্রামনিপুণতার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু আজও যদি ইংরাজের সামরিক দপ্তরের পুরনো নথিগুলি থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একবার পাঠ করা হয়, তবে তার মধ্যেই প্রমাণিত হবে যে ইংরাজ ঐতিহাসিকের প্রচারিত গ্রন্থের তথ্য ও সামরিক দপ্তরের নথিগত তথ্যে অনেক পার্থক্য। পুরনো নথির মধ্যে তবু অনেক সত্য বিবরণ আছে। ইংরাজের যুদ্ধজয়ের বহু রহস্যের বিবরণ তার মধ্যেই পাওয়া যায়।

সুতরাং ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস ইংরাজের লেখা গ্রন্থে যা পাওয়া যায়, সেটা ইংরাজ পক্ষের ভারতীয় সৈনিকের কৃতিত্ব ও গুণগ্রামের বিবরণ। কিন্তু ভারতের বহু রণক্ষেত্রে টিপু, মারাঠা শিখ ও টোপে মহারাজের সৈনিক ইংরাজবিরোধী সংগ্রামে যে শৌর্য ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তার ইতিহাস না আছে সরকারী দপ্তরে না আছে ইংরাজ ঐতিহাসিকের লেখায়। কত রণক্ষেত্রে ইংরাজের ফৌজ দেশীয় রাজশক্তির ফৌজের কাছে মার খেয়ে পালিয়েছে, তার তালিকা ও বিবরণ ইংরাজ ঐতিহাসিক ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছে। ভারতে ইংরাজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে একটি বিশুদ্ধ এবং অখণ্ড যুদ্ধজয়ের ইতিহাস রূপেই সাজিয়ে কাহিনীগুলি পরিবেশনে করা হয়েছে। ইংরাজবিরোধী ভারতীয় রাজশক্তির সামরিক উদ্যোগ, অভিযান,

জীবনপণ সংগ্রাম ও সৈন্য সংগঠনের বিবরণ, এবং তার রণকীর্তির পরিচয় বিপক্ষের লেখা ইতিহাসে থাকবার কথা নয়। কিন্তু বিপক্ষ না লিখুক, ভারতের একটা বিচিত্র ঐতিহাসিক প্রথার কারণে সেসব কাহিনীর কিছু কিছু জনসমাজে প্রচারিত হতো। এই প্রথা হলো ভাট এবং চারণ কবির বীরগাথা (ballad) রচনার প্রথা। লিখিত বিবরণ না হউক, মুখে মুখে ছড়া এবং গাথারূপে সামরিক ইতিহাসের একটা পরিচয় পুরুষানুক্রমে জনসমাজে প্রচারিত হয়ে এসেছে। রাজস্থানী রাজপুতের সামরিক কীর্তি, শিবাজী মহারাজ এবং মারাঠার সামরিক কীর্তি, শিখ খাল্‌সা ও বিদ্রোহী সিপাহীর রণকীর্তি ভাট ও চারণের গানে আজও পাওয়া যায়। এই বীরগাথাগুলি ভারতের সামরিক ইতিহাসেরই একটি সাহিত্যগত উপাদান।

ভারতের সামরিক ইতিহাস, এইভাবে বললে তাৎপর্যের দিক দিয়ে একটা জটিলতার অবকাশ আছে। অতীতে ভারত নামে একটা রাষ্ট্রের পরিচয় পাইনা, এবং অতীতের যুদ্ধগুলিও ভারতরাষ্ট্র বনাম শত্রুরাষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল না। প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত ভারতের সামরিক ইতিহাস বস্তুতঃ বহু ভারতীয় রাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাস। সুতরাং ভারতের সামরিক ইতিহাস না বলে যদি ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাস বলি, তবে বরং তাৎপর্যের দিক দিয়ে জটিলতা থাকে না।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসকে প্রকৃতি অনুসারে বস্তুতঃ ত্র'টিই প্রধান বর্গে ভাগ করা যায়:—

(১) আত্মরক্ষার যুদ্ধ (defensive war)

(২) অন্তর্যুদ্ধ (civil war)

(৩) বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুদ্ধ (revolutionary war)

আত্মরক্ষার যুদ্ধ : ভেদি মরু-পথ গিরি পর্বত বহু বৈদেশিক বাহিনী বহু বিভিন্ন কালে ভারতভূমিতে আক্রমণকারী (invader)

রূপে প্রবেশ করেছে। এই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভারতবাসী দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছে এবং এই যুদ্ধগুলিকেই আত্মরক্ষার সংগ্রাম বলা যায়। কিন্তু ভারতবাসী বলতেই বা কি বোঝায়? আক্রমণকারী রূপে ভারতে যে জাতির আবির্ভাব, ভারতে বসতি করার পর সে-ই তো ভারতবাসী হয়ে গেছে। এরপর আবার নতুন ক'রে নতুন জাতি আক্রমণকারী রূপে ভারত সীমান্তের পথ ভেদ ক'রে দেখা দিয়েছে, তখন ভারতের দেশরক্ষায় যুদ্ধ করেছে কারা? করেছে তারাই, যারা প্রথমে ভারতে আক্রমণকারী রূপেই দেখা দিয়েছিল কিন্তু ভারতের মাটীতে বসতি ক'রে ভারতসন্তান হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে বিচার করলে ভারতবাসীর আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার সামরিক ইতিহাসে পক্ষ এবং বিপক্ষের একটা কালানুক্রমিক তালিকা সাজানো যেতে পারে।

(ক) আর্য আক্রমণ—এই সময় দ্রবিড় এবং অনার্যেরা ভারতবাসী রূপে দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছে।

(খ) গ্রীক আক্রমণ—এই সময় হিন্দুরা (অর্থাৎ, আর্য অনার্য ও দ্রবিড়) ভারতবাসী রূপে দেশরক্ষার সংগ্রাম করেছে।

(গ) শক ও হুন আক্রমণ—হিন্দুরাই ভারতবাসী রূপে দেশরক্ষার সংগ্রাম করে। [যেসব গ্রীক ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল তারা ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়ে ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল]

(ঘ) পাঠান আক্রমণ—হিন্দুরা ভারতবাসী রূপে দেশরক্ষার সংগ্রাম করে। [শক ও হুন ভারতে বসতি স্থাপন ক'রে বহুকাল পূর্বেই জাতিত্বে, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল]

(ঙ) মোগল আক্রমণ—হিন্দু এবং পাঠান দুই সমাজই ভারতবাসী রূপে মোগলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধ করেছে।

(চ) পারস্যবাহিনীর (নাদিরশাহ্) আক্রমণ—হিন্দু মোগল ও পাঠান দেশরক্ষার সংগ্রাম করে। নাদিরশাহ্ দিল্লী লুণ্ঠনে হিন্দু মোগল ও পাঠানকে সমান হিংস্রতার সঙ্গে ধ্বংস ক'রে চলে যায়।

(ছ) ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতির ভারত জয়ের অভিযান—হিন্দু ও মুসলমান (মোগল ও পাঠান) উভয়েই ভারতবাসী রূপে বৈদেশিক য়ুরোপীয়ের রাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম করেছে।

উল্লিখিত তালিকা থেকে আত্মরক্ষার যুদ্ধগুলিকেই ভারতবাসীর প্রকৃত সামরিক ইতিহাস বলে গ্রহণ করা উচিত। পাঠানেরা আক্রমণকারীর ভূমিকায় যে সামরিক উদ্যোগ দেখিয়েছে, সেটা ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসের বিষয় নয়। সেটা আক্রমণকারীর সামরিক ইতিহাস। কিন্তু যেদিন পাঠান নবাগত মোগল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলো, সেদিনের পাঠানের কীর্তি ও কৃতিত্ব ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাস বলে গণ্য করতে বাধা নেই। কারণ সেদিন পাঠান ভারতবাসীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে দেশরক্ষারই যুদ্ধ করেছিল।

অন্তর্যুদ্ধ : দেশরক্ষার যুদ্ধ ছাড়া ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসে আর এক শ্রেণীর যুদ্ধ আছে, যেগুলি হলো অন্তর্যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধের ব্যাপার। কুরু বনাম পাণ্ডব, মগধ বনাম কলিঙ্গ, গুর্জর বনাম মালব, গৌড় বনাম কান্যকুব্জ, ভারতীয় মোগল বনাম ভারতীয় পাঠান—ভারতেরই অন্তর্গত এবং ভারতবাসী রূপে পরিণত দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব ভারতের সামরিক ইতিহাসকে অন্তর্যুদ্ধের একটি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে পরিণত করেছিল। ভারতের এক অঞ্চলের রাজশক্তির সঙ্গে অপর অঞ্চলের রাজশক্তির সংঘর্ষ, ভারতের এক সমাজের সামরিক আধিপত্যের সঙ্গে আর এক সমাজের সামরিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ হিন্দুযুগে নরপতিদের দিগ্বিজয়ের কথা শোনা যায়। এ

দিগ্বিজয় ভারতের বাইরে সাম্রাজ্য প্রসারের সামরিক অভিযান নয়, অভ্যন্তরীণ অভিযান। ভারতেরই এক প্রান্তের নরপতি, আর এক প্রান্তের উপর অভিযান চালিয়েছেন।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুদ্ধ: ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসের কতগুলি ঘটনা বস্তুতঃ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত। এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বহু সামরিক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের ভেতর দিয়েই সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন গুর্জর প্রতিহারের অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত অথবা পালযুগে বিরাট শূদ্র অভ্যুত্থান ও নির্বাচিত রাজা দিব্যকের দৃষ্টান্ত ছেড়ে দেওয়া যাক্। নিকট অতীতে ভারতবাসীর ইতিহাসে মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান মূলতঃ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। জনসাধারণের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হয়ে, সেই চেতনা রাজনৈতিক আদর্শ রূপে পরিণত হয়ে এবং সেই আদর্শের প্রেরণায় সামরিক প্রতিভা বিকশিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত শাসক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেওয়ার দৃষ্টান্ত হলো মারাঠা এবং শিখের প্রথম অভ্যুদয়ের ইতিহাস। এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে মারাঠা এবং শিখ ভারতবাসীর সামরিকতার এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যিক মোগলের যুদ্ধপ্রণালী এবং বৈপ্লবিক মারাঠা ও শিখের যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে মারাঠা শক্তি বা শিখ শক্তি নামে কোন রাষ্ট্রিক বা সামরিক শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। দু'টিই সম্পূর্ণ নতুন আবির্ভাব এবং দু'টিই হিন্দু ভারতবাসীর সামরিক প্রতিভার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

এর পরের এবং শেষ দৃষ্টান্ত হলো সিপাহীযুদ্ধ। ইংরাজ রাজশক্তিকে বিতাড়ন করার জন্য ভারতবাসীর শেষ সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ১৮৫৭ সালে বিদ্যুৎ স্ফূর্তির মত দেখা দিয়ে শেষ হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসের যুদ্ধসংঘর্ষের তিনটি প্রধান বর্গবিভাগ ছাড়া, আর একটি বর্গবিভাগ করতে পারা যায়। পরদেশ আক্রমণে বা অভিযানে ভারতবাসীর সামরিক ক্রিয়াকলাপের কথা। কিন্তু এই শ্রেণীর সামরিকতা ভারতবাসীর ইতিহাসে খুবই বিরল। ভারতবাসী ভারতের বাইরে পরদেশ পররাজ্য বা পরজাতির ওপর সাম্রাজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভিযান করেছে, ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে এমন ঘটনা খুব কমই হয়েছে। শোনা যায় সমুদ্রগুপ্ত মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কলিঙ্গের শৈলেন্দ্র রাজন্যেরা যাভা বলি ও সুমাত্রায় যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা নিছক সাংস্কৃতিক অভিযানের ব্যাপার বলে মনে হয়না। সিংহবাহুর লঙ্কাজয়ের ঘটনা কিছুটা কিম্বদন্তীর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। শিখ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং তাঁর রণকুশল খাল্‌সা সৈন্য নিয়ে আফগানিস্থান অঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন। আজও ভারত সীমান্তে হরিপুরের শিখদুর্গ পাঠান রাজ্যে শিখের আধিপত্যের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। খৈবার গিরিপথ দিয়ে চিরকালই বিদেশী অভিযাত্রী সৈনিক ভারতে এসেছে, একমাত্র শিখ সৈন্য তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। খৈবারের পথ প্রকম্পিত ক'রে শিখ বাহিনী একদিন ভারত থেকে ভারতের বাইরে অভিযান ক'রে ফিরে এসেছে।

শিখ ও মারাঠার অভ্যুদয়ে যে বৈপ্লবিক ও জাতীয় চেতনার প্রমাণ পাওয়া যায়, রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিখ ও মারাঠার সেই চেতনা আর প্রসারিত হতে পারেনি। কিন্তু সামরিক শক্তি রূপে তাদের প্রতিভার কোন হ্রাস হয়নি। ইংরাজ আগমনের পর ভারতীয় রাজশক্তিগুলির সামরিক উদ্যোগ এবং সৈন্য গঠনে একটা নতুন প্রথার আবির্ভাব হয়। নিজ নিজ

বাহিনীতে ফরাসী পর্তুগীজ দিনেমার ইংরাজ প্রভৃতি জাতির সেনাপতি নিয়োগ। য়ুরোপীয় সেনাপতিকে দিয়ে য়ুরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীতে ফৌজকে শিক্ষিত করার জন্যই দেশীয় রাজশক্তিগুলি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই প্রথা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল কি না, সেটা বিতর্কের বিষয়। পরবর্তী কালের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইংরাজ সেনাপতিকে নিজ ফৌজে স্থান দেওয়া মারাঠার পক্ষে একটা ভুলই হয়েছিল। কারণ যেসময় ইংরাজ রাজ্যবিস্তারে উদ্যত, সেসময় ইংরাজ জাতির লোককে নিজ ফৌজের পরিচালনায় নিযুক্ত করা সুবিবেচনার ব্যাপার হয়নি। মারাঠা-ইংরাজের সংঘর্ষ দেখা দেওয়া মাত্র মারাঠার বেতনভোগী ইংরাজ সেনাপতি ইংরাজপক্ষে চলে যেত।

কিন্তু ফরাসী সেনাপতির দ্বারা শিক্ষিত মারাঠা এবং শিখ আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি ও অস্ত্রসজ্জায় পারদর্শী হয়েও শেষ পর্যন্ত ইংরাজের ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়ী হতে পারেনি কেন? সামরিক প্রতিভার বা যোগ্যতার অভাবে এই ব্যাপার হয়নি। হয়েছিল অন্যবিধ রাজনৈতিক কারণে।

প্রথম কারণ, ভারতীয় রাজশক্তিগুলি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেনি। অথচ বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব-সাগরের জলে ব্রিটিশ রণপোত এবং বাণিজ্যপোতের আগমন স্তব্ধ না ক'রে দিলে, ইংরাজ শক্তিকে খর্ব করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দেশীয় রাজশক্তিগুলি এইদিকে উদাসীন ছিলেন। হায়দার আলি এবং মারাঠারা শেষ পর্যন্ত এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। হায়দার আলি মালডিভ দ্বীপ অধিকার ক'রে সেখানে একটি নৌবহর গঠনের উদ্যোগ আরম্ভ করেন। মারাঠারাও নৌবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে গেছে, মারাঠা ও হায়দার আলির নৌবাহিনী

আশানুরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠতে পারেনি। সেইজন্য মাত্র স্থলযুদ্ধেই ইংরাজের সঙ্গে ভারতীয় রাজশক্তিগুলির শক্তি পরীক্ষা হয়। বহু স্থলযুদ্ধে হায়দার-টিপু, মারাঠা, শিখ, গুর্খা ও বিদ্রোহী সিপাহীর কাছে ইংরাজ মার খেয়েছে। সেই পরাজয়ের কাহিনী ইংরাজের লেখা সামরিক ইতিহাসে হয় একেবারে উহ্য আছে, কিম্বা ছোট ক'রে লেখা আছে।

হায়দার আলির গরু-টানা তোপ এবং গোলন্দাজ ফৌজ ইংরাজের আর্টিলারীর চেয়ে উন্নত ছিল। মারাঠা সওয়ার ফৌজের দ্রুত-গামিতা, গেরিলা কৌশল ও চার্জ, ইংরাজের সওয়ারের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। শিখ পদাতিকের দল ছিল আক্রমণে অসাধারণ বেগবান এবং আত্মরক্ষায় পাষাণ প্রাচীরের মত অটল। এই অত্যুচ্চ সামরিক যোগ্যতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেন ইংরাজ জয়ী হলো, সেটাই কৌতুহলের বিষয়। কেন এরকম হলো, সেসম্বন্ধে কতগুলি কারণ নির্দেশ করতে পারা যায়।

(১) ভারতীয় রাজশক্তিগুলির শাসন কর্মচারী মহলে এবং ফৌজে ব্রিটিশ পক্ষের পঞ্চমবাহিনীরা অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করতে পেরেছিল।

(২) ভারতীয় রাজশক্তিগুলি নৌবাহিনী গঠনে প্রয়োজনমত উদ্যোগ করেননি।

(৩) মারাঠারা রাজপুত সামন্ত রাজ্যগুলিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার চেষ্টা না ক'রে তাঁবেদার রূপে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার ফলে মারাঠার নেতৃত্বে ভারতীয় হিন্দুর রাজনৈতিক সংহতি এবং ঐক্য সম্ভব হতে পারেনি।

(৪) মারাঠা সামন্তদের নিজেদের মধ্যেই মন কষাকষি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেগে উঠেছিল।

(৫) মারাঠারা শেষকালে যুদ্ধ ও সংঘর্ষকে কতকটা খেয়াল খুনী মেজাজের ব্যাপার (adventurism) ক'রে তুলেছিলেন।

(৬) মারাঠারা নিজ ফৌজে পেশাদার ইংরাজ সেনাপতি নিয়োগ করার প্রথা অবলম্বন করেছিলেন।

(৭) মারাঠাদের সামরিক আয়োজন এবং যুদ্ধপদ্ধতিতে শেষকালে আড়ম্বরের আধিক্য এবং রাশভারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফৌজের দ্রুততা ও স্ফূর্ত্তি হ্রাস পায়।

(৮) রাজপুত হিন্দু সামরিকতায় দক্ষ এবং যোগ্য হয়েও বড় পুরাতনপন্থী হয়ে রইলেন। নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত না ক'রে সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই পড়ে রইলেন।'

(৯) ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয়তা বোধ হ্রাস পায় এবং ইংরাজের দলে সিপাহী রূপে পেশাদারী যুদ্ধকার্য করবার জন্য প্রচুর সংখ্যক্ ভারতীয় লোক পাওয়া যেত। *

এই প্রসঙ্গে বাংলার অর্থাৎ বাঙালীর সামরিক ইতিহাস রূপে একটা আলোচনা উত্থাপন করা যেত পারে প্রাচীন বাংলায়

* They (Marathas) managed to irritate the brave Rajputs by their treatment of them. Instead of gaining them as allies, they had to deal with them as opponents or as grumbling and dissatisfied fuedatories...........Their (Marathas') rank and file was good... ...but their was often an adventurism and amateurishness, both in peace and war .. ' .. ...Later they (Marathas) organised their armies on more orthodox lines, with the results that what they gained in armour they lost in speed and mobility.... .... Hider Ali and Tipu also had some conception of the inportance of sea-power and they tried, unsuccessfully and too late, to build up a fleet in order to challenge the British on sea. The Marathas also made a feeble attempt in this direction....Reliance on foreign officers not only indicates the backwardness of the army organisations of the Indian Powers but was also a constant source of danger owing to their unreliability. The British had a powerful fifth column both in the administration and the armies of the Indian rulers.

The Rajputs, for all their courage, functionéd in their old feudal way —Pandit Jawharlal Nehru [Discovery of India.]

বাঙালী যে সামরিক যোগ্যতা এবং প্রতিভা অর্জন করেছিল, পরবর্তীকালে সেই ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণভাবে বাঙালী সমাজে সজীব হয়ে থাকতে পারেনি। পালযুগে গৌড়ীসেনার রণকীর্তি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যকে ভেঙেছে ও গড়েছে। সে গৌড়ীসেনা বাঙালী ছিল সন্দেহ নেই। দূর অতীতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, মুসলমান যুগেও বাঙালী সৈনিকবৃত্তি গঠন ক'রে রাষ্ট্রীয় ফৌজে কাজ করেছে, এবং সৈনাপত্যও গ্রহণ করেছে। মোগলযুগে বাংলার বারভুঁইয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের কাহিনী শোনা যায়, যাঁদের সৈনিকেরা বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমান ছিল। একমাত্র ইংরাজ যুগেই এসে দেখতে পাওয়া যায়, বাঙালী সমাজকে সামরিক ব্যাপারে একেবারে প্রবেশনিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম ভারতে এবং মহারাষ্ট্রে যেমন ভাট ও চারণের মুখে রণকীর্তির গাথা গীত হতে শোনা যায়, তেমনি বাংলার প্রাচীন কাব্যে বাঙালীর সৈনিকত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে সেকালের ফৌজ মিছিলের একটা বাস্তবগর্ভ উজ্জ্বল বর্ণনা আছে।... রাজার হুকুম নিয়ে মহাপাত্র পূর্ণ সমরসজ্জা ক'রে চলেছে গৌড় থেকে দক্ষিণ রাঢ়ের প্রান্তভাগে দক্ষিণ ময়না জয় ক'রে লাউসেনকে জব্দ করতে।......চারহাজার চৌহান সিপাই নিয়ে রাম রায়, বিয়াল্লিশ কাহন তীরন্দাজ নিয়ে 'গৌড়ের দিগর' দক্ষিণ রায়, সাত হাজার ঘোড়া নিয়ে 'রাজ্যের ঠাকুর' কুঞ্জর সিংহ। তার পিছনে দশ হাজার রাণা নিয়ে ভবানীর 'বার বেটা তের নাতি আঠার ভাগিনা'।

> সাজিল আগরি ভূঞা দক্ষিণ হাজরা
> আট হাজার ঢালি সঙ্গে যেন খসে তারা

* * *

পাঞ্জা পাইক সাজিল কোমরে ঘাগর
গলায় ওড়ের মালা হাথে ধনুশর
* * *
নিয়লি সিয়লি সাজে মাল পাইক খড়ি
* * *
হরি দলই সবার আগে হাড়ি পাইক সাথে
হাথিকে হাথ্যার হানে ঢাল-খড়্গা হাথে
তার পাছে মোদক সাজে গোসাইদাস পাঞ্জা
চৌদিকে ফলঙ্গ দিই ফিরাইয়া লেঞ্জা
* * *
কামানি কামান সাজে সিলিদার সিলি,
* * *
হাসন হুসেন সাজে পায়ে দিয়া মোজা
যাহার সঙ্গতি সাজে বাইশ হাজার খোজা
* * *
সাজিল হাথির পিঠে বঙ্গ মিঞা কাজী
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ গাজী (১)

উল্লিখিত বর্ণনায় মধ্যযুগের বাঙালী সৈনিকের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় যে সেসময় বাংলা দেশে পেশাদার অবাঙালী সৈনিক যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল—রাজপুত চৌহান, খোজা (হাব্সী) মুসলমান, ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙালী পেশাদার সৈনিকেরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—মাল, হাড়ি ইত্যাদি। পদাতিক দলের গঠন সম্বন্ধেও কতগুলি পরিচয় পাওয়া যায়—কাহন, রাণা ইত্যাদি, যাকে পদাতিকের এক একটি কোম্পানী ও ব্যাটালিয়ন

* (১) মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—শ্রীসুকুমার সেন

বলা যেতে পারে। সিল্লাদার সওয়ার, সাধারণ ঘোড় সওয়ার ফৌজ, কামানী, হস্তিবাহিত ফৌজ, পাইক, ঢালি (swordsman), তীরন্দাজ, সব শ্রেণীর পদাতিক এবং সওয়ারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। 'হাজরা' 'দলই' 'পাঞ্জা' 'আগরি' ইত্যাদি কথাগুলি সামরিক অফিসার শ্রেণীর বিভিন্ন পদোপাধি বলে মনে হচ্ছে। "চৌদিকে ফলঙ্গ দিই"—এর মধ্যে 'ফলঙ্গ' (Phalanx) কথাটি একটি সামরিক পরিভাষা, সম্ভবতঃ পর্তুগীজদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

যাই হোক্, মুসলমান আমলের শেষ দিকে এবং ইংরাজ আগমনের কালে বাঙালীর সামরিক প্রতিভার উদাহরণরূপে এই ধরনের সৈনিকতা (soldiery) ছাড়া আর কোন নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। চন্দননগরের ফরাসী ফৌজে কিছু সংখ্যক্ বাঙালী সিপাহী ছিল, কিন্তু ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙালীকে সিপাহী রূপেও ফৌজে স্থান দেয়নি।

ইংরাজ কর্তৃক ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সহযোগী হয়ে ভারতবাসী ভারতের বাহিরের রণক্ষেত্রে সৈনিক রূপে উপস্থিত হয়। ইংরাজের সাম্রাজ্যিক উদ্যোগের সঙ্গে ভারতীয় ফৌজ যুক্ত থাকায়, ভারতীয় সৈনিক পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ কাল, য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রে সৈনিক রূপে ভারতবাসীর আবির্ভাব, ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী ব'লে বিখ্যাত য়ুরোপীয় জাতিগুলির সৈনিকেরা কি ধরনের যোদ্ধা, সেটা ভারতীয় সৈনিক ফ্ল্যাণ্ডার্সের প্রান্তরেই পরীক্ষা করেছে। অপর দিকে, য়ুরোপীয় সৈনিকেরা ভারতীয় সৈনিকের যোদ্ধৃত্বের পরিচয়ও বুঝতে পেরেছে। তবু প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক

একমাত্র পদাতিকতা আর সওয়ারগিরি ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে সামরিক কৃতিত্বের প্রমাণ দেবার সুযোগ পায়নি। নৌযুদ্ধ, বিমানযুদ্ধ এবং উন্নত পদ্ধতির গোলন্দাজী যুদ্ধে সেসময় ভারতীয় সৈনিককে সামরিক যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একেবারে সর্বগ্রাসী সামগ্রিক (total) রূপে দেখা দিয়েছিল, এবং বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমরকুশল ফাসিস্তির প্রবল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসীর জন্য যুদ্ধের সকল ক্ষেত্র, সকল অস্ত্র ও সকল বিভাগ উন্মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্ববিধ অস্ত্রচর্চায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত এবং বহুব্যাপক রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ভারতীয় ফৌজই বর্তমানে স্বাধীন ভারতের ফৌজে পরিণত হয়েছে।

শেষ ব্রিটিশ ফৌজ ভারত হইতে বিদ গ্রহণ করিতেছে

স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় বিমানবাহিনীর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক

কোথায় লিবিয়ার খরতপ্ত মরুপ্রান্তর আর কোথায় উত্তর বর্মার পথহীন দুর্ভেদ্য আরণ্য অঞ্চল—কিন্তু রণদুর্মদ ভারতীয় ফৌজ দুই রণাঙ্গনে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণাম সৃষ্টি করেছে। শুধু এই দুই রণাঙ্গন নয়, ভারতীয় 'জওয়ানে'র রণনির্ঘোষ আন্ত্রিয়াতিক রণাঙ্গনের বাতাস আলোড়িত ক'রে মহাযুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় নৌসৈন্যের মেশিনগান মহার্ণবের বুকে বিপক্ষের রণপোত জর্জরিত করেছে। ভারতীয় বৈমানিকের নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরক ব্রেমেন ও বার্লিনের ওপর অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করেছে। হংকং, বোগদাদ, ইরান, গ্রীস, দামাস্কাস, আকিয়াব, সিঙ্গাপুর—প্রতি রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকের রাইফেলনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মিশর, ইতালী, মালয়, বর্মা ও জাপান—প্রতি দেশের পথ ও প্রান্তরে ভারতীয় সৈনিকের সশস্ত্র মিছিল দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসে একটি প্রধান অধ্যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজকে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বহু এবং বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল এমন নয়। মাত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় বৎসরের পর বৎসর শিবিরজীবন যাপন করতে হয়েছে, এমন অনেক অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজকে সন্নিবেশ করা হয়েছিল,—যেমন ইরান ও ইরাক। নাৎসী বাহিনী ককেসাস অঞ্চলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের দিকে আসতে পারে, এই আশঙ্কিত অভিযানের গতিরোধ করার জন্য ঐ দুই অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজকে ঘাঁটি স্থাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য রণাঙ্গনে

ভারতীয় ফৌজকে অভিযান চালাতে হয়েছে। যথা: মালয়, বর্মা, পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, তুনিসিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সিসিলি, ইতালী, গ্রীস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ কি পরিমাণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, তার স্বীকৃতি ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদেরই মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

জেনারেল মার্ক ক্লার্ক (ইতালী রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর প্রধান পরিচালক) বলেছেন:

> "এই ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধকীর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।... কোন বাধা এঁদের অগ্রগতিকে বেশীদিন রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি, অথবা এঁদের উচ্চ মনোবল এবং যোদ্ধাসুলভ উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ৪নং, ৮নং ও ১০নং ভারতীয় ডিভিসনের নাম চিরকাল কাসিনো অধিকার, রোম অধিকার, আর্নো উপত্যকা অধিকার, ফ্লোরেন্সের অবরোধ মুক্তি এবং গথিক লাইন ধ্বংস করার কীর্তির সঙ্গে গ্রথিত থাকবে। আমি এই তিনটি ভারতীয় ডিভিসনের সৈনিকদের প্রতি অভিবাদন জানাচ্ছি।" (১)

লর্ড ওয়াভেল বলেছেন: "তাঁরা (ভারতীয় সৈন্য) পশ্চিম মরু-

(1) "The achievements in combat of these Indian Soldiers are noteworthy. .... No obstacle has succeeded in delaying them for long or in lowering their high morale or fighting spirit. The Fourth, Eighth and Tenth Indian Divisions will forever be associated with the fighting for Cassino, the capture of Rome, the Arno Valley, the liberation of Florence and the breaking of Gothic Line. I salute the brave soldiers of these three great Indian Divisions—General Mark Clark, Commanding General, Allied Armies in Italy.

ভূমির ধূলিময় প্রান্তরে, আবিসিনিয়া সীমান্তের ঝাড় জঙ্গলে, সুদা-নের শুষ্ক রৌদ্রতপ্ত সমতল ভূমিতে, এরিট্রিয়া ও আবিসিনিয়ার সুউচ্চ পর্বতমালায় এবং সিরিয়ার সবুজ ও কোমল শৈলভূমিতে যুদ্ধ করেছেন। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত সৈনিকদের সতীর্থ হয়ে ভারতীয়েরা দুইটি বৃহৎ ইতালীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তাঁরা (ভারতীয় সৈন্য) তোব্রুক রক্ষায় সাহায্য করেছেন, এবং সিরিনাইকাতে জার্মান সৈন্যের পাল্টা আক্রমণকে প্রতিরোধ করেন। তাঁরা ইরাককে শত্রুর সম্ভাবিত অধিকার থেকে রক্ষা করেন।...কেরেন ও আম্বা আলাগি, এই দুই স্থানে শত্রুর 'অপরাজেয়' দুইটি ঘাঁটিকে ভারতীয় সৈন্য বিপর্যস্ত করে। মেকিলিতে একটি ভারতীয় মোটর ব্রিগেড শৌর্যের সঙ্গে শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে নিজপক্ষের অন্যান্য ফৌজের নিরাপদে পশ্চাদপসরণ সম্ভব করে। দামাস্কাস যেভাবে শত্রুর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তাতে ঐ সহর অধিকার করার আশা একরকম ছেড়েই দিতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ডিভিসনের একটি ব্রিগেড দুঃসাহসিক আক্রমণের দ্বারা ঐ সহর অধিকার সম্ভব করে। (২)

(2) "They fought in the dusty wastes of the Western Desert, in the bush of the Abyssinian border, on the dry and scorching plains of Sudan, in the lowering rock mountains of Eritrea and Abyssinia, and amid the softer and greener hills of Syria. With their comrades from the United Kingdom, Australia, New Zealand, South Africa, and many other parts of the British Empire, the Indians utterly defeated two great Italian armies; they helped to hold Tobruk and to stem the German counter offensive in Cyrenaica; and to save Irak from enemy domination. At Keren and Amba Alagi they stormed two positions which their enemy had with some reason deemed impregnable; at Mechili an Indian Motor Brigade fought with impressive gallantry to cover a retreat; a brigade of

জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক বলেছেন :

> "জাপানীকে যুদ্ধে পরাভূত করার ব্যাপারে ভারতীয় ফৌজ খুবই কাজ করেছে। সমস্ত পৃথিবী জানে ভারতীয় ফৌজ আসামে এবং বর্মায় কিরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। আফ্রিকা, জার্মানী, ইটালী ও সিরিয়াতে কঠিন সংগ্রামে ভারতীয় সৈনিকের সাহস এবং দক্ষতা জার্মানীকে পরাভূত করার কাজেও অনেক সাহায্য করেছে। (৩)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ যে যে রণাঙ্গনে যেসব বিশিষ্ট যুদ্ধ, যুদ্ধে জয়, ও সাফল্যপূর্ণ অভিযান করেছে, তারই সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো। এই যুদ্ধ ও অভিযানে ভারতীয় সৈনিক যে অতুলনীয় দুঃসাহস, শৌর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, সহস্র ঘটনায় সমাকীর্ণ সেই কাহিনী এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে বিবৃত করা সম্ভব নয়।

প্রকৃত যুদ্ধকার্য ছাড়া আরও কতগুলি কর্তব্যে ভারতীয় ফৌজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। গ্রীসে ভারতীয় ফৌজ গ্রীসের গৃহযুদ্ধ দমনে ব্যাপৃত হয়েছিল। ফ্যাসিস্ত শক্তির পতনের পর দখলদার ফৌজ রূপে ভারতীয় ফৌজ মালয়, জাপান ও জার্মানীতে প্রেরিত হয়েছে। তাছাড়া, মিত্র অঞ্চলের বহু জনপদে, বন্দরে, গিরিবর্ত্মে ও দ্বীপে রক্ষাফৌজ রূপে অবস্থান করেছে।

Indian division led what seemed a forlorn hope against the defences of Damascus, and by their courage made the capture of that city possible —Lord Wavell

(3) The Indian Army did much to bring about the defeat of the Japanese, and all world knows how well it fought in Assam and Burma. The Indian Army also helped greatly in the defeat of Germany by its bravery and skill in the hard fighting in Africa, Germany, Italy, and Syria —General Sir Claude Auchinleck.

স্থলবাহিনীর মধ্যে শুধু ভারতীয় পদাতিক (Infantry) দলগুলিই ছিলনা। ভারতীয় গোলন্দাজ দল ও সাঁজোয়া ফৌজের (Armoured Corps) দলগুলিও (৪) বিভিন্ন ব্রিগেড রূপে অভিযান ও সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

এছাড়া ভারতীয় 'এঞ্জিনিয়ার ফৌজের' (Corps of Engineers) দলগুলিও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। (৫)

যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে (১৯৩৯ সালে) ভারতীয় ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট ১৮৯,০০০; ১৯৪৫ সালে মোট সৈন্যসংখ্যা হয়—২৫ লক্ষ। পদাতিক, গোলন্দাজ, বিমান, নৌ, সাঁজোয়া, এঞ্জিনিয়ার, অর্ডন্যান্স, সিগন্যালার, ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগে সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা দাঁড়ায়—১৫,৭৪০।

বহু নূতন রেজিমেণ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে গঠিত হয়েছে। (৬) কতগুলি রেজিমেণ্টের নামকরণেও পরিবর্তন হয়েছে। (৭) শুধু জাতি নির্বিশেষে নয়, বয়স এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ফৌজ দল গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—অক্সিলিয়ারী নারীবাহিনী এবং বালকবাহিনী। ভারতীয় নারী অক্সিলিয়ারী ফৌজ (Womens Auxiliary Corps, India) এবং বালক কোম্পানী

---

(৪) ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ইতিমধ্যে সবই যন্ত্রোপেত ('mechanised') হয়ে, সাঁজোয়া ফৌজে (Armoured Corps) পরিণত হয়েছিল।

(৫) ভারতীয় স্যাপার্স ও মাইনার্স (Sappers and Miners) দলগুলিকে নিয়েই এঞ্জিনিয়ার ফৌজ গঠিত।

(৬) মহর রেজিমেণ্ট, বিহার রেজিমেণ্ট, আসাম রেজিমেণ্ট প্রভৃতি। নতুন গুর্খা রাইফেল দল। নূতন শিখ পদাতিক দল ইত্যাদি।

(৭) ১৯ হায়দরাবাদ রেজিমেণ্টের নাম বদলে গিয়ে কুমায়ুন রেজিমেণ্ট হয়েছে।

(Boy's Company)—ব্রিটিশগঠিত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এই প্রথম নারী ও বালকের সৈনিকরূপে প্রবেশ। অবশ্য, এই অভিনব দু'টি বাহিনীর কাউকেই প্রকৃত সংহারধর্মী যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত হতে হয়নি। নারী অক্সিলিয়ারী দলের জনসংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

ভারতের প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজী ডিভিসনের অঙ্গীভূত হয়ে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধকালে দেশীয় রাজ্য ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার।

যুদ্ধের সম্পর্কে যুদ্ধহীন বহু কাজের জন্য অনেকগুলি 'সার্ভিস' প্রবর্তিত হয়। এই সব বিচিত্র এবং বিবিধ সার্ভিসে স্ত্রী-ঘটিত একটি সার্ভিস ছিল—নারী স্বেচ্ছাসেবিকা সার্ভিস (Women's Voluntary Service)। দেশী ভাষায় এর নাম ছিল 'ফৌজী সেবাদারণী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে প্রায় ১০ হাজার ফৌজী সেবাদারণী সংগৃহীত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকের প্রাণ ক্ষয় হয়েছে কি পরিমাণ?

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সমর দপ্তরের বিবরণে দেখা যায় :—

নিহত—২৪,৩৩৮

আহত—৬৪,৩৫৪

সন্ধান পাওয়া যায় না—১১,৭৫৪

যুদ্ধবন্দী—৭৯,৪৮৯

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকের রণকীর্তি সংক্ষেপে বিবৃত হলো :

পূর্ব্ব আফ্রিকা (সুদান ও এরিত্রিয়া)

সুদান সীমান্ত থেকে ভারতীয় ফৌজের অভিযান। মার্শাল

গ্রাৎসিয়ানীর পরিচালিত ইতালীয় ফৌজের কাইরোমুখী 'সাঁড়াশি' অভিযানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান। গালাবাট দুর্গ অধিকার। কাসালার উত্তরে ইতালীয় ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ। এরিত্রিয়া সীমান্ত অতিক্রম। আইকোটা অধিকার। কেরু নামক স্থানে ইতালীয় ব্রিগেডের উচ্ছেদ সাধন, ইতালীয় জেনারেলকে বন্দী করা হয়।

বারেণ্ট্‌ ও আগোরডাট—দুইটি যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও জয়লাভ।

সামানা, ব্রিগ্‌স্‌ পীক, সাঞ্চিল, ক্যামেরণ রীজ, পিনাকেল, পিম্পল্‌, অ্যাকুয়া কোল ও ফোর্ট ডোলো-গোরোডোক—আড়াই হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত এই কয়টি ইতালীয় রক্ষাঘাঁটি অধিকার।

কেরেণ যুদ্ধ—প্রবল সংগ্রামের পর বিখ্যাত ইতালীয় সামরিক ঘাঁটি কেরেণ অধিকার।

আসমারা, আম্বা আলাগি দুর্গ অধিকার। পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গনের ইতালীয় প্রধান সেনাপতি ডিউক অব আওস্টাকে (Duke of Aosta) বন্দী করা।

মেকিলি যুদ্ধ—এল আডেম থেকে অগ্রসর হয়ে এসে ভারতীয় ফৌজ মেকিলিতে উপস্থিত হয়। জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি বিলম্বিত করার জন্য চারদিনব্যাপী সংগ্রাম।

সিরিয়া

কিসুয়ে নামক স্থানে ফরাসী ভিসি (Vichy) বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জয়লাভ, কিসুয়ে অধিকার। মেজে অধিকার। দামাস্কাস অধিকারের যুদ্ধ। দামাস্কাসের পতন।

উত্তর আফ্রিকা (মিশর সীমান্ত, লিবিয়া, ত্রিপলি)

মেরসা মাটরুথ থেকে ভারতীয় ফৌজের অভিযান আরম্ভ। নিবেইওয়া অধিকার ; ইতালীয় জেনারেল ম্যালেট্টি নিহত। পশ্চিম তুম্মার ও পূর্ব তুম্মার অধিকার। সিদিবারানি যুদ্ধ ও জয়লাভ। বেনগাজির দিকে অভিযান।

মিশর সীমান্ত থেকে, এল আঘেলিয়ার দিকে অভিযান। সিরিনাইকা যুদ্ধ ও জয়। সিদি রেজেগ যুদ্ধ। তোব্রুক পুনরধিকার। জার্মান সেনাপতি রোমেল কর্তৃক বেনগাজির ওপর আক্রমণ। ভারতীয় ফৌজের সাময়িক পশ্চাদপসরণ। সিরিণ ও ডের্ণা নামক স্থানে ভারতীয় বনাম জার্মান পান্তসের (Panzer) ফৌজের প্রবল সংঘর্ষ। এল আডেম যুদ্ধ। তোব্রুক যুদ্ধ, জার্মান ফৌজের আক্রমণে তোব্রুকের পতন। তোব্রুক থেকে ভারতীয় ফৌজের পশ্চাদপসরণ।

হালফায়া পাস (গিরিপথ) যুদ্ধ ও জয়লাভ।

এল আলামিন যুদ্ধ—রোমেল বাহিনীর পরাজয়, এল আলামিন অধিকার। সিদি ওমর যুদ্ধ ও জয়, লিবিয়া ওমর অধিকার।

তুনিসিয়া

ওয়াদি জিগ জাউ, গাবেস, ম্যাটমাটা হিল্‌স্—তিনস্থানে যুদ্ধ ও সাফল্য লাভ।

ফাটনাসা নামক স্থানে রোমেলের ঘাঁটি অধিকার। ওয়াদি আকারিত অধিকার। রোমেলের পশ্চাদ্ধাবন। স্ফাক্স, সুসে ও এনফিডাভিল অধিকার।

জেবেল গার্সি (Djebel Garci) আক্রমণ ও অধিকার।

মেজেজ এল বাব (Medjez el Bab) যুদ্ধ ও জয়লাভ। তুনিসিয়া অধিকার সম্পূর্ণ।

হংকং ও মালয়

হংকং—জাপানীদের কাছে ১৯৪১ সালে ভারতীয় ফৌজের আত্মসমর্পণ।

কোটাবারু, জোহোর, সিঙ্গাপুর—জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ।

বর্মা (১৯৪১-৪২)

মৌলমিন যুদ্ধ—জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা। সমস্ত বর্মা থেকে ভারতীয় ফৌজের আসামের পথে পশ্চাদপসরণ।

বর্মা (১৯৪৩-৪৫)

নাকিয়েডাউক গিরিপথ (Ngakyedauk Pass) ও মান্দালয় যুদ্ধ, জাপানী ফৌজের পরাজয় এবং পশ্চাদপসরণ।

মিচকিনা, মোগাউং, টামু, টিড্ডিম, সিতাউং, কালেমো যুদ্ধ ও জয়লাভ। মান্দালয়, টাঙ্গু, প্রোম, ও পেগু পুনরধিকার। আরাকান অভিযান, কাংগাউ যুদ্ধ। রেঙ্গুন অধিকার।

মণিপুর ও আসাম

ডিমাপুর রোড ও কোহিমা যুদ্ধ—জাপানী ফৌজের পশ্চাদপসরণ।

ইতালী ও সিসিলি

সালের্নোতে অবতরণকালীন যুদ্ধ। সেণ্টএঞ্জেলো আক্রমণ। স্যাংগ্রো নদী যুদ্ধ। নেপল্‌স্‌ অভিযান। পিগ্‌নাটারো আক্রমণ। কাসিনো যুদ্ধ ও কাসিনো অধিকার। রোম অভিযান ও রোম দখলের যুদ্ধ। আর্ণো উপত্যকা অধিকার এবং ফ্লোরেন্সের অবরোধ মুক্তির যুদ্ধ। সিসিলিতে অবতরণ, যুদ্ধ, ও সিসিলি অধিকার। প্রয়েণ্ট ৫৯৩ ও মনেস্টারি হিল যুদ্ধ, হ্যাঙ্গম্যান হিল আক্রমণ। আড্রি-য়াটিক উপকূলে অবতরণ ও পর পর গথিক লাইন ও ও রিমিনি লাইন ভেদ।

ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধকীর্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীকে আটলাণ্টিক, ভূমধ্যসাগর ও বর্মা উপকূলে কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। ১৯৪১ সালে ভারতীয় নৌবহরের একটি অংশ লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর ও পারস্য উপসাগরের রক্ষাকার্যে নিয়োজিত হয়। ১৯৪১ সালে সোমালিল্যাণ্ড পুনরধিকারের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর কতকগুলি স্লুপ সিসিলি অভিযানের নৌবহরের সঙ্গে কাজ করে। সাবমেরিণের আক্রমণ থেকে রক্ষার কাজে ও সামরিক সম্ভার প্রেরণের কাজে ভারতীয় স্লুপ নিয়োজিত হয়। ভারতীয় স্লুপ 'কৃষ্ণা' তার বিমানধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জার্মান গ্লাইডারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। 'গোদাবরী' জার্মান সাবমেরিণ ধ্বংসের কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মালয় থেকে পশ্চাদ-পসরণের সময় 'যমুনা' ও 'সতলজে'র (Sutlej) বিমানধ্বংসী কামান কিছু জাপানী বিমান ধ্বংস করে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হলো আরাকানের উপকূলস্থিত জাপানী নৌবহরের উপর আক্রমণ। এই আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভারতীয় নৌবহরের 'বেঙ্গল' ছুটি বৃহদাকার ও প্রভূত অস্ত্রে সজ্জিত জাপানী যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বেঙ্গলের আক্রমণে জাপানী জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। আকিয়াব দখলে ও আরাকানে ভারতীয় ফৌজের অবতরণের কাজে ভারতীয় নৌবাহিনীর কৃতিত্ব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় উপকূল রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় নৌবাহিনীর উপরেই ন্যস্ত হয়। *

ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধকীর্তি

ভারতীয় বিমানবাহিনীর কয়েকটি স্কোয়ড্রনের ওপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১৯৪২ সালে বর্মার ওপর জাপানী আক্রমণের সময় বর্মাতে জাপানী সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য শিবিরের উপর ভারতীয় বিমানবাহিনীর ১নং স্কোয়ড্রন কয়েকবার হানা দেয়। সিয়াম বা থাইল্যাণ্ডের চিয়েংগ্রাই ও চিয়েংমাই নামে ছ'টি স্থানের ছ'টি জাপানী বিমান ঘাঁটির ওপর উক্ত স্কোয়ড্রন বোমা বর্ষণ করে। ২নং স্কোয়ড্রান ১৯৪৩ সালে উইংগেট অভিযানের (Wingate Expedition) সঙ্গে মধ্য বর্মায় জাপানী ঘাঁটি আক্রমণ করে। চিন্দুইন ও ইরাবতী নদীতে জাপানী পোতবহর ধ্বংস করার কাজেও উক্ত ২নং আত্মনিয়োগ করে। এ ছাড়া পর্যবেক্ষণের কাজও করতে হয়েছে। ৬নং ও ৮নং স্কোয়ড্রন

* "On the naval side, the epic fight of the 'Bengal' against two heavily armed Japanese vessel and the handling of the landing craft at Ramree and elsewhere in Burma have won for the R. I. N., the admiration of the Royal Navy—Lord Wavell (Speech at Remembrance Ceremony ; March 4,1946.)

জঙ্গী পর্যবেক্ষণ (Reconnoissance) ও স্থলবাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৪৪ সালে ১নং ও ৭নং স্কোয়াড্রন কোহিমা রণাঙ্গনে ও মধ্যবর্মার যুদ্ধে কাজ করে। আরাকান অভিযানের সময় ৪নং ও ৯নং স্কোয়াড্রান উপর্যুপরি বোমা-বর্ষণ দ্বারা হানাদারী কাজ করে। এছাড়া সামরিক উপকরণ সরবরাহের কাজও ভারতীয় বিমান বহরকে যথেষ্ট করতে হয়েছে।

"৩ : ১ অনুপাত" পলিসি

যুদ্ধকালেই হোক্ বা শান্তিকালেই হোক্, ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে ব্রিটিশের যতগুলি সতর্কতার পলিসি এবং ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে একটা হলো '৩ : ১ অনুপাত' পলিসি। এটা অতি পুরাতন পলিসি। সিপাহী বিদ্রোহের পর পী-কমিশন (১৮৫৯ সালে) ভারতীয় ফৌজ পুনর্গঠন সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করেন, তার মধ্যে একটি সুপারিশ এই ছিল যে, 'ভারতে অবস্থিত ফৌজের' ('Army in India') ব্রিটিশ সৈন্যদলের জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় দেশী সৈন্যদলের জনসংখ্যা তিনগুণের বেশী হতে পারবে না। এই '৩ : ১ অনুপাত' পলিসির কোনকালে ব্যতিক্রম করা হয়নি। নিম্নোক্ত তথ্য থেকেই এই পলিসির বাস্তব পরিচয় পাওয়া যাবে। বিভিন্নকালে ভারতে অবস্থিত ফৌজে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের জনসংখ্যা উদ্ধৃত হলো।

সময়	ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা	ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা
১৮৬৩	২০৫,০০০	৬৫,০০০
১৮৮৭	১৫৩,০০০	৭৩,০০০
১৯০৩	১৪২,০০০	৭৭,০০০
১৯২৩	১৩৯,০০০	৬৬,০০০
১৯৩৯	১৭৭,০০০	৪৩,০০০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেও এই "৩ : ১" পলিসির অনুরূপ একটা পলিসি অব্যাহত ছিল। ভারতীয় ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত যেসব ব্রিগেড ছিল, সেই ব্রিগেডের গঠনগত রূপ লক্ষ্য করলেই এই পলিসির স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক ভারতীয় ব্রিগেডের মধ্যে একটা ক'রে ব্রিটিশ দল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, ধরা যাক্ ৪নং ভারতীয় ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত ৫নং ব্রিগেডটির কথা। রয়্যাল ফিউজি-লিয়ার্স (Royal Fusiliers) নামে একটি ব্রিটিশ সৈন্যদল, ৩।১ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ও ৪।৬ রাজপুতানা রাইফেল—এই তিনটি দল নিয়ে ৫নং ব্রিগেড গঠিত। এক্ষেত্রে অনুপাতটা ২ : ১ হয়েছে দেখা যায়। বর্তমান ব্রিটিশ সামরিক কর্তারা অবশ্য এই ব্যাপারকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলে থাকেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজের রণদক্ষতা উন্নত ক'রে তোল্‌বার জন্যেই এক একটি দক্ষ ব্রিটিশ দলকে এক একটি ভারতীয় ব্রিগেডের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ দলগুলি কি এতই রণদক্ষ? যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় দলগুলির সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকেন বলেই কি ভারতীয় দলগুলি অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চ রণকুশলতার প্রমাণ দিতে পারে; নইলে পারতো না?

এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক ব্রিটিশ যুদ্ধতাত্ত্বিকের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল। অক্সফোর্ডের যুদ্ধেতিহাসের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন সিরিল ফল্‌স্ সম্প্রতি (এপ্রিল ১৯৪৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে ক্যাপ্টেন ফল্‌স্ মন্তব্য করেছেন যে:

> "ভারতীয় ফৌজের পদাতিক ব্রিগেডগুলি গঠনের ব্যাপারে একটা থিয়োরি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই থিয়োরি হলো, ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেডের মধ্যে একটা ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন ঢুকিয়ে দিলে ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলির সম্মুখে রণদক্ষতার একটা উচ্চ আদর্শ রাখা হবে। ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলির

অনেকে গত প্রথম মহাযুদ্ধে যদিও বেশ ভাল কাজ করেছিল, তবুও সাধারণতঃ ঐ থিয়োরি অনুসারেই ভারতীয় ব্রিগেড গঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও প্রথম প্রথম এই থিয়োরি অনুসারে ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতীয় এবং গুর্খা ব্যাটালিয়নগুলি যতদিন পর্যন্ত যেভাবে সুদক্ষতার প্রমাণ দিয়ে কাজ করতে পেরেছিল, ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নগুলি তা করতে পারেনি। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই এই সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ভারতীয় ব্যাটালিয়নের পক্ষে ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নের কাছ থেকে কোন উচ্চ আদর্শ বা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার কোন দরকার নেই।" (১)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সমরসজ্জার রেজিমেণ্টগুলি কি পরিমাণে প্রসারিত হয়ে যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত হয়েছিল, তার সংখ্যা এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত হলো। এই থেকে অনুমান করা যাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রয়োজনের গরজে অন্ততঃ ভারতীয় স্থলবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জায় পিছিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এবং স্থলবাহিনী সর্বপ্রকার স্থলযুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিল বলেই 'সিদিবারানি', 'এল আলোমিন', 'কেরেন', 'কাসিনো' ও 'কাংগাউ' সম্ভব হয়েছিল।

---

(1) "The theory upon which the composition of infantry brigades of the Indian Army was based was that the single British battalion normally included would set a standard and provide an example to the Indian battalions. Good as were many of the latter in the First World War, this was how things commonly worked out in practice. That was also the case in the Second World War to start with, but here the British battalions did not as a rule remain at their best as long as the Indian and Gurkha battalions. By 1944 it could not be said that these were in any need of an example set by Europeans"—"The Second World War" by Captain Cyril Falls, Professor of History of War, Oxford.

বিভিন্ন দল	সৈন্যসংখ্যা
ভারতীয় সাঁজোয়া দল (বা "Armoured Corps")	৩১,০০০
(রয়্যাল) ভারতীয় গোলন্দাজ ("R. I. A.")	৮৩,০০০
ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার ("I. E.")	২৬৩,০০০
ভারতীয় সিগন্যাল দল (Signal Corps) "I. S. C".	৬৮,০০০
ভারতীয় মেডিক্যাল দল (Army Medical Corps) "I. A. M. C."	১৬৭,০০০
(রয়্যাল) ভারতীয় ফৌজী সার্ভিস দল (Army Service Corps) "R I. A. S. C."	৩৬০,০০০
ভারতীয় অর্ডন্যান্স দল ("Army Ordnance Corps") "I. A. O. C."	৬৪,০০০
ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ("Army Electrical & Mechanical Engineer") "I. A. E. M. E."	৯৯,০০০

এই হলো সংক্ষেপে বর্ণিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় ফৌজ। মরুভূমির যুদ্ধে, জঙ্গলের যুদ্ধে ও পর্বতের যুদ্ধে —এই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অফিসার ও 'জওয়ানের' দল শৌর্য, সাহস ও রণকুশলতার চরম কীর্তি অর্ধ পৃথিবীর রণক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছে। পক্ষে অথবা বিপক্ষে, পৃথিবীর সর্বজাতির সৈনিক বিস্মিত হয়ে দেখেছে, 'লাল ঈগল' ও

'ব্যাঘ্র শিরে'র দল (৪নং ভারতীয় ডিভিসন ও ২৬নং ভারতীয় ডিভিসন) কী দুর্বার অভিযানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দুর্গের পর দুর্গ, ঘাঁটির পর ঘাঁটি, শিবিরের পর শিবির ছিন্নভিন্ন ও অধিকার ক'রে ফিরেছে। হর হর মহদেও ! মারাঠা পদাতিকের রণহুংকার কেরেনের পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ইতালীয় শিবির চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। হনুমান জী কি জয় ! জাঠ পদাতিকের রণোন্মত্ত নির্ঘোষ, মধ্যপ্রাচ্যের রাত্রির নিঃস্তব্ধতা চমকে দিয়ে বিপক্ষের প্রাণ চমকে দিয়েছে। খাল্‌সা জী কি জয়! দূর আড্রিয়াতিক রণাঙ্গনে শিখ পদাতিকের যুদ্ধনাদ দিক্‌প্রান্তর প্রকম্পিত করেছে। ভারতীয় বিমানের গুরুগর্জন, ভারতীয় রণপোতের সদর্প সমুদ্র পরিক্রমা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক একটি কীর্তির অধ্যায় রচনা করেছে। এক ঘটনাবহুল, দৃশ্যবহুল ও কাহিনীবহুল ইতিহাস। দূর মরু ও অরণ্যে দেখা যায় পাতিয়ালার 'রাজেন্দ্র' পদাতিক প্রবল স্রোতের মত এগিয়ে চলে যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের মরুস্থান পার হয়ে চলেছে বিকানীরের উষ্ট্রারোহী সৈন্য 'গঙ্গা রিসালা'। এই রণক্ষেত্রে আলোয়ারের 'জয় পল্টন' ঐ রণক্ষেত্রে ভোপালের 'গওহর-ই-তাজ'। সমুদ্র উপকূলের দিকে লক্ষ্য করলে, আরও কত অভাবিত ও অকল্পিত দৃশ্য দেখা যায়—দেখা যায় ভারতীয় স্যাল্‌ভেজ তরী 'ভদ্রাবতী' জলতল থেকে এক একটি সমাধিস্থ জাহাজ উদ্ধার ক'রে ফিরছে। আফ্রিকা রণাঙ্গনে দুর্ধর্ষ লাল ঈগলকে (৪নং ভারতীয় ডিভিসন) স্বয়ং সম্রাট ও মিঃ চার্চিল অভিবাদন জানাতে উপস্থিত হয়েছেন। জলে, স্থলে ও আকাশে বিস্ফোরকের এক বিরাট সংহারলীলার মধ্যে ভারতীয় ফৌজের অগ্নিদীক্ষা সমাপ্ত হয়—ছয় বৎসর কাল পরে—এক্সিস পক্ষের চরম আত্মসমর্পণের পর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কৃতিত্বের কারণে ভারতীয় সৈনিকেরা যে

পরিমাণ পদক ও পুরস্কার লাভ করে, সরকারী বিবৃতিতে উল্লিখিত তার হিসাব উদ্ধৃত হলো: সব সুদ্ধ 'জঙ্গী ইনামে'র সংখ্যা হলো ১২,৫০০। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস ৩১টি, তা ছাড়া 'তারকা' (Star) পুরস্কার দেওয়া হয় কয়েক লক্ষ। যথা:

(ক) '১৯৩৯-৪৫' তারকা—১,৫০০,০০০

(খ) বর্মা তারকা —১,২০০,০০০

(গ) আফ্রিকা তারকা —২০২,০০০

"তারকা ও মেডাল দেবার জন্য ২০০ মাইল রিবন (ফিতা) এবং ১ কোটী ৮০ লক্ষ তোলা ধাতু খরচ হয়।"

ভারতের প্রধান সেনাপতি (১৭৪৮—১৯৪৭)

১৭৪৮ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পযন্ত, দু'শো বছর ধ'রে ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্রিটিশ জেনারেলের দল সপ্রতাপে ভারতের ফৌজী সাধনা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ভারতের সেই ফৌজী সাধনা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে। প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেকের সঙ্গে সঙ্গে এই দুশো বছরের প্রাধান্যের ইতিহাস সমাপ্ত হয়।

	নাম	সাল
(১)	মেজর লরেন্স (Lawrence)	১৭৪৮
(২)	কর্ণেল অ্যাড্লারক্রন (Adlercron)	১৭৫৪
(৩)	কর্ণেল ক্লাইভ (Clive)	১৭৫৬
(৪)	মেজর কেল্যাণ্ড (Cailland)	১৭৬০
(৫)	মেজর ক্যার্ণাক (Carnac)	১৭৬০
(৬)	লেঃ কর্ণেল কুট (Coote)	১৭৬১
(৭)	মেজর অ্যাডাম্স্ (Adams)	১৭৬৩
(৮)	মেজর ক্যার্ণাক (Carnac)	১৭৬৪
(৯)	মেজর মান্রো (Munro)	১৭৬৪
(১০)	ব্রিগ জেনারেল ক্যার্নাক (Carnac)	১৭৬৫
(১১)	মেজর জেনারেল ক্লাইভ (Clive)	১৭৬৫
(১২)	কর্নেল স্মিথ (Smith)	১৭৬৭
(১৩)	ব্রিগ. জেনারেল বার্কার (Barker)	১৭৭০

(১৪)	কর্ণেল চ্যাপম্যান (Chapman)	১৭৭৪
(১৫)	লেঃ জেনারেল ক্লেভারিং (Clavering)	১৭৭৪
(১৬)	লেঃ জেনারেল কুট (Coote)	১৭৭৯
(১৭)	লেঃ স্লপার (Sloper)	১৭৮৫
(১৮)	লেঃ জেনারেল কর্ণওয়ালিস (Cornwalis)	১৭৮৬
(১৯)	মেজর জেনারেল এবারকম্বি (Abercomby)	১৭৯৩
(২০)	লেঃ জেনারেল ক্লার্ক (Clark)	১৭৯৭
(২১)	লেঃ জেনারেল লেক (Lake)	১৮০১
(২২)	জেনারেল কর্ণওয়ালিস (Cornwalis)	১৮০৫
(২৩)	জেনারেল লর্ড লেক (Lake)	১৮০৫
(২৪)	লেঃ জেনারেল হেউইট (Hewitt)	১৮০৭
(২৫)	লেঃ জেনারেল নুজেন্ট (Nugent)	১৮১২
(২৬)	জেনারেল আর্ল অব ময়রা (Moira)	১৮১৩
(২৭)	লেঃ জেনারেল প্যাজেট (Paget)	১৮২৩
(২৮)	জেনারেল লর্ড কম্বারমীয়ার (Combermere)	১৮২৫
(২৯)	জেনারেল আর্ল অব ডালহৌসি (Dalhousie)	১৮৩০
(৩০)	জেনারেল বার্ণস্ (Barnes)	১৮৩২
(৩১)	জেনারেল লর্ড বেণ্টিক (Bentinck)	১৮৩৩
(৩২)	লেঃ জেনারেল ফেন (Fane)	১৮৩৫
(৩৩)	মেজর জেনারেল নিকল্স্ (Nicolls)	১৮৩৯
(৩৪)	জেনারেল বার্ট (Bart)	১৮৪৩
(৩৫)	নেপিয়ার (Napier)	১৮৪৯
(৩৬)	জেনারেল গোম (Gomm)	১৮৫০
(৩৭)	জেনারেল অ্যানসন (Anson)	১৮৫৬
(৩৮)	জেনারেল ক্যাম্বেল (Campbell)	১৮৫৭

(৩৯) জেনারেল রোজ (Rose) ১৮৬০

(৪০) জেনারেল ম্যানস্‌ফিল্ড (Mansfield ১৮৬৫

(৪১) জেনারেল নেপিয়ার (Napier) ১৮৭০

(৪২) জেনারেল হেইন্‌স্‌ (Haines) ১৮৭৬

(৪৩) জেনারেল স্টুয়ার্ট (Stuart) ১৮৮১

(৪৪) জেনারেল রবার্টস্‌ (Roberts) ১৮৮৫

(৪৫) জেনারেল হোয়াইট (White) ১৮৯৩

(৪৬) জেনারেল লকহার্ট (Lockhart) ১৮৯৮

(৪৭) জেনারেল পামার (Palmer) ১৯০০

(৪৮) জেনারেল ভাইকাউন্ট কিচেনার (Kitchener) ১৯০২

(৪৯) জেনারেল ক্রীগ (Creagh) ১৯০৯

(৫০) জেনারেল ডাফ্‌ (Duff) ১৯১৪

(৫১) জেনারেল মন্‌রো (Monro) ১৯১৬

(৫২) জেনারেল লর্ড রলিনসন (Rawlinson) ১৯২০

(৫৩) ফিল্ড মার্শাল লর্ড বার্ডউড (Birdwood) ১৯২৫

(৫৪) ফিল্ড মার্শাল চেটউড (Chetwode) ১৯৩০

(৫৫) জেনারেল ক্যাসেল্‌স্‌ (Cassells) ১৯৩৫

(৫৬) জেনারেল অকিনলেক (Auchinleck) ১৯৪১

(৫৭) জেনারেল ওয়েভেল (Wavell) ১৯৪২

(৫৮) ফীল্ড মার্শাল অকিন্‌লেক (Auchinleck) ১৯৪৩-৪৭
(১৫ই আগস্ট)

ফীল্ড মার্শাল অকিনলেক ব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষের শেষ সেনাপতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর

মহাযুদ্ধের অন্তে ভারতের কংগ্রেস নেতা ও কর্মী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। আর একটি ঘটনা দেখা দেয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিবিরে ফৌজের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই সব ফৌজী বিক্ষোভগুলি মূলতঃ সার্ভিসঘটিত অসুবিধা, অল্প বেতন, বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হয়েছিল, এবিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নায়কগণ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় সৈনিককে শান্ত থাকবার জন্য অনুরোধ করেন এবং এই অনুরোধ সফল হয়। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের (R. A. F.) একদল ব্রিটিশ বৈমানিককেও এই সময় বিক্ষোভ বা বিদ্রোহমূলক আচরণের অপরাধে বিচার করা হয়। সুতরাং এই সব ফৌজী বিক্ষোভগুলি বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তরকালীন অসন্তোষজনিত বিক্ষোভ ছিল, রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়। ভারতীয়, গুর্খা এবং ব্রিটিশ সকল শ্রেণীর সৈনিকের মধ্যে এই অসন্তোষ অল্প অল্প দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন হয়। সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল দলের পরাজয় এবং শ্রমিকদলের সাফল্য। মিঃ অ্যাট্লিকে প্রধান মন্ত্রীরূপে নিয়ে শ্রমিকদলের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পর ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় দ্রুত ঘটনাবলীর পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হয়। পর পর ক্রম অনুসারে এই পরিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলিকে সাজানো যেতে পারে :

১৫ই মার্চ ১৯৪৬ —ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাট্‌লি ঘোষণা করেন যে—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের কাছে 'শান্তিপূর্ণভাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

মার্চ—মে ১৯৪৬ —ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের ভারত আগমন। মন্ত্রিমিশন কর্তৃক ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা ঘোষণা।

২৯শে জুন ১৯৪৬ —ভারতে সাময়িক 'তদারক' (Caretaker) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা।

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ —মুসলিম লীগ কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস' উদ্‌যাপন—কলিকাতায় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ —অন্তর্বর্তী (Interim) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। প্রথম জাতীয় গবর্ণমেণ্ট—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও দেশরক্ষা মন্ত্রী বলদেব সিং।

১২ই অক্টোবর ১৯৪৬ —অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে মুসলিম লীগের যোগদান।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ —ভারতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন।

জানুয়ারী ১৯৪৭ —পাঞ্জাবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক আক্রমণ আরম্ভ।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ —ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা—"দায়িত্বশীল ভারতীয় পক্ষসমূহের" ("responsible Indian hands") ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে।

২৪শে মার্চ ১৯৪৭ —লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের গবর্ণর জেনারেল রূপে ভারত আগমন।

৩রা জুন ১৯৪৭ —ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা "১৫ই আগষ্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।" ভারত খণ্ডনের আভাষ।

১৮ই জুলাই ১৯৪৭ —ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারত স্বাধীনতা বিল' গৃহীত। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টির ব্যবস্থা।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ —ভারত খণ্ডন। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি ও ক্ষমতা হস্তান্তর। স্বাধীন ভারতের জন্ম।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভারত আগমন এবং তারপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত ৩রা জুনের (১৯৪৭) পরিকল্পনা ভারতের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই সমর্থন করে। এর পরেই ভারত খণ্ডনের আয়োজন আরম্ভ হয়। ভারত খণ্ডনের বিভিন্ন বিভাগীয় উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজ খণ্ডনেরও উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

১৫ই আগষ্টের মধ্যে ভারতীয় ফৌজ খণ্ডনের পরিকল্পনাও সমাপ্ত হয়। ভারতীয় ফৌজের একটি অংশ পাকিস্তানী ফৌজে পরিণত হয়। এর পরের অধ্যায় হলো 'স্বাধীন ভারতের' ফৌজের পুনর্গঠন।

সুতরাং মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস তিনটি প্রধান পরিবর্তনের অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫—৩রা জুন ১৯৪৭ : ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি অনুযায়ী অখণ্ড ভারতীয় ফৌজের ছাটাই, পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের অধ্যায়।

(খ) ৩রা জুন, ১৯৪৭—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ : ভারতীয় ফৌজ খণ্ডনের পদ্ধতি, ব্যবস্থা ও উদ্যোগ।

(গ) ১৫ই আগষ্টের পর : ১৫ই আগষ্টে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ভারতীয় ফৌজের জীবনে বিশিষ্ট কয়েকটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও ঘটনা।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫—৩রা জুন, ১৯৪৭

খেলার শেষে যেমন খেলাঘর ভেঙে দেবার ব্যাপার দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় ফৌজে সেই ব্যাপার দেখা দিল। দলভঙ্গের (Demobilisation) পালা। দলভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের পুনর্গঠনের কথাও ওঠে। ভারতীয় রণক্লান্ত শিবিরকে ভেঙে ছোট করা, সেই সঙ্গে নতুন পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করার উদ্যোগ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আরম্ভ করেন। অকিনলেক তখন (১৯৪৫ সাল) ভারতের প্রধান সেনাপতি। আর একজন প্রাক্তন সেনাপতি তখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল—লর্ড ওয়াভেল।

অকিনলেক ঘোষণা করলেন—"১৯৪৬ সালের ৩১শে মে তারিখের মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ ভারতীয় সৈনিককে বিদায় দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করতে হবে।" এটা হলো প্রথম দফায় যত সংখ্যক সৈনিককে বিদায় দেওয়া হবে তার সংখ্যানির্দেশ। এর পর দ্বিতীয় দফায় আরও কয়েক লক্ষ বিদায় দেওয়া হবে। তারপর তৃতীয় দফা। এই ভাবে সৈন্য বিদায় ক'রে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে ভারতীয় ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ১০ লক্ষ করা হবে—এই ছিল অকিনলেকের পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি মাসে হাজার হাজার সৈন্য বিদায় ক'রে

দেওয়া হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে হিসাব ক'রে দেখা গেল যে ১২ লক্ষ সৈন্য বিদায় করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে হিসাব নিয়ে দেখা যায়, ১,২৯৫, ৩২৪ জন ভারতীয় সৈনিককে বিদায় করা হয়েছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) তারিখে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের অর্থ-মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি বাজেট নিবেদন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন : "যত সংখ্যক্ সৈন্য বর্তমানের মত বিদায় দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ করার জন্য এখনও আরও ২লক্ষ সৈন্য বিদায় দেওয়া বাকী আছে।"

কিন্তু বিদায় দেবার পালা আর খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। কারণ, ভারতে আসন্ন একটি বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। ভারতবর্ষ দু'ভাগ হবে এবং স্বাধীন হবে, এই দুই পরিবর্তনের আভাষ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ঘোষিত ৩রা জুনের (১৯৪৭) পরিকল্পনায়।

তবে যুদ্ধ অবসান থেকে আরম্ভ ক'রে এই ৩রা জুন (১৯৪৭) পর্যন্ত সময়ের অধ্যায়টিকেঁ শুধু ভারতীয় ফৌজ হ্রাস করার পালা বলা উচিত নয়। এরই মধ্যে ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিনলেক ভারতীয় ফৌজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে কতগুলি নীতি গ্রহণ করেন এবং কতগুলি উদ্যোগও আরম্ভ হয়।

নীতির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিষয় ছিল, ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণের বিষয়। ভারতীয় ফৌজকে ব্রিটিশ অফিসার দ্বারা পরিপূর্ণ ক'রে রাখা আর চল্‌তে পারে না, ভারতীয় জনমতের এই পুরাতন দাবীও নতুন ক'রে সরব হয়ে ওঠে। অকিনলেকও ঘোষণা করলেন, ভারতীয় ফৌজের 'জাতীয়করণ' এইবার সম্পূর্ণ করা হবে।

জাতীয়করণ (Nationalisation) কথাটার অর্থ কি? লক্ষ্য কি?

"একটি সম্পূর্ণ জাতীয় বাহিনী সৃষ্টি করা। বর্তমান ভারতীয় বাহিনীর যে রকমের দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতার কোন অবনতি না ক'রে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সৈনিক ও ভারতীয় অফিসার দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী"*

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা কাউন্সিল অব স্টেটের অধিবেশনে (৮ই এপ্রিল ১৯৪৬) পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান সেনাপতি উক্ত মন্তব্য করেন। পণ্ডিত কুঞ্জরুর প্রস্তাব ছিল—কতদিনের মধ্যে ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করা হবে, তার জন্য একটা সময়ের সীমা নির্দিষ্ট করা হোক্। পণ্ডিত কুঞ্জরু দাবী করেন যে, দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ সম্পূর্ণ ক'রে ফেলতে হবে, এই সিদ্ধান্ত করা হোক্।

পণ্ডিত কুঞ্জরুর প্রস্তাব সম্পর্কে স্যার ক্লড অকিনলেক আরও যেসব মন্তব্য করেন সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহু বৎসর আগে সাইমন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে, অতি দূর ভবিষ্যতেও ভারতীয় বাহিনী থেকে ব্রিটিশ অফিসার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব হবে না। সাইমন কমিশনের কল্পনায় চিরকালের ব্রিটিশ অফিসার অধ্যুষিত ভারতীয় ফৌজের যে রূপ স্থান পেয়েছিল, ১৯৪৬ সালে পৌঁছেও দেখা যায় যে স্যার ক্লড অকিনলেকের

* "It is to create a completely national army, that is, an army officered and manned throughout by Indians in the shortest possible space of time without lowering the very standard of efficiency which obtains in the Indian Army today"—Sir Claude Auchinleck (Council of State Debate 8. 4. 46.)

কল্পনাতেও সেই ছবিই বড় হয়ে রয়েছে। স্যার ক্লড মন্তব্য করেন যে, দ্রুত জাতীয়করণ সম্ভব হবে না এবং হওয়া উচিত নয়। ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসারদের দ্রুত (অর্থাৎ ১০ বৎসরের মধ্যে) বিদায় দিলে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধদক্ষতা (efficiency) হ্রাস পাবে।

স্যার ক্লডের আর একটি মন্তব্য শুনে রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভারতীয় সদস্যেরা অনেকে বিস্ময় বোধ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় যেসব অফিসার দক্ষতা এবং কৃতিত্বের সঙ্গে ফৌজ পরিচালনার প্রমাণ দিয়ে থাকে, শান্তির সময়ে তারা সেরকম দক্ষতা বা কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারে না। এটা নাকি স্যার ক্লডের অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব। *

পণ্ডিত কুঞ্জরুর প্রস্তাব ভোটে পরাভূত হওয়ায় স্যার ক্লড অকিনলেকের 'যতদূর সাধ্য অল্প সময়ের মধ্যে' জাতীয়করণের নীতি অব্যাহত থাকে।

৬ই মার্চ (১৯৪১) তারিখে ভারতের যুদ্ধ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন একটি বিবৃতিতে যে তথ্য প্রকাশ করেন, তাতে দেখা যায় সেসময় ভারতীয় ফৌজের 'উচ্চ অফিসার পদে' কত সংখ্যক্ ব্রিটিশ এবং কত সংখ্যক্ ভারতীয় ছিল।

পদ	ব্রিটিশ অফিসার	ভারতীয় অফিসার
৬৩ জন মেজর জেনারেল	৬৩	+
১২০ জন ব্রিগেডিয়ার	১১৬	৪

* In civilian circles it is widely believed that because an officer has proved himself a good junior leader in war—on the battlefield—that, therefore, he must of necessity make a good officer in peace. My experience goes to prove that this is a complete and dangerous fallacy—Sir Claude Auchinleck.

২১৪ জন কর্ণেল	১৯১	২৩
১৮৬৮ জন লেঃ কর্ণেল	১৬২৮	২৪০

১৯৪৬ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে প্রধান সেনাপতি অকিনলেক ভারতীয় ফৌজের স্থায়ী কমিশন প্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যার একটা হিসাব দাখিল করেন। ১৯৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় ফৌজে (স্থল নৌ ও বিমান) নিযুক্ত স্থায়ী কমিশন প্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা হলো :

ব্রিটিশ অফিসার—২৩৬৬

ভারতীয় অফিসার—৬৭৯

কিভাবে এই বিরাট সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারের পরিবর্তে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ সম্ভব করা যায়, এটাই ছিল ভারতের প্রশ্ন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তথা ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে এমন কোন সুস্পষ্ট পদ্ধতির কথা বলতে পারলেন না, যার ফলে একটা ধারণা সম্ভব হতো যে এই ভাবে অমুক সময়ের মধ্যে ভারতীয় ফৌজের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হবে।

এর আগে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি দেশরক্ষা পরামর্শ কমিটি (Defence Consultative Committee) গঠন করেছিলেন। ভারতীয় ফৌজের পুনর্গঠন, জাতীয়করণ ইত্যাদি ব্যবস্থার নীতি ও রীতি নির্ধারণের জন্য এই কমিটির ওপর সব কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে আর কোন কার্যকরী উদ্যোগ এ বিষয়ে অগ্রসর করা হয়নি।

এরই মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটা ঘোষণা অবশ্য করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ঘোষণা করা হয় যে ভারতবর্ষে জাতীয় যুদ্ধস্মৃতি অ্যাকাডেমি (National War-Memorial Academy) নামে একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হবে। জল, স্থল ও বিমান বাহিনীতে অফিসার পদে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এইখানে

শিক্ষার্থী সৈনিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, তাছাড়া টেকনিক্যাল বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ক্রমোচ্চ চার শ্রেণী সম্বলিত চার বছরের শিক্ষাকাল (গ্র্যাজুয়েট কোর্স) নির্দিষ্ট হয়। পুনার নিকট খরকাওয়াস্‌লা নামক স্থানে এই বিত্থায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। ১৬—১৯ বছর বয়স এবং ম্যাট্রিকুলেশন অথবা ম্যাট্রিকুলেশনের সমগুণ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের এই বিত্থায়তনে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

পরিকল্পনাগত এই সব ব্যাপার ছাড়া কাজের ক্ষেত্রেও ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সময় ভারতীয় ফৌজের কতগুলি গঠনমূলক উন্নতি অবশ্য করেছিলেন। প্রধানতঃ স্যার ক্লড অকিনলেকের উৎসাহেই এই সব উন্নতি হয়েছিল।

১৯৪৬ সালে ভারতীয় ফৌজে প্যারাসুট সৈন্য প্রথম গঠিত হয় এবং প্যারাসুট শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। স্যার ক্লড অকিনলেকের 'বালক কোম্পানী' (Boy's Company) পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হয়। 'বালক কোম্পানী'র শিক্ষাকাল ২ বৎসর, শিক্ষার্থীর বয়স ১৫ বছর নির্দিষ্ট করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে কতগুলি 'বালক কোম্পানী' গঠিত হয়। নৌবাহিনীর ও বিমানবাহিনীর উন্নতি হয়। নতুন জাহাজ এবং নতুন শ্রেণীর বিমান যথাক্রমে ভারতীয় নৌ ও বিমানবহরে যুক্ত হয়। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার (I. E.) ফৌজ এই সময় 'রয়্যাল' আখ্যা লাভ করে। বোম্বাই স্যাপার, বেঙ্গল স্যাপার ও মাদ্রাজ স্যাপার—এই চারটি পুরনো বনিয়াদী স্যাপার দল এবং যুদ্ধের সময় গঠিত ৬টি নতুন স্যাপার দল মিলিয়ে 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার, (R. I. E.) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু স্যার ক্লডের সংস্কারমূলক বা উন্নতিমূলক উদ্যোগ আর অগ্রসর

করাবার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে মূল দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতেই চলে আসবার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। পণ্ডিত নেহরুর দ্বারা অন্তর্বর্তী (জাতীয়) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিণাম জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব রূপে পরিণত হলো। সর্দার বলদেব সিং প্রথম ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবরূপে ভারতীয় ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতীয় ফৌজ দীর্ঘ দু'শো বছরের ব্রিটিশ পরিচালনার ইতিহাস শেষ ক'রে এই প্রথম জাতীয় পরিচালনার স্পর্শ লাভ করলো।

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণের পূর্ব অধ্যায়ে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী (Interim) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী এবং সর্দার বলদেব সিং দেশরক্ষা মন্ত্রী হন। ৯ই অক্টোবর (১৯৪৬) তারিখে উভয় মন্ত্রী সম্মিলিতভাবে ভারতীয় ফৌজের জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির প্রধান বিষয়গুলি হলো :—

(ক) জাতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

(খ) এই অফিসারগণকে অবশ্যই যতদূর সম্ভব উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

(গ) ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণ জাতীয় বাহিনীতে পরিণত ক'রে, সেই সঙ্গে ফৌজের সামরিক দক্ষতাকেও উচ্চ পর্যায়ে রাখতে হবে।

(ঘ) ভারতীয় ফৌজকে অবশ্যই কোন দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া চল্‌বে না।

এই নীতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট জাতীয়করণের পন্থা নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।

"কমিটির চেয়ারম্যান হন, স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। সদস্যবৃন্দ—পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, মিঃ মহম্মদ ইসমাইল, সর্দার সম্পূরণ সিং। ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রত্যেকটি থেকে একজন ক'রে সিনিয়ার অফিসার, ব্রিটিশ সার্ভিসের জনৈক সিনিয়ার অফিসার।

"জাতীয় স্বার্থ এবং যথাসঙ্গত যুদ্ধদক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় ফৌজকে কম সময়ের মধ্যে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করা যায়"—তারই ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিরূপণ ক'রে ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য কমিটির ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়।

জাতীয় ক্যাডেট দল কমিটি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হবার প্রায় এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ সম্বন্ধে একটা প্রচেষ্টার প্রমাণ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ছিল (University Officer's Training Corps) সেই ব্যবস্থার সংস্কার বা পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মেজর ইস্‌কান্দর মির্জাকে চেয়ারম্যান রূপে এবং লেঃ কর্নেল এল পি সেনকে সেক্রেটারী রূপে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটির পক্ষে বিশেষ কিছু কাজ করবার প্রয়োজন অথবা সুযোগ হয়নি, কারণ ছাত্রদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভিন্ন ধরণের এবং ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়—'জাতীয় ক্যাডেট দল' গঠনের পরিকল্পনা।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে সভাপতি রূপে নিয়ে একটি 'জাতীয় ক্যাডেট দল' (National Cadet Corps) কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল—কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে ছাত্রেরা যাতে ভবিষ্যতে সামরিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন ক'রে রাখতে পারে, তার জন্য সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে ফৌজী শিক্ষার্থী দল গঠন করা ("establishment on a nationwide basis a National Cadet Corps Organisation in educational institutions, both Colleges and Universities and Schools.")

৩রা জুন, ১৯৪৭—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

ভারতবর্ষ খণ্ডিত হবে, সুতরাং ভারতীয় ফৌজও খণ্ডিত হবে, ৩রা জুনের ব্রিটিশ ঘোষণায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর আরম্ভ হয় ভারতীয় ফৌজ দুই ভাগ করার উদ্যোগ। ৩০শে জুন তারিখে ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে বিভাগ পরিষদের (Partition Council) বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ভারতীয় ফৌজ বিভাগ করার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা আলোচিত হয়। উক্ত বৈঠকে সর্দার প্যাটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের তরফে, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ মুসলিম লীগের তরফে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং। প্রধান সেনাপতি ফীল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক এবং লর্ড ইস্‌মে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন ভারতের যুদ্ধকালীন দেশরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন সেক্রেটারী অভিজ্ঞ স্যার চাঁদুলাল ত্রিবেদী।

এই বৈঠকে ভারত ডোমিনিয়নের জন্য এবং পাকিস্তান ডোমিনিয়নের জন্য ফৌজ বণ্টন করার মূল নীতি গৃহীত হয়। পর পর তিনটি নীতিগত পদ্ধতি অনুসারে ফৌজ বিভাগ করার ব্যবস্থা হয়।

(ক) সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে ফৌজ ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়।

অর্থাৎ ১৫ই আগষ্টের মধ্যে সমস্ত ফৌজ এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, যেসকল ফৌজী দলগুলিতে মুসলমান সৈনিক বেশী সেগুলি থাকবে পাকিস্তানে এবং যে সকল ফৌজী দলে অমুসলমান সৈনিকেরা সংখ্যায় বেশী সেগুলি থাকবে ভারতে।

(খ) আঞ্চলিক পদ্ধতিতে বিভাগ। সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে ঐ ভাবে ভাগ হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় দফা বিভাগ করতে হবে আঞ্চলিক (territorial) পদ্ধতিতে অর্থাৎ যে সৈনিক যে ডোমিনিয়নের অধিবাসী সেই ডোমিনিয়নের ফৌজে সে থাকবে। ১৫ই আগষ্টের পরে যত শীঘ্র সম্ভব এই কাজ সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

(গ) রাষ্ট্রানুগতিক পদ্ধতিতে বিভাগ : এটা হলো ফৌজ ভাগের তৃতীয় দফা নীতি। এই নীতিটি ঠিক সাম্প্রদায়িক নয়, আঞ্চলিকও নয়। বলা যেতে পারে রাষ্ট্রানুগতিক নীতি।

এই নীতি হলো—(১) পাকিস্তানে বাড়ী এরকম যে কোন অমুসলমান সৈনিক ইচ্ছা করলেই ভারতীয় ফৌজে স্থান লাভ করবে। তেমনি ভারতে বাড়ী এরকম যেকোন মুসলমান সৈনিক ইচ্ছে করলে পাকিস্তানী ফৌজে স্থান লাভ করবে। (২) পাকিস্তানে বাড়ী কোন অমুসলমান সৈনিক ইচ্ছে করলে পাকিস্তানী ফৌজেই থাকতে পারবে। ভারতে বাড়ী যে কোন মুসলমান সৈনিক ইচ্ছে করলেই ভারতীয় ফৌজে থাকতে পারবে। এই নীতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে বাড়ী অমুসলমান সৈনিককে এবং ভারতে বাড়ী মুসলমান সৈনিককে দুই রাষ্ট্রের যে কোন একটি রাষ্ট্রকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রইল—ভারতে বাড়ী কোন অমুসলমান সৈনিক পাকিস্তানী ফৌজে স্থান পাবে না।

তেমনি, পাকিস্তানে বাড়ী কোন মুসলমান সৈনিক ভারতীয় ফৌজে স্থান পাবে না।

যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ

উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ (Joint Defence Council) গঠিত হয়। দুই ডোমিনিয়নের দুই গবর্ণর জেনারেল, দুই ডোমিনিয়নের দুই দেশরক্ষা সচিব এবং তৎকালীন প্রধান সেনাপতি—এই পাঁচ জন নিয়ে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৫ই আগষ্টের পর তৎকালীন প্রধান সেনাপতির নতুন পদ হবে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার (Supreme Commander)। সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। তিনি দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বা সৈন্যপরিচালনা এবং অভিযান ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকবেন না। মাত্র এক ডোমিনিয়ন থেকে অন্য ডোমিনিয়নে সৈন্য বদলির কাজ এবং দুই ডোমিনিয়নের দুই ফৌজ পুনঃসংস্থাপনের (Reconstitution) কাজে তিনি ও তাঁর দপ্তর সাহায্য করবেন। দুই ডোমিনিয়নের দুই দেশরক্ষা সচিবই এবং দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রধান সেনাপতি বস্তুতঃ তাঁদের ফৌজের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন। আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে তাঁদের নিজ নিজ ফৌজের বিভিন্ন সদর দপ্তর (Head Quarter) গঠন ক'রে ফেলবেন, যাতে ১৫ই আগষ্টের পর উভয়েই নিজ নিজ ফৌজের কম্যাণ্ড গ্রহণ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৫ই আগষ্ট তারিখ থেকে 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডে'র দপ্তর তার কাজ আরম্ভ করবে এবং ১৯৪৮ এর ১লা জানুয়ারী থেকে সুপ্রীম কম্যাণ্ড আর থাকবে না।

বিভাগ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফৌজ ভাগ করার ব্যবস্থা

অবলম্বনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।—সশস্ত্র বাহিনী পুনঃসংস্থাপক কমিটি (Armed Forces, Reconstitution Committee)। এর মধ্যে তিনটী সাব-কমিটি গঠিত হয়—(১) নৌ সাব-কমিটি (২) বিমান সাব-কমিটি এবং (৩) স্থলবাহিনী সাব-কমিটি।

পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ

ভারত বিভাগের উদ্যোগের সঙ্গে-সঙ্গে পাঞ্জাব প্রদেশকেও দুই ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, পশ্চিম পাঞ্জাব (পাকিস্তান) ও পূর্ব পাঞ্জাব (ভারত)। কিন্তু এই দুই প্রস্তাবিত প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই স্থিরীকৃত হয়নি। সেসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত র‍্যাডক্লিফ সাহেবের বিবেচনাধীন ক'রে রাখা হয়েছিল। তাই 'পশ্চিম পাঞ্জাব' এলাকা ও 'পূর্ব পাঞ্জাব' এলাকা সম্বন্ধে একটা আনুমানিক (Notional) মানচিত্র ধরে নিয়ে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ও দুই পৃথক ডোমিনিয়নের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু এই সময় পাঞ্জাবে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দুই প্রদেশের, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী 'আনুমানিক' সীমানা অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ ক'রে সরিয়ে দেবার জন্য হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করতে থাকে। এই আনুমানিক সীমানা অঞ্চলে অশান্তি দমনের জন্য বিভাগ পরিষদের (Partition Council) ২২শে জুলাই তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পাঞ্জাব সীমান্ত বাহিনী' (Punjab Boundary Force) গঠিত হয়। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সৈনিক নিয়ে সম্মিলিত এই ফৌজ, এবং জনৈক ইংরাজ কম্যাণ্ডার (Major General Rees) প্রধান পরিচালক। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর

সিং ব্রার এবং পাকিস্তানের পক্ষে কর্ণেল আইয়ুব খাঁ মেজর রীসের পরামর্শ দাতা রূপে নিযুক্ত হন। সিয়ালকোট, গুজরাঁওয়ালা, শেখপুরা, লয়েলপুর, মণ্টগোমারী, লাহোর, অমৃতসর, গুরদাসপুর, হোশিয়ারপুর, জলন্ধর, ফিরোজপুর ও লুধিয়ানা—এই কয়টি জিলা পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজের কর্তব্যক্ষেত্র রূপে নির্ধারিত হয়।

বিভক্ত ফৌজ

অতি শোচনীয় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং সংঘর্ষে পাঞ্জাব ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবহাওয়া উৎপীড়িত হয়ে আছে, এই সময় ভারতীয় ফৌজের খণ্ডন কার্যও চলতে থাকে। ভারত এবং পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের কার ভাগে কি পরিমাণ এবং কোন্ কোন্ ফৌজী দল পড়বে, তার তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে যায় এবং সেই অনুসারে ফৌজ স্থানান্তর করার কাজ চল্‌তে থাকে। বিভাগ পরিষদের (Partition Council) সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভক্ত ফৌজের তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

ভারতবর্ষ

(ক) পদাতিক (Infantry) রেজিমেণ্ট : (১) ২নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, (২) ভারতীয় গ্রেনেডিয়ার, (৩) মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রি, (৪) রাজপুতানা রাইফেল, (৫) রাজপুত রেজিমেণ্ট, (৬) জাঠ রেজিমেণ্ট, (৭) শিখ রেজিমেণ্ট, (৮) ডোগ্‌রা রেজিমেণ্ট, (৯) রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেল, (১০) কুমায়ুন রেজিমেণ্ট, (১১) আসাম রেজিমেণ্ট, (১২) শিখ লাইট ইনফ্যানট্রি, (১৩) বিহার রেজিমেণ্ট, (১৪) মহর রেজিমেণ্ট, (১৫) মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট। * মোট ১৫টি রেজিমেণ্ট।

(খ) **সাঁজোয়া ফৌজী দল** (Armoured Corps) (১) : স্কিনারের সওয়ার, (২) গার্ডেনারের সওয়ার বা রয়্যাল ল্যান্সার, (৩) ৩নং ক্যাভাল্‌রি, (৪) হডসনের সওয়ার, (৫) ৭নং ক্যাভাল্‌রি, (৬) ৮নং ক্যাভাল্‌রি, (৭) রয়্যাল ডেক্যান সওয়ার, (৮) সিন্ধু সওয়ার, (৯) ১১নং ক্যাভাল্‌রি, (১০) পুনা সওয়ার, (১১) ১৮নং ক্যাভাল্‌রি, (১২) মধ্যভারত সওয়ার।

মোট ১২টি ক্যাভাল্‌রি দল।

(গ) **গোলন্দাজ** (Artillery) **দল** : সাতটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট (Field Regiment)। দুটি প্যারা ফিল্ড রেজিমেণ্ট (Para Field Regiment)। একটি সার্ভে (Survey) রেজিমেণ্ট। দু'টি মাউণ্টেন (Mountain) রেজিমেণ্ট। দু'টি 'লাইট্' বিমানধ্বংসী রেজিমেণ্ট (Light Anti-Aircraft Regiment)। চারটি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী রেজিমেণ্ট (Anti-Tank Regiment) । একটি মিডিয়াম (Medium) রেজিমেণ্ট।

মোট ১৯টি গোলন্দাজদল।

(ঘ) **ফৌজী এঞ্জিনিয়ার দল**(Engineer Units) : ৯ টি এঞ্জিনিয়ার গ্রুপ (Engineer Group)। ২৩টি ফিল্ড কোম্পানী (Field Company) ২টি প্যারা (Para) ফিল্ড কোম্পানী। ৫টি ফিল্ড পার্ক কোম্পানী (Field Park Company)। ১টি বিমানবাহিত (Park)

* ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান গ্রেনেডিয়ারের নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল—বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার। কুমায়ুন রেজিমেণ্টের নাম পূর্বে ছিল ১৯নং হায়দরাবাদ রেজিমেণ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে এবং যুদ্ধান্তে নবগঠিত রেজিমেণ্ট হলো—মাদ্রাজ, আসাম, বিহার, শিখ লাইট ইফ্যান্‌ট্রি ও মহর।

* * 'হডসন', 'গার্ডেনার' ইত্যাদি নামগুলি হলো এই সকল সওয়ার (ক্যাভাল্‌রি) দলের বনিয়াদী নাম। এই সওয়ার দল ('Cavalry' 'Horse' 'Lancer' প্রভৃতি) সতাই অশ্বারোহী দল নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সবই যন্ত্রোপেত (Mechanised.) হয়ে সাঁজোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

পার্ক কোম্পানী। ৩টি কন্‌স্ট্রাক্‌শন (Construction) কোম্পানী। ২টি ওয়ার্কশপ ও পার্ক কোম্পানী। ৩টি ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও মেক্যানিক্যাল কোম্পানী। ২টি প্ল্যাণ্ট কোম্পানী (Plant Company)। ৬টি প্ল্যাণ্ট প্লেটুন (Plant Platoon)। ১টি কূপখনক (Well-Boring) প্লেটুন। ২টি প্রিণ্টিং সেক্‌শন (Printings Section)। ২টি সাধারণ প্লেটুন (Maintenance Platoon)।

মোট ৬১টি এঞ্জিনিয়ারদল।

(ঙ) নৌবাহিনী :

স্লুপ (Sloop)—সত্‌লজ্‌, (শতদ্রু) যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী।

ফ্রিগেট (Frigate)—তীর, কুক্‌রি।

মাইন সুইপার (Mine Sweeper)—উড়িষ্যা, ডেক্যান, বিহার, কুমায়ুঁ, খৈবার, রোহিলখণ্ড, কর্ণাটিক, রাজপুতানা, কোঁকান, বোম্বাই, বেঙ্গল, মাদ্রাজ।

করভেট (Corvette)—আসাম।

সার্ভে জাহাজ—ইনভেস্টিগেটর।

ট্রলার (Trawler)—নাসিক, ক্যালকাটা, কোচিন, অমৃতসর।

মোটর মাইন সুইপার—৪টি।

মোটর লঞ্চ (হারবার বা পোতাশ্রয় রক্ষার জন্য)—৪টি।

স্থলাবতরণের নৌবহর (Landing Craft)—সমস্ত।

(চ) বিমানবাহিনী :

জঙ্গী স্কোয়াড্রান (Fighter Squadron)—৭টি।

'ডাকোটা' স্কোয়াড্রান (Dakota Squadron)—১টি।

পাকিস্তান

(ক) **পদাতিক রেজিমেণ্ট** : (১) ১নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, (২) ৮নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, (৩) বেলুচ রেজিমেণ্ট, (৪) ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট (৫) ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেল, (৬) ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, (৭) ১৫নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, (৮) ১৬নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট।

মোট ৮টি পদাতিক রেজিমেণ্ট।

(খ) **সাঁজোয়া দল** : (১) প্রোবিনের সওয়ার, (২) ৬নং ল্যান্সার, (৩) গাইড্‌স্ ক্যাভাল্‌রি, (৪) ১৩নং ল্যান্সার, (৫) ১৯নং ল্যান্সার, (৬) ১১নং ক্যাভাল্‌রি।

মোট ৬টি সাঁজোয়া দল।

(গ) **গোলন্দাজ দল** : ৩টি ফিল্ড রেজিমেণ্ট, ১টি সার্ভে রেজিমেণ্ট, ১টি মাউণ্টেন রেজিমেণ্ট, ২টি বিমান-ধ্বংসী রেজিমেণ্ট, ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংসী রেজিমেণ্ট, ১টি মিডিয়াম রেজিমেণ্ট।

মোট ৯টি দল।

(ঘ) **এঞ্জিনিয়ার দল** : ৪টি এঞ্জিনিয়ার গ্রুপ, ১০টি ফিল্ড কোম্পানী, ১টি প্যারা ফিল্ড কোম্পানী, ২টি ফিল্ড পার্ক কোম্পানী, ১টি কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানী, ১টি ওয়ার্কশপ ও পার্ক কোম্পানী, ৩টি ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কোম্পানী, ২টি প্ল্যাণ্ট কোম্পানী, ৫টি প্ল্যাণ্ট প্লেটুন, ২টি কূপ খনক প্লেটুন, ১টি প্রিণ্টিং সেক্‌শন ও ১টি সাধারণ (Maintenance) প্লেটুন।

মোট ৩৩টি এঞ্জিনিয়ার দল।

(ঙ) **নৌবাহিনী** :

স্লুপ—নর্মদা, গোদাবরী।

ফ্রিগেট—শমসের, ধনুষ।

ট্রলার—রামপুর, বড়োদা।

মোটর লঞ্চ (হারবার বা পোতাশ্রয় রক্ষার জন্য)— ৪টি।

মাইনসুইপার—কাথিয়াবাড়, মালোয়া, আউধ, বেলুচিস্থান।

মোটর মাইন সুইপার—২টি।

(চ) **বিমানবাহিনী**:

জঙ্গী স্কোয়াড্রান—২টি

ডাকোটা স্কোয়াড্রান—১টি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ফৌজ ভাগ করে দেওয়া হলো, তার মধ্যে গুর্খা রেজিমেণ্টগুলিকে ধরা হয়নি। গুর্খা রেজিমেণ্টগুলির একটিও পাকিস্তানের ফৌজে যাবে না বলেই ঠিক হয়।

১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা লাভের পর গুর্খা রেজিমেণ্টগুলি সবই ভারতীয় ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকে। গুর্খা ফৌজের সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা কয়েক মাস পরে করা হয়।

ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসারদের বিদায় দেবার নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই নীতিতে সম্মত হন। ভারতবর্ষ থেকে খাস ইংলণ্ডীয় ব্রিটিশ ফৌজ অপসারিত হবে, এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিভাবে ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসারদের বিদায় দেওয়া হবে, কবে কোন্ তারিখের মধ্যে খাস ইংলণ্ডীয় বৃটিশ (গোরা) ফৌজ অপসারিত হবে, এই বিষয়ে ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি ১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত পরেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়। পরবর্তী প্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১৫ই আগষ্টে স্বাধীন ভারতবর্ষের ফৌজের প্রধান তিন পরিচালক পদে প্রথম যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হলেন তাঁরা ব্রিটিশ।

(১) প্রধান সেনাপতি—জেনারেল স্যার রব লকহার্ট (Sir Rob Lockhart)

(২) প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষ—রিয়র অ্যাডমিরাল জে. টি. এস. হল (Rear Admiral J. T. S. Hall)

(৩) প্রধান বিমানসেনাধ্যক্ষ—এয়ার মার্শাল স্যার টমাস এল্‌ম্‌হার্স্ট (Air Marshall Sir Thomas Elmhirst)।

১৫ই আগষ্টে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতের সদর সামরিক দপ্তর (Army Head Quarter) দিল্লীর লাল কেল্লায় স্থাপিত হয়। এই দিনেই ব্রিটিশ ফৌজের 'ভারত ছেড়ে' চলে যাবার উদ্যোগ আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ (গোরা) ফৌজের একটি দল বোম্বাই থেকে জাহাজ যোগে ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডে চলে যায়।

১৫ই আগস্টের পর

১৫ই আগষ্টের পর ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ। ব্রিটিশ গঠিত দীর্ঘ দু'শো বছরের ভারতীয় ফৌজ জাতীয় ফৌজে পরিণত হলো।

১৫ই আগস্ট তারিখে জাতীয় স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট তারিখেই অক্সিলিয়ারী দলগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। ভারতে অবস্থিত য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারা গঠিত আধা-সরকারী আধা-প্রাইভেট সৈন্যদলগুলি ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতঃ লুপ্ত হয়ে যায়।

ব্রিটিশাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত দেশরক্ষা পরামর্শ কমিটিও (Defence Consultative Committee) ১৫ই আগষ্ট তারিখে বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বদলে ১৯৪৮ সালের

জানুয়ারী মাসে নতুন করে একটি দেশরক্ষার পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির নাম—'স্ট্যাণ্ডিং কমিটি অব ডিফেন্স' (Standing Committee of Defence)। এই কমিটির কার্যকাল এক বৎসরের মত নির্দিষ্ট করা হয়। গণপরিষদ এই কমিটির সদস্য মনোনীত করেন। সদস্যেরা হলেন পণ্ডিত কুঞ্জরু, সর্দার যোগীন্দ্র সিং, মিঃ মানিকিয়া লাল বর্মা, শ্রীমোহন লাল গৌতম, সি এম পুনাচা, শ্রীহরি বিষ্ণু কামাথ, মেজর জেনারেল হিম্মৎ সিংজী, পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, মিঃ এস এম পাতিল, মিঃ হুসেন ইমাম।

১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত পরে ভারতীয় ফৌজের যে রূপ দেখা যায় তা থেকে এই ধারণা হয় যে ভারতীয় ফৌজের ওপর জাতীয় কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ফৌজের সমগ্র রূপ সুসংহত হয়ে উঠতে পারেনি। এর কারণ তখনো ফৌজ ভাগ করার প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু তা সত্বেও, প্রকৃত জাতীয় রূপ গ্রহণ করার পথে ভারতীয় ফৌজ দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। সত্যিকারের জাতীয়করণের উদ্যোগ এইবার আরম্ভ হয়। ফৌজের সর্ববিভাগে অতি ত্বরিত গতিতে সংগঠন ও পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে। প্রত্যেকটি সামরিক সদর, জেনারেল স্টাফ, কম্যাণ্ড ইত্যাদি ফৌজের সংঘগত বিষয়ে দ্রুত সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়। সমর বিভাগের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রমোশন দ্বারা ভারতীয় অফিসারদের নিয়োগ করা হতে থাকে।

সংগঠনগত পরিবর্তন ছাড়াও এই সময় ভারতীয় ফৌজকে এমন কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যার দ্বারা ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে নতুন পরীক্ষা অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়।

সংগঠনগত পরিবর্তনের প্রধান দু'টি ঘটনা হলো : (১) গুর্খা

রেজিমেণ্টের গণভোট। (২) ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ ফৌজের বিদায়।

আর, দু'টি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হলো : (১) পাকিস্তান অঞ্চল থেকে আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধারকার্য (২) কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ।

গুর্খা রেজিমেন্টের গণভোট

১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু নগরে একটি ত্রিদলীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়—ভারত, নেপাল ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

ভারতীয় ফৌজে গুর্খারা সৈনিক রূপে কাজ করতে থাকবে, নেপাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ফৌজেও গুর্খা সৈন্য রাখতে নেপাল গবর্ণমেণ্ট সম্মতি দেন। শান্তিকালে ৮টি ব্যাটালিয়ন তৈরী রাখতে যত সংখ্যক সৈনিক দরকার, নেপাল গবর্ণমেণ্ট তত সংখ্যক গুর্খা সৈনিক ব্রিটিশ ফৌজে রাখতে দিতে সম্মত হন।

নেপাল গবর্ণমেণ্টের সম্মতি-প্রাপ্ত এই নীতি অনুসারে স্থির হয় যে, বর্তমানে ভারতীয় ফৌজের অন্তর্গত যতগুলি গুর্খা রেজিমেণ্ট আছে, তার মধ্যে মাত্র ২নং, ৬নং, ৭নং ও ১০নং রেজিমেণ্টের (গুর্খা রাইফেল) রেগুলার ব্যাটালিয়নগুলিকে ব্রিটিশ ফৌজে বদ্‌লি করা হবে। কিন্তু ব্যাটালিয়নগুলিকে এক কথায় বদ্‌লি করা হবে না। ঐসব ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যাচাই ক'রে নিয়ে তার পর বদ্‌লি করা হবে। যারা ভারতীয় ফৌজে থাকতে চায়, তারা ভারতীয় ফৌজে থাকবে। যারা ব্রিটিশ ফৌজে যেতে চায়, তারা ব্রিটিশ ফৌজে যাবে। *

উল্লিখিত চারটি গুর্খা রেজিমেণ্টের ২টি ক'রে রেগুলার ব্যাটালিয়ন ছিল। সুতরাং মোট ৮টি ব্যাটালিয়নের অভিমত (Referendum) গ্রহণ করা হয়।

---

* ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে ১০ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে গুর্খা ফৌজের অভিমত পরীক্ষার ব্যাপার (Referendum) সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক গুর্খা সৈনিকের কাছ থেকে তার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হয়—কোন্ ফৌজে সে থাকতে চায়? ভারতীয় ফৌজে অথবা ব্রিটিশ ফৌজে?

ভারত, নেপাল, ও ব্রিটিশ—এই তিন গবর্ণমেণ্টের ফৌজের প্রতিনিধিদের সম্মুখে এই অভিমত পরীক্ষা হয়। ১০ হাজার গুর্খা সৈনিকের মধ্যে ৩৫০০ জন ব্রিটিশ ফৌজে সার্ভিস গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ব্রিটিশ ফৌজে অন্তর্ভুক্ত এই গুর্খা দলকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মালয়ে প্রেরণ করেন।

ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ ফৌজের বিদায়

৩০শে (১৯৪৭) এপ্রিল তারিখেই লর্ড সভায় ভারতসচিব (Secretary of State for India) ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসারদের বিদায়ের ব্যাপার সম্পর্কে একটি ঘোষণা করেন। ঐ তারিখেই ভারতের বড়লাটও এই বিষয়ে একটি ঘোষণা ('White Paper') করেন। তাতে বলা হয় যে ভারতীয় ফৌজ থেকে যেসব ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করবেন, তাঁরা ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ পাবেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনটি যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসার এবং ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ফৌজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা ততই দ্রুত প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু ভাবতীয় ফৌজে কিছু ব্রিটিশ অফিসার রাখা অবশ্য প্রয়োজন রূপে দেখা দেয়। একই সময়ে এক সঙ্গে সব ব্রিটিশ অফিসার চ'লে গেলে, ভারতীয় ফৌজের কোন কোন বিভাগে অসুবিধা সৃষ্টি হবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। কারণ বিশেষ বিশেষ বিভাগীয় কাজে, বিশেষ বিশেষ অস্ত্রগত, টেকনিকগত ও সংঘগত বিষয়ে অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল। স্থলবাহিনীতে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্রিটিশ অফিসারের প্রয়োজন বেশি না থাকলেও, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে তাঁদের রাখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই সব বাস্তব কারণে অবস্থাসঙ্গত একটা ব্যবস্থা করা হয়—কিছু ব্রিটিশ অফিসার রাখবার নীতি ও ব্যবস্থা। যেসব ব্রিটিশ অফিসার ভারতীয় ফৌজ ছেড়ে

অবিলম্বে ব্রিটিশ ফৌজে বদলি হতে চাইলেন না অর্থাৎ যাঁরা ভারতীয় ফৌজে সার্ভিস নিয়ে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তাঁদের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের একটা কন্‌ট্রাক্ট হয়। ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) পর থেকে একবছর কাল ভারতীয় ফৌজে কাজ করবার কন্‌ট্রাক্ট। এই কন্‌ট্রাক্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, অর্থাৎ একবছর পরে, যদি আরও কিছুকাল ব্রিটিশ অফিসার রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আবার নতুন ক'রে কন্‌ট্রাক্ট হবে, এই সিদ্ধান্ত হয়।

যেসব ব্রিটিশ অফিসার ভারতীয় ফৌজে সার্ভিস রাখতে চাইলেন, তাঁরা সকলেই রাজকীয় কমিশন (King's Commission) প্রাপ্ত অফিসার। এঁদের তাই ব্রিটিশ ফৌজেরই একটি 'বিশেষ তালিকাভুক্ত' দল রূপে গণ্য ক'রে সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের পরিচালনাধীনে আনয়ন করা হয়। অর্থাৎ এই সব ব্রিটিশ অফিসারকে ভারত গবর্ণমেণ্ট যেন ব্রিটিশ ফৌজ থেকে ধার করেছেন, তাঁদের কন্‌ট্রাক্টের মেয়াদ শেষ হলেই তাঁরা চলে যাবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বা ব্রিটিশ ফৌজের তরফ থেকে ভারতের সুপ্রীম কম্যাণ্ডারই এই ব্রিটিশ অফিসার দলের যেন অভিভাবক স্বরূপ রইলেন।

যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কথা ছিল যে ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডের' অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু অক্টোবর (১৯৪৭) মাসের পূর্বেই এমন কতগুলি ঘটনা দেখা দিতে আরম্ভ করে ও তার মধ্যে এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে, যাতে উপলব্ধি করা হয় যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আর রাখা চলবে না। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঘোষণা করা হয় যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে' উঠিয়ে দিতে হবে। সুতরাং ১লা অক্টোবর তারিখে

ব্রিটিশ অফিসারদের তিন মাসের নোটিশ দিয়ে জানানো হয় যে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁদের সার্ভিস শেষ হয়ে যাবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এর পর ব্রিটিশ অফিসারদের রাখতে হলে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী নতুন সর্তে ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে নতুন কন্‌ট্রাক্ট করবেন।

কত সংখ্যক এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয় ফৌজে রাখা হবে, এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা আরম্ভ করেন।

এই হলো ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ অফিসারদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা। এ ছাড়া ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ফৌজের 'গোরা' দলগুলি বিদায় করার পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়ে যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পূর্বেই এই চুক্তি হয়েছিল যে—"ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অবিলম্বে ব্রিটিশ ফৌজ ভারত থেকে অপসারণ করার কাজ আরম্ভ হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব অপসারণের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।" এই চুক্তি অনুসারে ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) পরেই ব্রিটিশ ফৌজ অপসারণ আরম্ভ হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের দুই দিন পরে, ১৭ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের একটি দল প্রথম 'ভারত ছেড়ে' চলে যায়। দীর্ঘ দুই শত বছর পরে ব্রিটিশ ফৌজ সত্যি সত্যি ঐতিহাসিক ভাবে ভারত ছাড়তে আরম্ভ করে।

১৭ই আগষ্ট তারিখে বিদায়ী ব্রিটিশ ফৌজের প্রথম দলকে বোম্বাইয়ে বিদায় অভিনন্দনের অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল কারিয়াপ্পা পণ্ডিত নেহরুর প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। উক্ত বাণীতে পণ্ডিত নেহরু বলেন:

"শান্তিপূর্ণভাবে এবং শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে এই যে বিদায় গ্রহণের ব্যাপার দেখা গেল, ইতিহাসে এই রকম ঘটনা বিরল। ভারতবর্ষে ঘটনাটি যে এই ভাবে দেখা দিল, সেটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। ভবিষ্যতের পক্ষেও এই ঘটনা শুভলক্ষণ বলেই মনে করি।" *

যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের (Joint Defence Council) ২০শে নভেম্বর (১৯৪৭) তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডার' পদ এবং বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ভারতে এবং পাকিস্তানে তখনো যেসব ব্রিটিশ সেনাদল ছিল, তাদের তদারক করবার জন্য একটা কর্তৃমণ্ডল ও দপ্তরের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা হলো 'ভারতে ও পাকিস্তানে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদলের পরিচালক' (Commander of British Forces in India & Pakistan) দপ্তর। লেঃ জেনারেল স্যার আর্থার স্মিথ কম্যাণ্ডার পদ গ্রহণ করেন।

এর পর ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর হয়। ১লা জানুয়ারী (১৯৪৮) তারিখ থেকে ভারতে একটি দপ্তর, এবং পাকিস্তানে ভিন্ন একটি দপ্তর। ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদলের কম্যাণ্ডার হন মেজর জেনারেল হুইস্‌লার (Whistler) এবং পাকিস্তানে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদলের কম্যাণ্ডার হন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বার্নেট (Barnett)। ব্রিটিশ সেনাদলের ভারতীয় দপ্তর বোম্বাইয়ে এবং পাকিস্তানী দপ্তর করাচীতে স্থাপিত হয়।

---

* "It is rare in history that such a parting takes place not only peacefully but also with goodwill. We are fortunate that this should have happened in India. That is a good augury for the future."

ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয় ফৌজে নিযুক্ত রাখবার সর্ত সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নতুন চুক্তি হয় (২০শে নবেম্বর ১৯৪৭)। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই চুক্তি বলবৎ হয়। স্থির হয় যে:—

(১) ভারতীয় ফৌজের স্থলবাহিনীতে যে সব ব্রিটিশ অফিসারকে রাখা হবে, তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ ১ বৎসর।

(২) বিমানবাহিনীতে যেসব ব্রিটিশ অফিসার রাখা হবে, তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ ২ বৎসর।

(৩) নৌবাহিনীতে যেসব বৃটিশ অফিসার রাখা হবে, তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ ৩ বৎসর।

আর একটি সর্ত হলো—এক বৎসর সার্ভিস করার পর, কোন ব্রিটিশ অফিসার ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে কোন ব্রিটিশ অফিসারকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের আর একটি চুক্তিগত সর্ত হলো—যে কোন সময়ে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মচারীদের সরিয়ে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 'তখুনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে জ্ঞাত করবেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মচারীদের ভারতীয় ফৌজের কাজ থেকে ছাড়িয়ে ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ বিষয়ে তিন মাসের নোটিশের কোন প্রশ্ন থাকবে না।

এই ভাবেই এবং এই নীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে ভারত থেকে ব্রিটিশ ফৌজ এবং ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসার একে

একে এবং দলে দলে বিদায় নিতে থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্ট শুধু নিজের প্রয়োজন এবং বিবেচনা অনুযায়ী অল্প সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারকে ভারতীয় ফৌজে রাখলেন, অল্পকালীন সার্ভিসের মেয়াদে।

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ ফৌজ বিদায় এবং ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসার বিদায়ের এই অধ্যায়কে বলতে পারা যায়—ভারতীয় ফৌজের যথার্থ ভারতীয়করণ এবং জাতীয়করণের অধ্যায়। ভারতীয় বাহিনী দ্রুত প্রকৃত জাতীয় বাহিনী রূপে গড়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় ফৌজ কি পরিমাণ 'ভারতীয়' বা 'জাতীয়' রূপ গ্রহণ করে, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত তথ্য থেকেই পাওয়া যাবে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ফৌজে কত সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসার ছিল, এবং ১লা জানুয়ারী তারিখে তার সংখ্যা কি পরিমাণ গ্রহণ করে, নিম্নোক্ত তালিকায় সেই তথ্য উল্লিখিত হলো।

	১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭	১লা জানুয়ারী ১৯৪৮
ব্রিটিশ অফিসার *	১২০০	৩০০
ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার এবং রেজিমেণ্ট্যাল কম্যাণ্ডার (সাঁজোয়া ফৌজ)	—৯০%	৫%
ব্রিগেড ও সাব-এরিয়া কম্যাণ্ডার	—৯৫%	৫%
নৌবাহিনীর অফিসার পদ	—২০০	১৩০

কি পরিমাণ ব্রিটিশ অফিসার কত দ্রুত বিদায় ক'রে দেওয়া হয় উক্ত তালিকার হিসাবে সেটা ধারণা করা যায়। শুধু দেখা

* অখণ্ড ভারতে ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) পূর্বে ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

যায় যে নৌবাহিনীর অফিসার পদে ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্যা বেশী হ্রাস করা হয়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনীতেও ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্যা বেশী হ্রাস করা হয়নি। তবে রয়্যাল এয়ার কোর্সের (R. A. F.) যেসব অফিসার ও বৈমানিককে ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে মিশিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের বিদায় দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মাত্র ৬ জন আর-এ-এফ অফিসার (ব্রিটিশ) ভারতীয় বিমানবাহিনীতে থাকে।

দু'শো বছর আগে ব্রিটিশ ভারতভূমিতে সশস্ত্র মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। দু'শো বছর ধরে এই মূর্তিতে তারা ভারতে শুধু এসেছে। দুই শতাব্দী পরে ভারত ছেড়ে চলে যাবার পালা সুরু হলো। ১৭ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের প্রথম দল বিদায় গ্রহণ করে। আর শেষ দল বিদায় গ্রহণ ক'রে চলে যায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) তারিখে।

ভারত থেকে ব্রিটিশ ফৌজের শেষ বিদায়ী দল সামারসেট লাইট ইনফ্যান্ট্রির ১নং ব্যাটালিয়ন বোম্বাই ডকে জাহাজে উঠবার আগে মিলিটারী ব্যাণ্ডে 'বন্দেমাতরম্' সুর বাজিয়ে ভারতভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। দুই শত বছরের একটি ইতিহাসের সমাপ্তি হলো সেই ক্ষণে।

ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসেও একটা বৃহৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। যে ভারতীয় ফৌজের সাহায্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি অর্ধপৃথিবীকে নিজের সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে সেই ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশের সামরিক ভৃত্য নয়। যে ব্রিটিশ ফৌজ ভারত থেকে দু'শো বছর পরে চলে গেল, তারাও আর ভারতের সামরিক প্রভু নয়।

সামরিক অপসারণ ও উদ্ধার কার্য

যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ ২০শে আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখে এই সিদ্ধান্ত করে যে পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ ভেঙে দেওয়া হোক্ কারণ এই ফৌজ দিয়ে শান্তিরক্ষার কাজ সম্ভব নয়। ৩১শে আগষ্ট তারিখে পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ ভেঙে দেওয়া হয়।

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ব্যাপার এমন আকার ধারণ করে যে, তখন আর শান্তিরক্ষার প্রশ্ন ছিল না। ছিল উদ্ধারকার্যের প্রশ্ন। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীকে ভারতে নিয়ে আসবার সিদ্ধান্ত করা হয়। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টও পূর্বপাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। অর্থাৎ ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ না থাকায় শেষ পর্যন্ত অধিবাসী বিনিময়ের (exchange of population) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ভারত ও পাকিস্তান, দুই ডোমিনিয়নের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে 'মিলিটারীর' সাহায্যে আশ্রয়প্রার্থী অপসারণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পাকিস্তান এলাকা থেকে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীকে ভারতীয় ফৌজ নিজের প্রহরায় রক্ষা ক'রে ভারতে নিয়ে আসবে। তেমনি পাকিস্তানী ফৌজের প্রহরায় পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হবে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই চুক্তি হয়। উভয় গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের ফৌজকে নিজ নিজ এলাকায় কাজে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন।

ভারতীয় ফৌজ কী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও শৌর্যের সঙ্গে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও

শিখকে উদ্ধার ক'রে স্বদেশে নিয়ে এসেছে, তার পূর্ণ বিবরণ যেদিন প্রকাশিত হবে, সেইদিন ভারতীয় ফৌজের প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ফৌজকে এত বৃহৎ উদ্ধারকার্য করতে হয়নি। এই ঘটনা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি এই ঘটনায় ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্বও অতুলনীয়। অদ্ভুত উগ্র ও হিংস্র ধরনের এবং বহু বিচিত্র রকমের বাধা, চারদিকের জনসাধারণ আততায়ী রূপে সংঘবদ্ধ ও তৎপর—এই অবস্থা ও এই রকম এক একটি অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে, ভারতীয় ফৌজ এক একটি উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন করেছে। ভারতীয় বিমান-বহর এই সব আশ্রয়প্রার্থীর জন্য আকাশ পথে উড়ে গিয়ে রুটি, ঔষধ ও বস্ত্র যোগান দিয়েছে। সংহারের অভিযান নয়, নিজের আত্মরক্ষার সংগ্রামও নয়, লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী শিশুর এক একটি বিরাট প্রাণের ভীড়কে আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করা—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতীয় ফৌজই প্রথম এই অভিজ্ঞতা লাভ করলো। আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধারকার্যে ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্ব ইতিহাসের স্মরণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

সামরিক অপসারক সংঘ (M. E. O.)

১৯৪৭এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীকে উদ্ধার ক'রে ভারতে আনবার জন্য একটি সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মিলিটারীর সাহায্যে এবং মিলিটারীর প্রহরায় আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধার ও আনয়নের ব্যবস্থা। এই নবব্যবস্থিত বিভাগের নাম হয় সামরিক অপসারক সংঘ (Military Evacuation Organisation)। এই সংঘের প্রধান

শিবির (Base Camp) স্থাপিত হয় লায়লপুরে, এবং লাহোরে (পাকিস্তানে) একটি অগ্রবর্তী শাখা শিবির (Forward Camp) স্থাপিত হয়। যুক্ত-দেশরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং উভয় ডোমিনিয়নের সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ব্রিগেডিয়ার চিম্‌নি এই সংঘের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। বহু রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত বিখ্যাত ৪নং ভারতীয় ডিভিসনের ওপর এই অভিনব 'রক্ষাযুদ্ধে'র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর উভয় ডোমিনিয়ন অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা করার জন্য চুক্তি করেন। এই চুক্তি হয় যে, ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তান এলাকা থেকে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী উদ্ধার ও অপসারণ ক'রে ভারতে নিয়ে আস্‌বে। তেমনি পাকিস্তানী সৈন্য পূর্বপাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই চুক্তি এক পক্ষের দ্বারাই বস্তুতঃ পালিত হয়। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট পূর্বপাঞ্জাব থেকে নিজের সৈন্যের প্রহরায় মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি, এবং নিয়ে যাবার জন্য ট্রেন প্রভৃতি যানবাহনেরও কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক অপসারক সংঘের (M. E. O.) ওপর এক বিরাট এবং গুরুভার দায়িত্ব পড়লো। একবার কল্পনা করলে বুঝা যায়, ভারতীয় সৈনিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তির ওপর কত বড় পরীক্ষা রূপে এই দায়িত্ব দেখা দিয়েছিল। প্রথম, পাকিস্তান অঞ্চলে গিয়ে তারই আত্মীয়সম স্বধর্মী নরনারী ও শিশুকে দলবদ্ধ মুসলমান আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে ভারতে নিয়ে আসার দায়িত্ব। দ্বিতীয়, তারই স্বদেশ পূর্বপাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে .আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে

পাকিস্তানে পৌঁছে দিয়ে আসার কাজ। মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে সযত্নে পাহারা দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সময় ভারতীয় সৈনিকের চিত্তে এই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল—এই তো এই আশ্রয়প্রার্থীদেরই স্বধর্মীরা পশ্চিম পাঞ্জাবে আমার স্বধর্মীকে প্রতিদিন আক্রমণ করেছে? কিন্তু এই প্রশ্ন ভারতীয় সৈনিকের নৈতিক সত্তাটিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী রক্ষা করার জন্য নিজেরই স্বদেশবাসী আততায়ী দলের দিকে রাইফেল উদ্যত রেখে, ভারতীয় হিন্দুসৈনিক তার ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য পালন করেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টকেও এই ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতা কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ মানবিক নীতি অনুসারে কাজ করতে হয়েছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবে অসহায় ও অবরুদ্ধ হিন্দু ও শিখকে যেমন ভারত গবর্ণমেণ্ট খাদ্য প্রেরণ করেছেন, তেমনি পাকিস্তানগামী মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে খাদ্যের যোগান দিয়েছেন। পাকিস্তান উভয় ক্ষেত্রেই তার চুক্তিগত দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিল।

এই অভিনব রক্ষা অভিযানে মারাঠা, রাজপুত ও মহর সৈনিক সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতীয় সৈনিক এই উদ্ধারকার্য আরম্ভ করে। এবং ১লা নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের দিকে তাকালেই বিস্মিত হতে হয়, ভারতীয় সৈনিক কত বড় ঐতিহাসিক কীর্তির নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে ফেলেছে :

> "One of the greatest mass migrations of history has been completed with a foot convoy 400,000 strong, of the uprooted non-Muslim population of the most fertile areas in West Punjab having

crossed over the Pakistan border into India"
(Indian Information. Nov. 1, 47.)

"ব্যাপকভাবে দেশবর্জনের যতগুলি বৃহৎ ঘটনা মানুষের ইতিহাসে ঘটেছে, তার মধ্যে একটি ঘটনা সম্পূর্ণ হলো। পশ্চিম পাঞ্জাবের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল থেকে উৎসাদিত ৪ লক্ষ অমুসলমান অধিবাসী পদব্রজে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতে পৌছেছে।"

যাত্রা সুরু লায়লপুর থেকে, শোকার্তের মিছিলের মত কয়েক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর এক পদব্রাজক দল দিনের পর দিন পথ হেঁটে ভারত ভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে। পেছনে পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও শ্রমকীর্তি বিজড়িত সবুজ গমের ক্ষেত ফেলে রেখে, আক্রমণে নিহত আত্মীয়ের মৃতদেহ ফেলে রেখে, এক হৃতসর্বস্ব মানুষের মিছিল চলেছে—কৃষক, কারিগর, জমিদার, ডাক্তার উকীল, সদাগর, ও মজুরের পরিবার দল। গ্রামের কুকুরও বর্বরের আক্রমণে কলুষিত গ্রাম ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে। লুণ্ঠনাবশিষ্ট সামান্য সাংসারিক উপকরণ সঙ্গে. মিছিল যেমন অগ্রসর হয়, আর এক দিক থেকে শাখানদীর স্রোতের মত আর একটি আশ্রয়প্রার্থীর দল এসে সম্মিলিত হয়। রাত্রি হ'লে বা ক্লান্ত হ'লে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে আশ্রয়প্রার্থীর দল কিছুক্ষণের জন্য থামে। লোকে রান্না করে, শিশুদের জন্য গরুর দুধ দোহানো হয়, কখনো বা এক আধটু গান, গ্রাম্য মোড়লের বক্তৃতায় সান্ত্বনা ও উৎসাহের বাণী—লক্ষ বিষণ্ণের এক রাত্রির সংসারে কিছুক্ষণের জন্য কিছুটা প্রাণের সাড়া জেগে ওঠে। আর রাইফেল, মর্টার ও ব্রেনগানবাহী মারাঠা রাজপুত এবং মহর সৈনিক নিষ্পলক চক্ষে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে রক্ষী রূপে।

এই রকম একটি দু'টি আশ্রয়প্রার্থীর মিছিল নয়, শত শত মিছিল

শত শত মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ভারতীয় সৈনিকের পাহারায় ভারতে এসেছে। এই রক্ষা অভিযানে পাকিস্তানের যে যে প্রধান অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈনিক আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধারকার্য সম্ভব করেছে, সেই স্থানগুলির নাম ভারতীয় ফৌজের অভিনব রণকীর্তির গৌরব প্রতীক রূপে পতাকায় চিহ্নিত না হ'লেও এই নামগুলি বস্তুতঃ রণকীর্তি রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য :

লাহোর, শেখপুরা, গুজরাঁওয়ালা, সিয়ালকোট, ক্যাম্বেলপুর, গুজরাট, ঝেলম, সরগোধা, মিয়াঁওয়ালী, মুলতান, মণ্টগোমারী, লায়লপুর, ঝঙ্গ, ওয়াহ্, মিঞাচন্নু, মুজফরগড়, ডেরাগাজি খাঁ, পেশোয়ার।

স্বাধীন ভারতের ফৌজকে স্বাধীনতার প্রায় প্রথম মুহূর্তেই বহু অভিনব ও দুরূহ দায়িত্ব * গ্রহণ ক'রে এই কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং ভারতীয় ফৌজ কৃতিত্বের সঙ্গে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সামরিক অপসারক সংঘের (M. E. O.) দায়িত্বের তালিকাটির প্রতি লক্ষ্য করলেই দায়িত্বের দুরূহতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। (১) পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে যাতায়াতের ব্যাপারে আশ্রয়প্রার্থীবাহী রক্ষীসৈন্য সমন্বিত ট্রেন চালান। (২) পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীর কেন্দ্রগুলি পাহারা দিয়ে রক্ষা করা (৩) মোটরযান যোগে আশ্রয়প্রার্থী

* "..........to run refugee trains from East to West Punjab and back under escort, to have non-Muslim refugee camps in West Punjab protected by Indian troops, to organise and protect convoys by road transport, to provide mobile escort for the large marching columns, to carry food to refugee camps in West Punjab suffering from food shortage, and to look after refugees stranded in many parts of that province—Indian Information Oct. 1. 1947.

অপসারণের ব্যবস্থা করা ও রক্ষা করা। (৪) বৃহৎ পদব্রাজক আশ্রয়প্রার্থীদলগুলির সঙ্গে রক্ষীবাহিনী রূপে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা। (৫) পশ্চিম পাঞ্জাবের খাদ্যাভাবগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীর শিবির-গুলিতে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া। (৬) পশ্চিম পাঞ্জাবের বহু স্থানে আটক আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

সাহায্য ও পুনর্বসতি বিষয়ের মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী ২৯শে নভেম্বর তারিখে ভারত ডোমিনিয়নের আইনসভায় এই তথ্য প্রকাশ করেন: "সামরিক অপসারক সংঘ (M. E. O.) ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে কাজ আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ ৮৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতে নিয়ে এসেছে।......অনুমান হয় আরও ৮লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে এখনো নিয়ে আসার কাজ বাকী আছে।"

আততায়ী দলের আক্রমণ ছাড়া প্রকৃতিও হঠাৎ বিরূপ হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতমুখী চলমান আশ্রয়প্রার্থী জনতার অবস্থা দুর্বিসহ করে তোলে। সেপ্টেম্বরের শেষে শতদ্রু ও বিপাশা নদের বন্যায় পশ্চিম পাঞ্জাবের পথ স্থানে স্থানে ভেঙে প্লাবিত হয়ে যায়। ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার ফৌজের (R. I. E) কয়েকটি দল এই বন্যাপ্লাবিত বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত পথকে সংস্কার ক'রে তোলে। বেঙ্গল স্যাপার ও মাইনারের ১নং ও ৪নং কোম্পানী পাঁচ দিনের মধ্যে 'বেলি' ব্রীজ (Bailey Bridges) তৈরী ক'রে গ্রাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোডের বিচ্ছিন্নতা পূর্ণ ক'রে তোলে, তা'ছাড়া মাদ্রাজ স্যাপারের একটি দল (১৩২নং অ্যাসল্ট ফিল্ড কোম্পানী) বিধ্বস্ত সড়কগুলিকে ছয়-দিনের মধ্যেই চলার যোগ্য ক'রে তোলেন। বেইন নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজটী ভেঙে গিয়েছিল। মাদ্রাজ স্যাপারের একটি (১০১নং রেলওয়ে কনস্টাকশন কোম্পানী) এঞ্জিনিয়ার দল রাতারাতি ঐ ব্রিজ মেরামত

করে ফেলেন। সেই সময় লাহোরে অবস্থিত ভারতীয় নৌবাহিনীর একদল সৈনিক উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার থিমাইয়া পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীর দলকে নিরাপদে পশ্চিম পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

সামরিক অপসারক সংঘের কাজ শেষ হ'তে না হ'তে ভারতীয় ফৌজের কাছে আকস্মিকভাবে আর একটি কর্তব্যের আহ্বান আসে। হাজার হাজার সশস্ত্র আফ্রিদি, পাকিস্থান ফৌজের সৈনিক ও অফিসার, মুসলিম ন্যাশানল গার্ড সম্মিলিতভাবে কাশ্মীরের ওপর ধ্বংস, হত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণের নারকীয় অভিযান চালিয়ে রাজধানী শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। ভারতীয় সৈনিককেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হতে হয় এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে সাহায্যের আহ্বান আসবার ২৪ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় সৈনিকের একটি দলকে দেখা যায়—বিমান থেকে নেমেই এক মুহূর্তের বিশ্রাম না ক'রে বড়ামুল্লার সড়কের দিকে দুর্জয় সংকল্পের মূর্তি ধ'রে ধাওয়া ক'রে চলেছে।

সামরিক অপসারক সংঘের কাজ তবু পশ্চিম পাঞ্জাবে চলতে থাকে। আশ্রয়প্রার্থী অপসারণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু আর একটি নতুন কর্তব্য গ্রহণ করে ভারতীয় সৈনিক পশ্চিম পাঞ্জাবে কাজ করতে থাকে। এই কাজ হলো—অপহৃতা নারী উদ্ধারের কাজ। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে তারযোগে জানালেন: "আপনি সম্প্রতি এই বিবৃতি দিয়েছেন যে, পাকিস্তানে অবস্থিত তথাকথিত হানাদারের ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, তবে সেটা সম্পূর্ণ সঙ্গত কাজই হবে।

আপনার এই উক্তির পর বর্তমানে পাকিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় ফৌজের দলগুলি ও অফিসারদের আর থাকতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং ৪৮ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালকোট, গুজেরাট, ঝেলম, রাওয়ালপিণ্ডি ও ক্যাম্বেলপুর থেকে ভারতীয় ফৌজের দলগুলি ও অফিসারদের সরিয়ে নেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।"

পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থী অপসারণ, এবং নারী উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় সৈনিকের এক বিরাট কর্তব্যের অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত হয়।

কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ

"আহ্বান আসবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সৈনিকেরা বিমানযোগে শ্রীনগরে গিয়ে অবতরণ করে এবং তারপর তারা যে কাজ করেছে এবং এখনো ক'রে যাচ্ছে, সেটা আমাদের শত্রু ও মিত্র উভয়কেই সমানভাবে বিস্মিত করেছে—" *

১লা ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং-এর বক্তৃতা সারা ভারতের বায়ুতরঙ্গে ধ্বনিত ও প্রচারিত হয়ে ভারতবাসীকে জানিয়ে দিল, বর্বর শত্রুযূথের আক্রমণ থেকে শ্রীনগর রক্ষা পেয়েছে। শুধু শ্রীনগর নয়, কাপুরুষ শত্রুযূথ তখন শ্রীনগর উপত্যকা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে পিছু হটে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে। কিন্তু তার আগে?

তার আগে দু'টি মাস হলো স্বাধীন ভারতের ফৌজের জীবনে প্রথম রণাভিযান, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ভারতীয় ফৌজের রাইফেলে প্রথম আগুনের খেলা। দেশরক্ষার সংগ্রামে প্রথম অগ্নিদীক্ষা। ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে দেশের শত্রু-ধ্বংসের জন্য প্রথম শপথ। একা একশত শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম ক'রে এক একটি আত্মদানের অতুলনীয় ঘটনা। তারপর শতে শতে ও হাজারে হাজারে শত্রু নিপাত ক'রে সুন্দর কাশ্মীরকে

* "In spite of the short notice, our troops landed in Srinagar within 24 hours and what they did and are still doing is the marvel of friend and foe alike"—Sardar Baldev Singh.

শান্তির উপহার প্রদান। এই হলো ভারতীয় ফৌজের জম্মু-কাশ্মীর রণাঙ্গনের প্রথম দু'মাসের কীর্তি।

২৪শে অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে পাকিস্থান অঞ্চল থেকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত দু'হাজারের একটা দল এবোটাবাদ রোড ধ'রে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দু'হাজার বর্বর প্রকৃতির হানাদার—হাজারার পাঠান, সোয়াতি পাঠান, দির অঞ্চলের পাঠান ও মুসলমান, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড, কাশ্মীর রাজফৌজের বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সৈন্যদল, পাকিস্তান সরকারী ফৌজের সিপাহী ও অফিসার এবং তাদের নায়করূপে মিঃ জিন্নার ভূতপূর্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরসেদ আনোয়ার—এই হানাদারদল প্রথম মজফরাবাদ ধ্বংস করে। তারপর ঝেলম ভ্যালি রোড ধ'রে অগ্রসর হতে থাকে এবং উরি ধ্বংস করে। কাশ্মীর রাজফৌজের ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং ক্ষুদ্র সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এইখানে দু'দিন ধরে হানাদারদের ঠেকিয়ে রাখেন। ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং এক পা পেছু না হ'টে লড়াই করতে করতেই নিহত হন। ২১শে অক্টোবর হানাদারেরা বড়ামুল্লা সহর ধ্বংস করে, এখান থেকেই প্রকৃত কাশ্মীর উপত্যকার আরম্ভ এবং শ্রীনগরের দূরত্ব মাত্র ৩৫ মাইল, একেবারে খোলাপথ। ২৬শে অক্টোবরের রাত্রিতেই নেকড়ের দলের মত হানাদারেরা আরও অগ্রসর হয়ে শ্রীনগরের আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে; শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৭ মাইল দূর পট্টনে এসে সমবেত হয়। মাহুরাতে অবস্থিত বৈদ্যুতিক পাওয়ার-হাউসকে হানাদাররা চূর্ণ ক'রে দিয়েছিল। তাই শ্রীনগর সহর অন্ধকারে ও আতঙ্কে ডুবে যায়; হানাদারের দলও হিংস্র আহ্লাদের প্রেরণায় উল্লসিত হয়ে ২৭শে অক্টোবরের প্রাতঃকালে শ্রীনগরের বিমানঘাঁটি দখলের জন্য প্রস্তুত হয়।

ঠিক এই ২৭শে অক্টোবরের প্রাতঃকালেই শ্রীনগরের কুয়াশাচ্ছন্ন

আকাশে দৃপ্ত গুঞ্জন শোনা যায়। ভারতীয় সৈন্য বহন ক'রে ভারত থেকে প্রথম বিমানবহর তীব্র আগ্রহে আকাশপথে ছুটে এসে শ্রীনগরের বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে। আরম্ভ হয় কাশ্মীররক্ষার যুদ্ধ।

অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য নিয়ে হানাদারদলের প্রধান বাহিনীকে বড়ামুল্লা রোডের ওপর প্রথম আক্রমণ করেন কর্ণেল ডি রণজিৎ রায়। অসীম শৌর্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং বহু হানাদার নিপাত ক'রে তিনি নিহত হন।

কর্ণেল রায়ের পরে, তাঁর স্থানে এসে দাঁড়ালেন কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার সেন, ব্রিগেড কম্যাণ্ডার রূপে। শ্রীনগরের ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সেনের ব্রিগেড থেকে ১নং কুমায়ুন রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী নিয়ে মেজর শর্ম্মা প্রবল যুদ্ধ করেন এবং নিহত হন। ৮ই নভেম্বর তারিখে সেনের ব্রিগেড প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে বড়ামুল্লা পুনরধিকার ক'রে ফেলে। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে এবং হানাদার দলকে মেরে মেরে খেদিয়ে পেছু হটিয়ে দিয়ে ১৫ই নভেম্বর তারিখে সেনের ব্রিগেড উরি অধিকার করে। ভারতীয় বিমানবাহিনী হানাদারদের শিবির, অস্ত্রসমাবেশ ও চলমান দলগুলিকে পদে পদে বিপর্যস্ত করে। কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চল থেকে হানাদার অদৃশ্য হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে এসে ঘাঁটি করতে থাকে।

ভারত থেকে ফৌজ আসতেই থাকে। সাঁজোয়া দল, ট্যাঙ্ক দল, পদাতিক। ভারতীয় বিমানবাহিনীর জঙ্গী, বোমারু ও পর্যবেক্ষী এক একটি স্কোয়াড্রান। ভারতীয় স্যাপার দল ও অন্যান্য এঞ্জিনিয়ার দলগুলি। নতুন সড়ক, নতুন টেলিগ্রাফের সংযোগ, নতুন পুল, রাতারাতি তৈরী হতে থাকে। এঞ্জিনিয়ার দলের বুলডজার তুষাররুদ্ধ বানিহাল উপত্যকাকে পরিষ্কার ক'রে সুগম

পথ রচনা করে। ভারতীয় ফৌজের রণদক্ষ ও জবরদস্ত কম্যাণ্ডারদের উদ্যোগে কাশ্মীর রণাঙ্গন ভারতীয় ফৌজের পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। মারহাট্টা, মাদ্রাজী, শিখ, রাজপুত, কুমায়ুনী, মহর, গাড়োয়ালী, ডোগ্‌রা, মুসলমান, জাঠ, ও আহির—সকল সমাজের সৈনিক। প্রধান পরিচালক মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং। এয়ার কমোডোর মেহের সিং ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন মিঃ ইঞ্জিনিয়ার বিমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এয়ার ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখার্জী বিমানবাহিনীর কাজ পরিদর্শন করেন। সেনের ব্রিগেড কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষা করেন। ব্রিগেডিয়ার ওসমান জম্মু রণাঙ্গনে হানাদার দলের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে অগ্রসর হতে থাকেন। ব্রিগেডিয়ার প্রীতম সিং পুঞ্চ রণাঙ্গনের ভার গ্রহণ করেন। কর্ণেল সাতারাওয়ালা আখনুর এলাকায় হানাদার ধ্বংস ক'রতে থাকেন।

জম্মু রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজ একে একে জনপদগুলি পুনরধিকার করতে থাকে—গুলমার্গ, পুঞ্চ, ঝাঙ্গের, নওশেরা ও রজৌরি। এর মধ্যে বিখ্যাত হ'লো, নওশেরার যুদ্ধ। ৬ই জানুয়ারী ব্রিগেডিয়ার ওসমান ৮ঘণ্টার সংঘর্ষে ২ হাজার হানাদারের মৃত্যু ঘটিয়ে 'হানাদারের ত্রাস' হয়ে ওঠেন।

কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকিস্থানে ঘাঁটি ক'রে মোটামুটি ৭৫ হাজার সশস্ত্র হানাদার সমবেত হয় এবং অতিরিক্ত ১৩ হাজার কাশ্মীর আক্রমণে নিযুক্ত থাকে। হানাদারদের অস্ত্র-শস্ত্র হলো—রাইফেল, লাইট্‌ মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, স্টেনগান, মর্টার, মাউণ্টেন আর্টিলারী (৩·৭ ইঞ্চি হাউইটজার), ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী রাইফেল, বিমান-ধ্বংসী কামান, মার্ক 'ভি' মাইন, গ্রেনেড, অগ্নিশিখা নিক্ষেপক যন্ত্র (Flame Thrower) ও বহুসংখ্যক মোটর যান।

২৭শে অক্টোবর থেকে আরম্ভ ক'রে জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ

পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় কাশ্মীর ও জম্মু রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজের ৩৩৯ জন নিহত ও ৫০৩ জন আহত হয়েছে। হানাদারদের মৃতদেহ গণনা ক'রে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় যে ঐ তারিখের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার হানাদার নিহত ও আহত হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর যুদ্ধ এখনো থামেনি। ভারতীয় ফৌজ এরই মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান অঞ্চল থেকে হানাদারদের হটিয়ে দিয়ে পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে এসে শিবির রচনা ক'রে রয়েছে। পাকিস্তানের সীমার কাছাকাছি কিছু এলাকায় হানাদারদের ঘাঁটি এখনো আছে। মুজফরাবাদ সহর হানাদারদের হাতেই রয়েছে। পাকিস্তানের সাহায্য প্রাপ্ত হানাদার ফৌজে আজকাল সিন্ধু থেকে 'হুর' আমদানি করাও হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজ এরই মধ্যে যে যে রণক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ক'রে রণকীর্তির তালিকা বৃদ্ধি করেছে তার মধ্যে প্রধান রণক্ষেত্রগুলি হলো:

উরি, বড়ামুল্লা, পট্টন, পুঞ্চ, ঝাঙ্গের, নওশেরা, আখনুর, রাজৌরি, সায়েদাবাদ, সামানি, তিঠোয়াল, কেরান, ও পীর কান্‌ঠি।

কাশ্মীর রাজফৌজ

পাকিস্থান অঞ্চল থেকে কাশ্মীর আক্রমণের চক্রান্ত, উদ্যোগ এবং সৈন্য সমাবেশ যখন চলছে, তখন কাশ্মীর রাজফৌজের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠে। প্রথম আক্রমণের দিনেই কাশ্মীর রাজ ফৌজের মুসলিম সৈনিকেরা হানাদারদের দলে যুক্ত হয় এবং কাশ্মীর আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে।

কাশ্মীর রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকেরা বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং বাধা দেয়। ভারতীয় ফৌজ পৌঁছবার আগে পর্যন্ত কাশ্মীর রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকেরা দেশরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু হানাদারদের আক্রমণ খুবই অতর্কিতে আরম্ভ হয়। একস্থানে নয়, কাশ্মীর ও জম্মুর বহুস্থানে, সীমান্ত ভেদ ক'রে বিভিন্ন দলে নানা-দিক থেকে হানাদারের দল আক্রমণ ক'রে অগ্রসর হতে থাকে। কাশ্মীর রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং হানাদারদের বাধা দিতে থাকে। কিন্তু এর ফল হলো—কাশ্মীর রাজফৌজ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দল রূপে আটক হয়ে পড়ে। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য আমদানির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ক্ষুদ্রসংখ্যক বিভিন্ন দলের কাশ্মীর রাজফৌজ আক্রমণ চালাবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বাধ্য হয়ে, শুধু নিজের শিবির রক্ষার যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজ করা কাশ্মীর ফৌজের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। *

শুধু একটি ক্ষেত্রে কাশ্মীর রাজফৌজ চরম শৌর্যের দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছে। ২৪শে এবং ২৫শে অক্টোবর, দু'টি দিন কাশ্মীর ফৌজের এক বীর সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে উরিতে হাজার হানাদারের প্রধান দলকে বাধা দেন। এই বাধা দেওয়ার ফলেই বস্তুত হানাদারের দলের পক্ষে শ্রীনগর পৌঁছতে ২ দিন দেরী হয়ে যায়। বস্তুতঃ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং-এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ফলেই শ্রীনগর হানাদারদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য থেকে

* "The Kashmir State Army which had to meet these raids at numerous points soon found itself broken into small fragments and gradually ceased to be a fighting force"—Pandit Nehru's Statement, Constituent Assembly, 25th Nov. 1947.

বেঁচে যায়। রাজেন্দ্রসিংয়ের জন্য হানাদারদল দু'দিন অগ্রসর হ'তে পারেনি, এরই মধ্যে ভারতীয় ফৌজের প্রথম দল শ্রীনগর পৌঁছে যায়।

জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজের ওপর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শত্রু ধ্বংসের কাজ করতে হচ্ছে, তেমনি শত্রু-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে তত্ত্বাবধান ক'রে নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। একই সঙ্গে যোদ্ধা এবং সেবকের কাজ, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এই এক নতুন ঘটনা। এবং এই ঘটনায় ভারতীয় সৈনিক প্রমাণ করেছে যে, সে যেমন সাংঘাতিক যোদ্ধা তেমনি কারুণিক সেবক।

কাশ্মীর যুদ্ধ কবে শেষ হবে কে জানে! কিন্তু এর শেষ দেখবার জন্যই ভারতীয় ফৌজ এখন বহুধা এবং বহুমুখী অভিযান চালিয়ে শত্রুকবলিত এক একটি জনপদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে চলেছে। মুজাফরাবাদ, ডোমেল, কোহালা, বাগ, কোটলি, মীরপুর ও ভীমবার—পাকিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন কাশ্মীরের এই জনপদগুলি এখনো হানাদারদের দখলে রয়েছে।

উত্তর কাশ্মীরের অনেকখানি অংশ পাকিস্তানী ও উপজাতীয় হানাদারদের অধিকারে এখনও রয়েছে। গিলগিট, স্কার্দু, লদ্দাক প্রভৃতি হিমালয় সংলগ্ন উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কাশ্মীর রাজ-ফৌজের অল্পসংখ্যক সৈন্য শ্রীনগরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বস্তুত নিজ নিজ শিবিরে থেকে মাত্র আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে সৈন্য সমরোপকরণ এবং খাদ্যাদি উপকরণ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য ভারতীয় বিমানবহর নিযুক্ত হয়। ১৩ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাবৃত লে মালভূমিতে মেরুদেশতুল্য হিমাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বিমানবাহিত সৈন্য ও উপকরণ অবতরণ করিয়ে

এয়ার কমোডোর মেহের সিং বিশেষ বৈমানিক প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। গিলগিট, স্কার্দু ও লদ্দাক অঞ্চলে শত্রু-শিবিরের ওপর ভারতীয় বোমারু বিমানবহর বোমাবর্ষণের পালা আরম্ভ করেছে।

মেডাল বা পদক প্রথার ইতিহাস

সৈনিকের কৃতিত্ব ও শৌর্য্যের জন্য পদক (medal) দেবার প্রথা বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রের ফৌজে প্রচলিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজে সকল পদের সৈনিকদের পদক দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। কোন যুদ্ধ বা অভিযানের সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈনিকদের পদক উপহার দিতেন।

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় ফৌজের সৈনিকদের জন্য যেসব পদক দেবার প্রথা ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রবর্তন করা হয়েছিল, তারও একটা ইতিহাস আছে।

১। আর্মি অব ইণ্ডিয়া মেডাল (Army of India medal)—১৮৫১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণী এই পদক প্রবর্তন করেন। ১৭৯৯-১৮২৬ সালের মধ্যে ঘটিত যুদ্ধগুলিতে যেসব সৈনিক যোগ দিয়েছিল, তাদেরই এই পদক দেওয়া হয়।

২। ইণ্ডিয়া জেনারাল সার্ভিস মেডাল—(India General Service medal) ১৮৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত তেইশটী যুদ্ধ ও অভিযানে যেসব সৈনিক যোগ দিয়েছিল, তাদের এই পদক দেওয়া হয়।

৩। গ্রেট মিউটিনি মেডাল (Great Mutiny medal)—সিপাহী অভ্যুত্থান দমনের যুদ্ধে যেসব সৈনিক যোগ দিয়েছিল, তাদের এই পদক দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে পদক দেবার এই শেষ উদাহরণ।

এরপর খাস ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হবার পর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পদক দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। যথা:—১৮৯৫, ১৯০৩ ১৯০৮ ও ১৯৩৬ সালের ইণ্ডিয়ান জেনারেল সার্ভিস মেডাল।

উল্লিখিত পদকগুলি হলো ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ এবং অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য উপহার। ভারতের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বাইরে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ ও অভিযানে যোগদানের জন্য বিভিন্ন কালে সৈনিকদের বিভিন্ন পদক দেবার ব্যবস্থা হয়। যথা:—১৮৪২ সালে চীন পদক ও জেলালাবাদ পদক। তা ছাড়া, গজনী কাবুল কান্দাহার মিয়াণী ও হায়দরাবাদ পদক। ১৮৪৩ সালের গোয়ালিয়ার পদক। ১৮৪৫ সালের জেলালাবাদ পদক। ১৮৪৫-৪৬ সালের সতলজ পদক (শিখ যুদ্ধ কালে), ১৮৪৮-৪৯ সালের পাঞ্জাব পদক। ১৮৫৭-৬০ সালের চীন পদক। ১৮৬৪ সালের আবিসিনিয়া পদক। ১৮৭৮-৮০ সালের আফগানিস্থান পদক। ১৯০৩-৪ সালের তিব্বত পদক।

ভারতবর্ষ থেকে একেবারে বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় সৈনিককে ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে পদক দেওয়া হয়। যথা: মিশর (১৮৮২-৮৫), পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা (১৮৯৭-৯৮), চীন (১৯০০), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮৯৯-১৯০২), পূর্ব আফ্রিকা ও সোমালিল্যাণ্ড (১৯০২-০৪), ১৯১৪ সালের তারকা (প্রথম মহাযুদ্ধ), ১৯১৪-১৫ সালের তারকা, ব্রিটিশ ওয়ার মেডাল (British War medal), ১৯১৪-১৮ সালের বিজয় পদক (Victory medal), ১৯২৩ সালের জেনারেল সার্ভিস মেডাল।

যুদ্ধে শৌর্যের জন্য ভারতীয় ফৌজের সৈনিককে নিম্নোক্ত পদক দেবার ব্যবস্থা ছিল:

১। ভিক্টোরিয়া ক্রস (Victoria Cross)। ১৯১২ সালে দিল্লী

দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণাতে ভারতীয় সৈনিককে ভিক্টোরিয়া ক্রস পদক উপহার দেবার নীতি ঘোষিত হয়।

২। মিলিটারী ক্রস (Military Cross)—১৯১৪ সালে প্রবর্তিত হয়।

এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ১৯০৭ সালে একটি পদক(Indian Distinguished Service medal) এবং সুদীর্ঘ কালের বিশ্বস্ত সার্ভিসের জন্য অর্ডার অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া (Order of British India) নামে পদক দেবার ব্যবস্থা হয়। *

স্বাধীন ভারতে সৈনিককে পদক দেবার পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে সন্দেহ নেই। ঠিক ব্রিটিশ আমলের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পদক দেবার প্রথা নিশ্চয় আর থাকতে পারে না। ৩১শে আগষ্ট ১৯৪৮ তারিখে ভারতীয় পার্লামেণ্টে দেশরক্ষা সচিব বলদেব সিং জ্ঞাপন করেন যে কাশ্মীর যুদ্ধের কৃতিত্ব ও শৌর্য্যের জন্য ভারতীয় সৈনিককে নতুন ধরণের পদক দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পদকের নাম হলো—পরম বীর চক্র, মহাবীর চক্র এবং বীর চক্র।

১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) তারিখের ভারত গেজেটে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইংলণ্ডাধিপতি ২১শে জুলাই (১৯৪৮) তারিখের এক রাজকীয় ঘোষণায় (Royal Warrant) ভারতীয় সৈনিকের জন্য 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বা ভারতীয় স্বাধীনতা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই পদকে 'অশোক চক্র' উৎকীর্ণ থাকবে।

---

* যুদ্ধক্ষেত্রে 'অত্যন্ত' কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য ১৮৬৬ সালে যে পদক দেবার পদ্ধতি গৃহীত হয়, তার নাম হলো—The Distinguished Service Order.

১৮৮৮ সালে 'যোগ্য প্রতিভার' প্রমাণপূর্ণ কাজের জন্য যে পদক প্রবর্তিত হয়, তার নাম হলো—Indian Meritorious Service medal.

স্বাধীন ভারতের ফৌজ

ভারত স্বাধীন এবং ভারতীয় ফৌজ এখন স্বাধীন ভারতের ফৌজ। এই ফৌজই আমাদের জাতীয় ফৌজ, হুকুম-ই-সাহেবান্ আদর্শ এখন অতীতের কিম্বদন্তীর মত অলীক হয়ে গেছে।

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের একটা ফৌজী নীতি থাকে। এই ফৌজী নীতি তার সামরিক নীতির উপর নির্ভর করে। সামরিক নীতি আবার পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সংযুক্ত। পররাষ্ট্র নীতি আবার রূপ গ্রহণ করে বহুবিধ অন্যান্য নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে, জাতির অর্থনীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি। সুতরাং এক কথায় সরল ক'রে বলা যায়, কোন রাষ্ট্র বা জাতি তার সৈন্য বাহিনীকে জাতীয় আকাঙ্খা অনুসারেই গড়ে তোলে। যে জাতি বা রাষ্ট্র পররাজ্যের ওপর দখল বিস্তার করতে চায়, তার সব নীতিই আক্রমণমূলক হতে বাধ্য। যে জাতি সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রেখে চলতে চায়, তার জাতীয় নীতি প্রধানতঃ আদান প্রদানের নীতি রূপেই পরিণতি লাভ করে। যে রাষ্ট্র একা একা বড় হয়ে উঠতে চায়, সে রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিও তেমনই গোপন অহঙ্কারে পরিস্ফীত হয়ে ওঠে, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলাই তার নীতি।

৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে ভারতের গণপরিষদে বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন এবং সূত্রের কিছু ব্যাখ্যাও করেছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রগুলি পণ্ডিত নেহরুর ঘোষণা থেকে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি যদি শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দল বেঁধে পক্ষাপক্ষ রচনা করে, তবে ভারতবর্ষ কোন পক্ষেই থাকবেনা। ('to keep out of group alignments of the world powers').

(২) কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষকে সব অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকতেই হবে, কিম্বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে হবে। ('that has nothing to do with neutrality or passivity').

(৩) যদি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমরা নিশ্চয় কোন যুদ্ধে যোগ দেব না। আর যদি একান্তই যুদ্ধে যোগ দিতে হয়, তবে সেই পক্ষের সঙ্গে থাকবো যে পক্ষে থাকলে আমাদের স্বার্থ আছে। ('we are not going to join war if we can help it and we are going to join the side which is to our interest when the choice comes to it').

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বদেশের শান্তি ও স্বাধীনতা দাবী করে। কিন্তু মাত্র এই ধরনের কথার দ্বারা পররাষ্ট্রনীতির কোন স্পষ্ট স্বরূপ বোঝা যায়না। এরকম কথা তো সবাই বলে থাকে এবং কথাগুলি একটা সাধারণ সদিচ্ছার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ স্পষ্টতা আছে এবং তার দ্বারাই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ প্রকৃতিটি বুঝে নিতে পারা যায়। পণ্ডিত নেহরুই ব্যাখ্যা ক'রে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

(৪) ভারতবর্ষ বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশগুলির স্বাধীনতা এবং এই সব দেশের ওপর থেকে সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসান কামনা করে। ('we stand for the freedom of Asian countries and for the elimination of imperialistic control over them').

বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশসমূহের জনসাধারণের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষ কামনা করে—ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গতি ও প্রকৃতি এই উক্তির মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতীয় ফৌজের উদ্দেশ্যেও জাতীয় নীতি ঘোষণা করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু ঠিক এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।

(৫) আমরা যেমন নিজের দেশের স্বাধীনতা কামনা করেছিলাম, তেমনি অন্য দেশের স্বাধীনতাও আমরা কামনা করি, বিশেষ করে এশিয়ার দেশসমূহের স্বাধীনতা। ('As we have wanted freedom for our country, so we desire freedom for other countries, especially those in Asia').

ভারতবর্ষের জাতীয় নীতি মূলতঃ যুদ্ধবিরোধী এবং পররাষ্ট্র বনাম পররাষ্ট্রের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই মূলতঃ ভারতের পররাষ্ট্র নীতি। কিন্তু সেই সঙ্গে এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির প্রতি একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্বও আছে। এই পক্ষপাতিত্বও মূলতঃ নৈতিক সমর্থন, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করার আগ্রহ ভারতবর্ষ পোষণ করে না।

ফ্রান্স এবং ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু ফ্রান্স যখন ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে অন্যায় করে এবং ওলন্দাজ যখন ইন্দোনেশিয়ার জনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তখন ভারতবর্ষ ফ্রান্স ও ওলন্দাজের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু তাই বলে সৈন্য পাঠিয়ে ইন্দোচীনের ভিয়েৎনামকে বা ইন্দোনেশিয়ার জনতন্ত্রকে সাহায্য করা ভারতের নীতি নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ বা সমর্থন করার পদ্ধতি ভারতবর্ষের জাতীয় নীতিতে স্থান লাভ করেনি।

যে দেশের পররাষ্ট্রনীতি এই রকম সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্ব

ও সহযোগিতা এবং যুদ্ধনিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা গঠিত সে দেশের সামরিক নীতি ও ফৌজী নীতি কি হতে পারে?

এ ক্ষেত্রে যা হতে পারে এবং যা হওয়া উচিত ভারতবর্ষ সেই নীতিই গ্রহণ করেছে। (১) ভারতের সামরিক নীতি হলো সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক নীতি। (২) আর ফৌজী নীতি হলো দেশপ্রেমিক বাহিনী গঠন করার নীতি।

এ বিষয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতের দেশরক্ষা সচিব উভয়েই নীতি ঘোষণা করেছেন। পয়লা ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লী থেকে প্রচারিত বেতার বক্তৃতায় ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"দেশের জনসাধারণ ও ফৌজের মধ্যে কোন অপরিচয়জনিত ব্যবধান থাকা উচিত নয়। উভয়েই এক, কারণ দেশের জনসাধারণের ভেতর থেকেই ফৌজের জন্য সৈনিক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দেশের ফৌজ একটা স্বতন্ত্র সমাজ, এই পুরাতন ধারণা এখন আর থাকতে পারে না। সুতরাং দেশের জনসাধারণ এবং ফৌজ উভয়ই পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠবে এটাই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়। (১)

পণ্ডিত নেহরুর কথার মধ্যে ভারতের ফৌজী নীতির একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় ফৌজ নিছক 'রাষ্ট্রীয় ফৌজ' রূপে নয়, ভারতের জনসাধারণের ফৌজ (People's

(1) "There should be no distance between the people and the armed services ; they are all one, beacuse recruitment to the armed forces is made from the masses. The old idea that the army was a separate entity does not hold good. It, therefore, becomes essential that we should understand each other"

Army) রূপে নতুন সংগঠন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করবে, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যের মধ্যে তারই আভাষ পাওয়া যায়।

"দেশকে ও দেশবাসীকে সেবা করাই আপনাদের কর্তব্য। আমরা অন্য দেশকে আক্রমণ করে সে দেশের মানুষকে দমন করে রাখতে চাই না।"

পণ্ডিত নেহরু তাঁর মন্তব্যে আরও একটি নীতি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় ফৌজ দেশপ্রেমিক বাহিনীরূপেই তার দায়িত্ব পালন করবে। একটা রাজ্যজয়ী ফৌজ হয়ে পরদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার তিলমাত্র আগ্রহ স্বাধীনভারতের মনে নেই, সেটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতিও নয়। পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যে ভারতের সামরিক নীতিরও মূল কথাটি ধ্বনিত হয়েছে।

১লা ডিসেম্বর (১৯৪৭) বেতার বক্তৃতায় দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং আরও স্পষ্ট ক'রে এই নীতি ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় ফৌজ সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষার ফৌজ।

"আপনারা যে তরবারি বহন করেছেন সে তরবারি শুধু মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এবং ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য নিষ্কোষিত হবে।"

"The sword you carry will be unsheathed only for the protection of your motherland and vindication of justice."

দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতের ফৌজ একটি নীতিতে দীক্ষিত হয়েছে। ভাড়াটিয়া বাহিনীর ঐতিহ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সেটা নিঃশেষ ক'রে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের ফৌজ সহস্র বাধা ও অসুবিধার মধ্যেও অতি দ্রুত একেবারে নতুন রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আদর্শ জাতীয় ফৌজ হয়ে গড়ে উঠেছে। শুধু পুনর্গঠন ও পরিবর্তন নয়, ভারতীয় ফৌজ আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগী হয়েছে।

১লা জানুয়ারী (১৯৪৮) তারিখে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার রব লকহার্ট বিদায় গ্রহণ করেন। জেনারেল বুশার (General Bucher) ১লা জানুয়ারী থেকে ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) থেকে ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৮)—সাড়ে আট মাসের মধ্যে বিরাট ভারতীয় ফৌজ বৃটিশ অফিসার বর্জন ক'রে কত দ্রুত যথার্থ জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, ভারতের দেশরক্ষা সচিব ভারতীয় পার্লামেন্টে সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন।"

"বর্তমান ভারতের প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টীয় কম্যাণ্ডে ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত রয়েছেন। মাত্র তিনটি রেজিমেন্টীয় ট্রেনিং কেন্দ্রে বৃটিশ অফিসারেরা মোট তিনশত পরিচালকরূপে রয়েছেন। ভারতের তিনটি আর্মি কম্যাণ্ড, প্রত্যেকটি ডিভিসন কম্যাণ্ড, সমস্ত এরিয়া কম্যাণ্ড, সাব-এরিয়া কম্যাণ্ড ও ব্রিগেডের কম্যাণ্ডে প্রায় সবই ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত হয়ে আছে। যা একটু বাকী আছে, তাও এই মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। নৌ ও বিমান বাহিনীতে মোট ৮২৯ অফিসারের মধ্যে ১৩০ জন বৃটিশ অফিসার আছেন।" *

১৯৪৮ সালের প্রথমভাগে ভারতীয় ফৌজের জনবল কি পরিমাণ দাঁড়ায়, তার একটা আনুসঙ্গিক হিসাব বাজেট বিবৃতির মধ্যে উল্লেখ করা হয়:

---

* The position today is that all battalion and regimental commands are held by Indians except the command of three regimental training centres which is held by British officers. The three Army commands, Area commands, Sub-area commands and Brigade commands are or will before the end of this month be held by Indian officers. In the Navy and in the Air Force the plan was that out of a total cadre of 620 commissioned and 209 warrant officers, 60 commissioned and 70 warrant officers only would be British. The programme has been adhered to."—Defence Minister's statement, Indian Parliament, 8th April 1948.

ভারতীয় স্থলবাহিনী ২৬০,০০০ সৈনিক ও অফিসার। ভারতীয় নৌবাহিনী—১১৮৫০ সৈন্য ও অফিসার, ৩৪টি জাহাজ। ভারতীয় বিমানবাহিনী—৮৭০০ সৈন্য ও অফিসার। ভারতীয় অস্ত্র ফ্যাক্টরী—১৬টি ফ্যাক্টরী, ৪০ হাজার কারিগর।

ভারতের তিনটি আর্মি কম্যাণ্ড ও তার অন্তর্ভুক্ত এরিয়া ও সাব-এরিয়া নূতন ক'রে গঠন করা হয়েছে:

দক্ষিণ কম্যাণ্ড (Southern Command) : বোম্বাই এরিয়া, বোম্বাই সাব-এরিয়া, পুণা সাব-এরিয়া, ডেক্যান এরিয়া, জব্বলপুর সাব-এরিয়া, সেকেন্দ্রাবাদ সাব-এরিয়া, মাদ্রাজ এরিয়া, বাঙ্গালোর সাব-এরিয়া, কৈম্বাটুর সাব-এরিয়া।

পূর্ব কম্যাণ্ড (Eastern Command) : যুক্ত প্রদেশ এরিয়া (মীরাট বাদে), লক্ষ্ণৌ সাব-এরিয়া, এলাহাবাদ সাব-এরিয়া, বিহার ও উড়িষ্যা এরিয়া, বাঙ্গলা ও আসাম এরিয়া, কলিকাতা সাব-এরিয়া, শিলং সাব-এরিয়া।

পশ্চিম কম্যাণ্ড (Western Command) : দিল্লী এরিয়া, পূর্ব পাঞ্জাব এরিয়া, জলন্ধর সাব-এরিয়া, মীরাট সাব-এরিয়া।

আধুনিক ও উন্নত যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ করার পরিকল্পনা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন। বিশেষত নৌ ও বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে বিদ্যাশিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যায় ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের পরিকল্পনা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রেরিত হয়েছে। বিদেশ বলতে বর্তমানে মাত্র ইংলণ্ডেই শিক্ষার্থী প্রেরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রেও এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থী প্রেরণের ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন।

যুদ্ধের আধুনিকতম ও উন্নত প্রকারের অস্ত্র এবং উপকরণও

ভারতীয় ফৌজের সামরিক ঐশ্বর্য একে একে বৃদ্ধি ক'রে চলেছে। গ্র্যাফ-স্পীনিস্‌দন বিখ্যাত ক্রুজার (৭০০০ টন) রণতরী অ্যাকিল্‌স (Achilles) দুই কোটি টাকা দিয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কাছ থেকে কিনেছেন। নতুন কতগুলি ডেষ্ট্রয়ার (Destroyer) কেনবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিমানবাহিনীতে আধুনিকতম অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ হয়ে গেছে।

'সামরিক জাতি' বা অ-সামরিক জাতি নামে উদ্ভট থিওরীটি একেবারে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সর্ব-সমাজের লোকের জন্য ভারতীয় ফৌজের সার্ভিস গ্রহণের পথ মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দু'টি পরিকল্পনা নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমটি হলো—জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ (National Cadet Corps) পরিকল্পনা। দ্বিতীয়, আঞ্চলিক ফৌজ (Territorial Force) পরিকল্পনা।

স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর স্বাতন্ত্র্য

স্বাধীনতা লাভের তারিখটির আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সমগ্র সৈন্যবল (স্থল নৌ ও বিমান) 'কম্যাণ্ডার ইন চীফ' নামক একজন প্রধানের পরিচালনাধীন ছিল। ১৫ই আগষ্টের পর থেকে ভারতের সর্ব শ্রেণীর সৈন্যবলের গঠনতন্ত্রগত ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন হয়। স্থল নৌ এবং বিমান বাহিনীর তিন প্রধান পরিচালক স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনার কর্তব্য গ্রহণ করেন। স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর তিনটি দপ্তর এক প্রধান সেনাপতির অধীনে আর রইল না।

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী—১৫ই আগষ্টের

(১৯৪৭) পর এই তিন বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালকের পদোপাধি হয়, যথাক্রমে (১) কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ, ভারতীয় ফৌজ (Commander-in-chief, Indian Army), (২) ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং, রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী (Flag Officer Commanding, R. I. N.) (৩) এয়ার মার্শাল কম্যাণ্ডিং, রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনী (Air Marshal Commanding, R. I. A. F.)।

২০শে জুন (১৯৪৮) তারিখে এই তিনটী আখ্যা বা পদোপাধির পরিবর্তন করা হয়। তিনটি বাহিনীর প্রধান পরিচালকের পদোপাধি হয়, যথাক্রমে, (১) চীফ অব্ দি আর্মি স্টাফ এণ্ড কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ (Chief of the Army Staff & C-in-C.) (২) চীফ অব্ দি নেভ্যাল স্টাফ এণ্ড কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ (Chief of the Naval Staff & C-in-C.) ৩। চীফ অব্ দি এয়ার স্টাফ এণ্ড কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ (Chief of the Air Staff & C-in-C.)।

২১শে জুন (১৯৪৮) তারিখে ভারতের দেশরক্ষার ব্যবস্থায় গঠনতন্ত্রের একটী বড় পরিবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের স্থল নৌ ও বিমানবাহিনীকে একই 'কম্যাণ্ডের' অধীনে রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ ভারতের প্রধান সেনাপতির কম্যাণ্ডের অধীনে। ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারিখ থেকে স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীকে তিনটি স্বতন্ত্র কম্যাণ্ডের অধীন করা হয়।

নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

ভারতীয় নৌবাহিনীতে অ্যাকিল্‌স্ (Achilles) নামক যে ক্রুজার এসেছে, তার নতুন নাম হয়েছে 'দিল্লী'। আরও যে তিনটি নতুন ডেস্ট্রয়ার ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্রয় ক'রে নৌবাহিনীতে নিযুক্ত

করেছেন, তাদের নাম হলো—রোটারহাম (Rotherham), রেডার (Raider) ও রিডাউট (Redoubt)। এই তিনটী ডেস্ট্রয়ার ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ডেস্ট্রয়ারগুলির গতিবেগ হলো ৩৪ নট (Knot), প্রত্যেকটী বিমান-ধ্বংসী ও সাবমেরিন-ধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত। এই প্রত্যেকটি ডেস্ট্রয়ার হলো রাডার সমন্বিত, প্রত্যেকটী টর্পেডোবাহী। এই রণতরীগুলির ভারতীয় ভাষায় নতুন নামকরণও শীঘ্রই হবে।

এই সব উন্নত শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ পরিচালনার জন্য ভারতীয় নৌসৈনিকদের ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। অখণ্ড ভারতের সমুদ্রোপকূলের দৈর্ঘ্য ছিল ৩ হাজার মাইল। ভারত খণ্ডিত হওয়ার ফলে, উপকূলভাগের ৬৫০ মাইল পাকিস্থানের অংশে পড়েছে। বর্তমান স্বাধীন ভারতের ২৩৫০ মাইল উপকূল ভাগ রক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট আর একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন—যুদ্ধযোগ্য বাণিজ্যিক নৌবহর (Merchant Navy) নির্মাণ। এই পরিকল্পনা হলো, ভারতের বাণিজ্য জাহাজের (Merchant Vessel) সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এই বাণিজ্য নৌবহরকেও সামরিক যোগ্যতা-সম্পন্ন করা। এর ফলে প্রকারান্তরে ভারতীয় নৌবাহিনীরই শক্তি বৃদ্ধি হবে।

বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিকাংশ ট্রেনিং সংস্থা কোচিনে অবস্থিত। কোচিনেই নৌবাহিনীর 'গানারি' (Gunnery) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা হয়েছে। বয়েজ ট্রেনিং (Boy's Training) সংস্থাটী ভিজাগাপট্টমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল স্কুলটী জামনগরে, আর্টিফাইসারস্ (Artificer's) ট্রেনিং কেন্দ্রটি লোনাওয়ালা নামক পশ্চিম উপকূলের একটি স্থানে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিগন্যাল স্কুল এবং 'সাপ্লাই ও সেক্রেটারিয়েট স্কুল কোচিনেই অবস্থিত। বোম্বাইয়ে নৌবিদ্যার নতুন ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলেছে।

নৌবাহিনীর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট আর একটা নতুনত্বের পরিকল্পনা করেছেন। ইংলণ্ডীয় এবং আমেরিক্যান নৌবাহিনীতে যেমন আছে, অ্যাডমির‍্যাল অ্যাফ্লোট (Admiral Afloat) নামে একটা পরিচালক পদ সৃষ্টি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। নৌসৈন্যের পরিচালনা এবং যুদ্ধকার্য সম্পর্কে বিশেষ কতগুলি দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অ্যাডমির‍্যাল অ্যাফ্লোট নামে এই নতুন পদাধিকারী সৈন্যাধ্যক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকবে। *

ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি

ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও আকারে এবং প্রকারে বৃদ্ধি করার আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। 'শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব-উপকরণসমন্বিত' (Balanced) বিমানবাহিনী গঠন করার নীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন। বিমানযুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে সকল বিষয়ে ট্রেনিং দেবার জন্য নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং পূর্বস্থাপিত কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থা প্রসারিত করাও হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে একটি জেট স্কোয়ড্রান (Jet Squadron) এবং একটা বোমারু স্কোয়ড্রান ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যুক্ত করা হবে। অম্বালা, আগ্রা, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে প্যারাট্রুপ (paratroop) ও অন্যান্য উচ্চ বিমানযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৮-৫০ আক্রমণমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক উভয় কার্যের জন্য ১২ স্কোয়ড্রান

* ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে ভাইস-অ্যাডমির‍্যাল প্যারি (Vice-Admiral Parry) ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান নৌ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

দক্ষ বিমান ফৌজ প্রস্তুত হতে পারে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে সেই পরিকল্পনা অনুসারে উদ্যোগ করে চলেছেন।

সহযোগী নেপালী ফৌজ

ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে নেপাল গবর্ণমেণ্ট ১০ ব্যাটালিয়ন নেপালী সৈন্য ধার দিতে সম্মত হয়েছেন। ১৯শে জুলাই (১৯৪৮) তারিখে নেপাল দরবারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

স্বাধীন ভারতের ফৌজের বর্তমান রূপ লক্ষ্য করলে তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—দক্ষিণ ভারতীয় সমাজের লোকের আধিক্য। ব্রিটিশ আমলের মত বর্তমান ভারতীয় ফৌজ আর 'পাঞ্জাবী প্রধান' ফৌজ নয়। ১৯শে জুলাই তারিখে (১৯৪৮) ভারতীয় ফৌজের প্রধান রিক্রুটিং অধ্যক্ষ কর্ণেল সুজন সিং বাঙ্গালোরে সাংবাদিকদের নিকট ব্যক্ত করেন যে—"মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবই বর্তমানে ভারতীয় বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বেশী সংখ্যক্ সৈন্য সরবরাহ করছে।"

অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন ভারতের ফৌজে এখনো বিশেষ কয়েকটি প্রদেশ অঞ্চল এবং সমাজের লোকের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। অনেক সমাজের লোক ভারতীয় ফৌজে এখনো যথাযোগ্য প্রবেশ লাভ করেনি। বাঙালী, অসমীয়া, উড়িয়া, বিহারী, গুজরাটী, সমাজের লোক ভারতীয় ফৌজে কমই আছে।

মিলিশিয়া ইত্যাদি লোকসেনা গঠন

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় রেগুলার ফৌজের পুনর্গঠন এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা ছাড়া ভারত গবর্ণমেণ্ট আর একটি পরিকল্পনাকে

কার্যে পরিণত করেছেন যা বস্তুতঃ ভারতের দেশরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এই পরিকল্পনা হলো 'মিলিশিয়া' গঠনের পরিকল্পনা। এই মিলিশিয়া বস্তুতঃ অরেগুলার প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রতি প্রদেশে 'মিলিশিয়া' নামে অরেগুলার প্রথায় সৈন্যদল গঠনের আয়োজন চলেছে।

"আর একটি উদ্যোগ হ'লো—প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভলাণ্টিয়ারি কোর, হোমগার্ড প্রভৃতি স্বেচ্ছাসৈনিক গঠনের ব্যবস্থা। প্রত্যেক প্রদেশে অল্পকালের মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় কুশল লোক তৈরী করে রাখাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে স্বেচ্ছাসৈনিক ট্রেনিং দেবার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

রণকুশল ভারতীয় অফিসার

বহু রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞ যুদ্ধনিপুণ ভারতীয় অফিসারেরাই আজ ভারতের জাতীয় ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। জার্মাণ ফৌজ, জাপানী ফৌজ, ইতালীয় ফৌজ, সশস্ত্র পাঠান, তুর্কী ফৌজ, ইত্যাদি বহু জাতির ফৌজের বিরুদ্ধে বহু রণাঙ্গণে বহু সংঘর্ষে শক্তি পরীক্ষা ক'রে এই সকল ভারতীয় অফিসার তাঁদের সামরিক যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

লেঃ জেনারেল কারিয়াপ্পা, মেজর জেনারেল রুদ্র, এয়ার ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, মেজর জেনারেল চৌধুরী, মেজর জেনারেল থিমাইয়া, কমোডোর (নৌ) এ চক্রবর্ত্তী, মেজর জেনারেল থাপার, মেজর জেনারেল হিম্মত সিংজী, লেঃ জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী, মেজর জেনারেল কুলবন্ত

সিং, মেজর জেনারেল অটল, মেজর জেনারেল ব্রার; মেজর জেনারেল ঢিলন, এয়ার কমোডোর মিঃ ইঞ্জিনিয়ার, এয়ার কমোডোর মেহের সিং, মেজর জেনারেল মাধব সিংজী, মেজর জেনারেল শ্রীনাগেশ, এয়ার কমোডোর নরেন্দ্র, মেজর জেনারেল থোরাট, লেঃ জেনারেল ঠাকুর নাথু সিং, মেজর জেনারেল শান্ত সিং, মেজর জেনারেল চিমনি।

উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত বিশিষ্ট কয়েকজন ভারতীয় অফিসারের নাম উদ্ধৃত করা হলো, এ ছাড়া বহু সংখ্যক ব্রিগেডিয়ার আছেন যাঁরা সামরিক দক্ষতায় ও অভিজ্ঞতায় কম যান না। (১) জুনিয়র কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদের সম্পর্কেও এই মন্তব্য করা চলে, তাঁরাও বহু রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। (২)

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, উভয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, এমন বহু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সাধারণ সৈনিক বর্তমান ভারতীয় ফৌজে রয়েছেন।

(১) **জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ**: ৩১শে মার্চ (১৯৪৮) তারিখে ভারতের দেশরক্ষা সচিব ভারতীয় পার্লামেণ্টে জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে চেয়ারম্যানরূপে নিয়ে জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ

(১) ব্রিগেডিয়ার ওসমান জম্মুর রণক্ষেত্রে 'নৌশেরা' যুদ্ধে শত্রুকে পরাজয় ক'রে এবং পরে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে ভারতের জাতীয় ফৌজের সামরিক অফিসারেরা যুদ্ধদক্ষতা ও দেশপ্রেম উভয় গুণের অধিকারী হয়েছে।

(২) ব্রিটিশ আমলে 'ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত' অফিসারদেরই স্বাধীন ভারতে 'জুনিয়র কমিশন প্রাপ্ত' অফিসার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গঠনের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ঐ কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন।

ভারতের ছাত্র-সমাজে সামরিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই পরিকল্পনা হয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের নিয়েই জাতীয় ক্যাডেট দল গঠিত হবে। এই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ কোন ছাত্রের পক্ষে অবশ্যবাধ্য (Compulsory) কাজ নয়। 'স্বেচ্ছায়' ছাত্রেরা এই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করবে। জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ পরিচালনার ব্যবস্থা ও নীতি নির্ধারণ এবং তদারকের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হয়েছে। দেশরক্ষা সচিব এই কমিটির চেয়ারম্যান। নৌ-সেনাপতি, বিমান সেনাপতি, শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ও ছয়জন বে-সরকারী ব্যক্তি এই কমিটির সদস্য হবেন। তাছাড়া ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীর প্রত্যেকটি থেকে অফিসারদের সদস্যরূপে নিয়ে একটি 'জাতীয় ক্যাডেট সেক্রেটারিয়েট' ফৌজ গঠিত হয়েছে, এই সেক্রে-টারিয়েটের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হবেন একজন ব্রিগেডিয়ার বা তদূর্দ্ধ পদস্থ কোন অফিসার। সমগ্র ক্যাডেট ফৌজ মূলতঃ ভারতের দেশরক্ষা দপ্তরের অধীন বিভাগরূপে গণ্য হবে, যদিও এ বিষয়ে খরচের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আছে।

স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীতে ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে অফিসাররূপে ভর্তি হবার মত প্রাথমিক যোগ্যতা রাখতে পারে তারই উপযুক্ত প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য এই পরিকল্পনা। জাতীয় ক্যাডেট ফৌজের তিনটি ডিভিসন কল্পনা করা হয়েছে— (১) সিনিয়র ডিভিসন, (২) জুনিয়র ডিভিসন এবং (৩) ছাত্রী ডিভিসন।

সিনিয়র ডিভিসন—সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরী কলেজের ছাত্রদের নিয়ে সিনিয়র ডিভিসন গঠিত হবে। এই ডিভিসনের তিনটি শাখা (Wing)। স্থলবাহিনী শাখা—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ হাজার। নৌবাহিনী শাখা—শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার। বিমান বাহিনী শাখা—শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড় হাজার। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সিনিয়র ক্যাডেট দলের শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হবে, প্রদেশ অনুসারে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাপরিমাণ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই।

জুনিয়র ডিভিসন—মাত্র স্কুলের বালকদের নিয়ে জুনিয়র ক্যাডেট দল গঠিত হবে। জুনিয়র ক্যাডেটের শিক্ষার প্রধান বিষয় হবে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা, আদর্শ ইত্যাদি। ড্রিল, প্যারেড, রাইফেল চালনা ইত্যাদি নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা জুনিয়ার ক্যাডেটদের জন্য বিহিত করা হয়েছে। স্কুলের অন্যান্য সাধারণ পঠিতব্য বিষয়ের মত ছাত্রদের এই নিম্নপ্রাথমিক সামরিক শিক্ষা স্কুল-কর্তৃপক্ষের দ্বারাই পরিচালিত হবে।

জুনিয়ার ক্যাডেট দলের মোট সংখ্যা হবে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। বিভিন্ন প্রদেশের জন্য জুনিয়ার ক্যাডেট দলের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে। যথা : পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও যুক্ত-প্রদেশ—প্রত্যেকের জন্য কুড়ি হাজার। বোম্বাই, পূর্ব পাঞ্জাব ও বিহার—প্রত্যেকের জন্য পনের হাজার। মধ্যপ্রদেশ—ছয় হাজার। আসাম ও উড়িষ্যা—প্রত্যেকের জন্য দুই হাজার। দিল্লী—এক হাজার। আজমীর-মারোয়াড়—পাঁচ শত। কুর্গ—২৫০ জন। রিজার্ভ—পনের হাজার।

ছাত্রী ক্যাডেট দল—ছাত্রীদের জন্য ক্যাডেট দলের কোন সংখ্যা পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ব্যায়াম এবং মানসিক প্রকৃতি গঠন সম্বন্ধেই ছাত্রী ক্যাডেটকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

যুদ্ধকালীন সৈনিকের ওপর ন্যস্ত অনেক কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে এমন কতগুলি কাজ আছে যা ট্রেনিং পেলে মেয়েরাও করতে পারে। ছাত্রী ক্যাডেটের এই সব কর্তব্যের উপযোগী হবার জন্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হবে।

(২) **টেরিটোরিয়াল ফৌজ** : ৮ই এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে ভারতের দেশরক্ষা সচিব টেরিটোরিয়াল ফৌজের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। আঞ্চলিক ফৌজের কর্তব্য হলো :

"স্থায়ী রেগুলার বাহিনীর পরিপূরক হিসাবে দেশরক্ষার দ্বিতীয় ব্যূহরূপে (Second Line of National Defence) আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠবে। অর্থাৎ জাতির দেশরক্ষার প্রয়োজনে জরুরী অবস্থায় রেগুলার বাহিনীতে নতুন সেনাদল যোগান দেবার কাজ। তাছাড়া, আর একটা কাজ হবে, জরুরী অবস্থায় জাতীয় প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ দেশরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রে রেগুলার বাহিনীকে প্রকৃত দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে সুবিধা ক'রে দেওয়া। দেশের উপকূল রক্ষা ও আক্রমণকারী বিমান ধ্বংসের জন্যও দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা। আর একটা কাজ হলো, দেশের যুবক সমাজ যাতে অবসর সময়ে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা। *

* Primarily to form a second line to the Regular Army in the event of a national emergency ; in other words, to provide additional units and formations to reinforce the Regular Army immediately as the emergency arises. In a national emergency to take on internal defence duties and relieve thereby the Regular Army of this responsibility ; to be responsible for anti-aircraft and coastal defence ; to give the youth of India an opportunity of receiving part time military training so that, in an emergency they would be capable of bearing arms for the country.

সামরিক ত্রিবিধ বিষয়েই—যুদ্ধ, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনায় টেরিটোরিয়াল ফৌজের সৈনিকেরা শিক্ষালাভ করবে। বর্তমান টেরিটোরিয়াল ফৌজের জনবল হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার। সমগ্র দেশকে আটটি অঞ্চলে (zone) ভাগ ক'রে নিয়ে, এক-একটি টেরিটোরিয়াল দল রাখা হবে।

১নং অঞ্চল—পূর্ব পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য, রাজপুতানা দেশীয় রাজ্য ও দিল্লী প্রদেশ।

২নং অঞ্চল—যুক্তপ্রদেশ।

৩নং অঞ্চল—মধ্যপ্রদেশ ও পূর্বভারত দেশীয় রাজ্য।

৪নং অঞ্চল—বোম্বাই ও কাথিয়াবাড়।

৫নং অঞ্চল—মাদ্রাজ, মহীশূর, ও ত্রিবাঙ্কুর।

৬নং অঞ্চল—বিহার, উড়িষ্যা।

৭নং অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার।

৮নং অঞ্চল—আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর।

জাতীয় সমর বিদ্যালয়: জাতীয় গবর্ণমেণ্ট একটি সামরিক বিদ্যালয় গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত করেছেন এবং উদ্যোগও আরম্ভ করেছেন। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিবিধ পদ্ধতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কমিটির সুপারিশগুলিকেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কিছুটা পরিবর্তন ক'রে গ্রহণ করেন।

২রা এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে দেশরক্ষা দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, পুণার কাছে খরকাওয়াসলা নামক স্থানে প্রস্তাবিত জাতীয় সমর বিদ্যালয় (National War Academy) প্রতিষ্ঠিত হবে। ১০ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। স্থল, নৌ ও বিমান—তিন বাহিনীতে ভবিষ্যতে যারা

অফিসার হবে, তাদেরই একটি প্রাথমিক বুনিয়াদি সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যই এই বিদ্যালয়। নৌ-যুদ্ধবিদ্যার ছাত্রকে ১৫ বৎসর বয়সের হতে হবে।

ভারতীয় ফৌজের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই নতুন রূপে গড়ে উঠেছে। ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) আগের ভারতীয় ফৌজ ও আজকের ভারতীয় ফৌজ—অনেক তফাৎ। অনেক ব্যবধানও বলতে পারা যায়। যা একশো বছরে সম্ভব হবার কথা, তা আট মাসে সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় ফৌজের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে গেলে একরকম নিঃশব্দেই সম্ভব হয়ে গেছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর সর্বক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হয়েছে—শিল্পে, শিক্ষায়, কৃষিতে, ব্যবসায়ে ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু সবার আগে, সবচেয়ে নিঃশব্দে, সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে পুরাতন যে সঙ্ঘটি সবচেয়ে বেশী বদলে গেল, সেটি হলো আমাদের ভারতীয় ফৌজ। নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের ক্ষাত্রশক্তির প্রকৃত প্রতিমূর্তিরূপে আজ এই ফৌজ পরিণতি লাভ করেছে।

আজ আপনি কান পেতে শুনতে পাবেন, ভারতীয় ফৌজের সেনাদল তার রেজিমেণ্ট ব্যাণ্ডে 'জনগণমন অধিনায়ক' সুর বাজিয়ে ভারত-প্রেমের প্রেরণায় হিল্লোলিত ছন্দে মার্চ ক'রে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাস জানে, প্রত্যেক দেশের সমরবিশারদেরা জানেন, পৃথিবীর সকল স্থলবাহিনীর মধ্যে রণদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ হলো এই ভারতীয় ফৌজ।

ভারতীয় পদাতিক সৈনিকের অস্ত্রসজ্জায় আর কোন রিক্ততা নেই। রাইফেল, মর্টার ও ব্রেনগানবাহী ভারতীয় পদাতিক আজ কাল-বৈশাখীর মত যে কোন অরাতি পক্ষের ওপর প্রচণ্ড আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার যোগ্যতা রাখে। যন্ত্রোপেত ভারতীয় ডিভিসনের

সাঁজোয়া আর মোটর ব্রিগেডের উৎক্ষিপ্ত অনলপিণ্ড যে কোন ভয়ঙ্কর শত্রু-যূথের সংহতি বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত করার ক্ষমতা রাখে। ভারতীয় গোলন্দাজের ফিল্ড ব্যাটারীর অগ্নিলীলার আয়োজন এবং উপকরণই বা কত? ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ৬-পাউণ্ডার ও বিমানধ্বংসী কামান ২৫-পাউণ্ডার, ১৭-পাউণ্ডার ও ৭৫ এম. এম হাউইটজার—৫৫ ও ৪৪ এম. এম কামান। ভারতীয় গোলন্দাজ আজ কঠিন গ্রানিটে গড়া দুর্গ চূর্ণ ক'রে দিতে পারে।

ভারতীয় বৈমানিক আজ ভারতের আকাশ পথ রক্ষা করছে। কর্ণেলি, হারওয়ার্ড, হারিকেন, ল্যাঙ্কেস্টার, ডাকোটা ও স্পিটফায়ার —ভারতীয় রণ-বিমানের গুরু গুঞ্জনে আজ ভারতের আকাশ মন্দ্রিত। ভারতের দক্ষ এঞ্জিনিয়ার ফৌজ, স্যাপার ও মাইনার আজ সেতু-সরঞ্জাম ও বুলডজার নিয়ে প্রস্তুত। অতি নিপুণ সিগন্যালার সৈনিক রণক্ষেত্রের ধূমানলের মধ্যেও রণবার্তা ও সঙ্কেত প্রেরণের আয়োজন পূর্ণ ক'রে রেখেছে। সাবমেরিন ধ্বংসে, মাইন অপসারণে, টর্পেডো চালনায় ও পোতধ্বংসী কামান চালনায় ভারতীয় নৌ-সৈনিক আজ অস্ত্রে ও উপকরণে সজ্জিত এবং দক্ষতায় দীক্ষিত। রকেটযোজিত ভারতীয় বিমানবহর আজ শত্রুর ওপর অগ্নিময় উল্কা বর্ষণ করতে পারে। রাডারবাহিত ভারতীয় বিমান বায়ু-সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দূরায়াত শত্রু-বিমানের সন্ধান নিতে পারে, অবতরণের নবতম কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। আজ আপনি ভারতীয় প্যারাসুট সৈন্যদলকে দেখতে পাবেন, ঊর্ধ্বাকাশ থেকে মুহূর্তের ইঙ্গিতে দুঃসাহসিক ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। এই আমাদের স্বাধীন ভারতের ফৌজ।

[সমাপ্ত]